অবসন্ন

শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রসাদ প্রকাশনী
২২৮, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৭

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রকাশক :

মায়া ঘোষ,

প্রসাদ প্রকাশনী,

২২৮, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলকাতা—৭,

দাম : চার টাকা।

মুদ্রাকর :

প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী,

লোক-সেবক প্রেস,

৮৬-এ, লোয়ার সারকুলার রোড,

কলিকাতা—১৪।

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া মীরা,

এই কাহিনীতে কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে সত্যকে অনুসন্ধান করেছি। যা দেখেছি তাই যে লিখেছি, তা নয়। যেমনটি দেখিনি তা'কে-ও সম্ভব জেনে লিখেছি। বাস্তবকে ভুলিনি; কিন্তু বাস্তবের ফটো নিই নি। ভাবকে অনুসরণ করেছি; কিন্তু ভাবের বন্যায় ভেসে যাই নি। মূলতঃ, মানব-চরিত্রকেই অবলম্বন করেছি।

মীরা, আজ তুমি বিহার প্রদেশের শৈল শহরে উচ্চতম শিক্ষার ছাত্রী। কিশোরী-চিত্তের শুচি-শুভ্রতা তোমার জীবনের চির পাথেয় হোক্,—এই কামনা করি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পটভূমিতে বৈচিত্র্য আসছে প্রচুর এটি নিঃসন্দেহে আশার কথা। 'অবসন্ন' কলকাতার আশপাশে শহরতলীর এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে শিক্ষক-জীবনকে কেন্দ্র ক'রে বিদ্যালয়ের পটভূমিকায় বেশ কয়েক-খানি জনপ্রিয় উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাদান পদ্ধতির নব্য পন্থায় চূড়ান্ত শিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকার জীবনকে কেন্দ্র ক'রে রচিত কোন কাহিনী আমাদের গোচরে নেই। সেই দিক থেকে বিদ্যালয়ের পরিচিত পটভূমিতে রচিত হ'য়ে-ও অপরিচিত পটভূমির বৈচিত্র্য দাবী করতে পারে 'অবসন্ন'।

'অবসন্ন'-র পাত্র-পাত্রী অধিকাংশই শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা শিক্ষা-সংশিলষ্ট। এই কাহিনীতে তাদের পেশা-আদর্শ, আশা-আকাংখা, প্রীতি-প্রণয়, কামনা-বাসনা, স্নেহ ও মমতা ইত্যাদির যে সংঘাতময় চিত্রটী কাহিনীকার নিরপেক্ষের লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা-বিরল। এর প্রতিটি চরিত্র লেখনীর প্রসাদগুণে জীবন্ত, এত জীবন্ত যে কাহিনীর মাধ্যমে চরিত্র-গুলির মুখোমুখী হ'লে বিস্ময়ে মন ধাঁধিয়ে যায়। মনে হয়, এমন ক'রে কেউ তো এদের চেনায়নি এর আগে।

এ-কাহিনীর আরো একটি বৈভব হোল জীবন সম্বন্ধে লেখকের অনন্য দৃষ্টিভঙ্গী। সত্যের স্বধর্ম থেকে কোথাও বিচ্যুত হননি লেখক। প্রত্যেকটি চরিত্রকে নিপুণ শল্যবিদের মত বিশ্লেষণ ক'রে গ্রন্থন করেছেন জীবন-সত্যের গতিছন্দ। সে-ছন্দ কখনো গুরু কখনো লঘু, কখনো হ্রস্ব কখনো দীর্ঘ, কখনো মালিনী কখনো রুচিরা—বৈচিত্র্যের ধ্বনিবিন্যাসে ভরপুর। তার সঙ্গে মিশে আছে মননশীল ভাবুকতার আশ্চর্য অলংকার। সে ভাবুকতা ইন্দ্রজিতের মত কাহিনীর আড়ালে লুকিয়ে থেকে মুখোমুখী বাস্তবের জগত থেকে কখন যে টুপ্ ক'রে কল্পের জগতে নিয়ে চলে যায় অদৃশ্য আকর্ষণে, পাঠক-মন সচেতন হবার অবকাশ পায় না একটুও। বাস্তবিক, বাস্তব, ভাবুকতা ও কল্পের এমন ত্রিবেণীসঙ্গমস্রষ্টা সমন্বয়ী লেখক-মন সাহিত্য-রসিকের উপভোগ্য বস্তু। এই গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে এই অসামান্য শক্তিধর লেখককে বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাই স্বাগত জানাচ্ছি।

নাম জগত্তারিণী বিদ্যালয়। সন্নিহিত প্রাচীন বটগাছের সম্মানে লোকে বটতলা ইস্কুল ব'লেই নাম ধরে। অবশ্য, সরকারী ব্যাপারে সাধু নামটাই সচল।

স্থাপিত হ'য়েছিলো ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। খ্রীষ্টাব্দটা দুনিয়ার পঞ্জিকায় নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনায় চিহ্নিত-বিচিহ্নিত অবশ্যই। সারা পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস নানা আঁচড়েই এ'কে যাচ্ছেন বিধাতা। কিন্তু ভারতের অদৃষ্টের লিখন তখন দেশের মাটিতে যে-যে অক্ষরপাত ক'রে যাচ্ছিলো, তার পুরো বৃত্তান্ত এখনো লেখা হয় নি। পুরোই বা বলি কেন, অতি সামান্যই লেখা হ'য়েছে। অবশ্য, বর্তমান ভারত অর্থাৎ বিংশ শতকের ভারত বাদ দিয়েই যদি বলা যায়, তবে সদ্য অতীত বা বহু অতীত কোনো ভারতেরই যথেষ্ট রকম ও যথার্থ রকমের ইতিহাস আজ-ও নেই। এ-সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের খেদোক্তি আর তাঁর যোগ্য শিষ্যা নিবেদিতার কথাগুলি বিদগ্ধ বাঙালী এরই মধ্যে ভুলে যায় নি নিশ্চয়।

এতোগুলো কথা বলার কারণ এই যে, দেশে নরম কংগ্রেস যখন জোর ধাক্কা খাচ্ছে চরম আন্দোলনের ঝোড়ো হাওয়ায়, তখন কোনো কোনো ছোটো-খাটো দেশপ্রাণ যুবক ছোটোখাটো সাধ্য ও কল্পনামতো দেশের কাজে মনপ্রাণ দিয়ে লেগে প'ড়েছিলেন। বটতলা ইস্কুলে তার প্রমাণ আছে।

সুমথ ঘোষ মানুষটা বেহিসেবী। তাদের জমিজমা বিস্তর। বাপ বৃদ্ধ হ'লেও ডাঁটো শরীরে একাই তার তদারক ক'রে থাকেন। সুমথর ছোটো ভাই রেল কোম্পানীতে বেশ ভালো মাইনের কেরানীগিরি ক'রে স্ত্রী ও একমাত্র কন্যার লালন-পালন নিয়ে মগ্ন থাকে। সুমথ না করলো বিয়ে, না করলো থা। গ্রামের পাঠশালাগুলো কি-ক'রে ভালো ক'রে চলবে, অমুক বিধবা আর তমুক নিঃসম্বল কেমন ক'রে দুমুঠো অন্নসংগ্রহ করবে, তাই নিয়ে উদয়-অস্ত ঘুরে বেড়ায় সুমথ,—ক্ষ্যাপার মতো। অবশ্য, চাকরী সে-ও একটা করে। আর পারিবারিক কাজকর্মে একেবারে অনবহিত সে নয়।

তবুও সুমথর এই পাঁচের কাজ আর দশের ধান্দা নিয়ে পাগলামিটা পাড়ার লোকের কাছে কৌতুক ও অবহেলার বস্তু হ'লেও তার বাড়ির সকলের কাছে তিরস্কারের না হ'লেও আক্ষেপের।

রেল লাইনের পশ্চিম দিকে গ্রামাঞ্চল। পাঁচটা পল্লী নিয়ে 'ইউনিয়ন'। লাইনের পূর্বাঞ্চল শহর। নামেই শহর। আসলে, গ্রামেরই চেহারা, গ্রামেরই প্রকৃতি। তবে শহরের কতকগুলো লক্ষণ এই ভবানীপুরে আছে। ভবানীপুর বললেই যদি কলকাতার ভবানীপুর মনে পড়ে কারো, তবে মুশ্‌কিল্‌। কেননা, এই-ভবানীপুরের অধিবাসী মাত্র দশ হাজার। অবশ্য, এধারে ওধাবে দুটি উচ্চ বালক বিদ্যালয় আছে। অধিকন্তু, প্রাথমিক একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন করার চেষ্টা ক'রে সুমথ বিফল হয় নি। কাজেই ভবানীপুর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শহর নামধারী বেশ বড়ো একটি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম।

এই ভবানীপুরের নাম বাঙ্‌লা সাহিত্যের কোন্‌ একখানি প্রাচীন উপন্যাসে পাওয়া যায়। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের গল্পে-ও নাকি এই নাম আছে। সেই-ভবানীপুর যে এই বটতলা ইস্কুলের ভবানীপুর, এ-অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তি সেটি স্পষ্টতঃই বুঝতে পারেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেটে গেলো। দুনিয়ায় কতো কান্ডই না হ'য়ে গেলো। ভারতে ঘ'টে গেলো কতো লন্ড-ভন্ড। সুমথ যৌবন পরিপক্ক ক'রে পরিণত বয়স পার হওয়ার উপক্রম করলো। সমান তালে আর সমান চালে পাঁচের কাজ আর দশের ধান্দা নিয়ে দিন কাটিয়ে দিলো। ইউনিয়ন বোর্ডের তিনটে পাঠশালা চালিয়ে রেখে, পনেরোটি বিধবা ও নিঃসম্বল পরিবারের হ্যাঁপাজৎ সামলে' সুমথ অবশেষে শহরের পশ্চিম প্রান্তের রেল লাইন-ঘ্যাঁসা একটি খোড়ো চালের পাঠশালাকে কেন্দ্র করলো। তখন তার বেহিসেবের জীবনকে আর শখ বলতে পারে না কেউ। দশের কাজ তখন তার নেশা, এমন-কি পেশা-ও যেনো।

বটতলা ছিলো পাঠশালা মাত্র। শহরের কিনারায় গ্রামের কাছাকাছি খোড়ো চালের ঘর; জোড়া বেত হাতে কৈলেস গুরু আর মাত্র তিরিশটি ছেলের এই পাঠশালা। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভবানীপুর উত্তরোত্তর [illegible] ব'নে যেতেই বটতলার পাঠশালাটির অবস্থা-ও শহুরে মানুষদের

বে-দরদের জন্য কাহিল হ'য়ে আসছিলো। অথচ ইউনিয়ন বোর্ড আর শহরের সন্ধিস্থলে ব'লে এ-জায়গায় একটা ইস্কুল দরকার বৈ কি! অন্ততঃ সন্মথর দৃঢ় বিশ্বাসটি তাই। শহরের বেশির ভাগ ছেলে পূর্ব অঞ্চলের শহুরে ইস্কুলেই যায় ভিড় ক'রে। গ্রাম-ঘ্যাঁসা এই পাঠশালা তাই নিভে আসে। রোখ চেপে গেলো সন্মথর। সে বটতলাকে একটি জমকালো শহুরে বিদ্যালয়ে রূপান্তর দিয়ে নিজের কাজের-আগ্রহ চরিতার্থ করতে শুরু করলো।

খড়ের চাল গিয়ে পাকা ইমারৎ উঠলো। উপরে হলঘর, নিচে হলঘর ও দুখানা বড়ো কামরা। মাদুর আর চেটাইয়ের বদলে বেঞ্চি হ'লো। চেয়ার হ'লো। আলমারি হ'লো। তার উপর মুখ্যু পণ্ডিতের বদলে শহরের বিদ্বান, শিক্ষিত মাস্টার এলো ইস্কুল সামলাতে। মাস্টার তিনকড়িবাবু বৃদ্ধ ব্যক্তি। সরকারী চাকরী হ'তে অবসর নিয়ে বসেছিলেন। শরীর রীতিমতো সমর্থ; মন আদৌ অলস নয়। এ-হেন ব্যক্তিকে পাঠশালার প্রধান শিক্ষকরূপে পেয়ে সন্মথ ভারি খুশি। ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গিয়ে নব্বুইতে দাঁড়ালো। শহরের অঞ্চল থেকে-ও বেশি সংখ্যায় ছাত্র আসতে লাগলো। ইস্কুলটা প্রাথমিক বিদ্যালয় হ'য়ে-ও রীতিমতো শহুরে বিদ্যালয় হ'য়ে উঠলো।

১৯২২ খৃীষ্টাব্দে প্রধান শিক্ষক মারা গেলেন। ঘটা ক'রে তাঁর শোকসভা করলো সন্মথ। কিন্তু ঘরে ব'সে ভাবতে লাগলো এখন কী কর্তব্য। কেননা, প্রধান শিক্ষক মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজন মাস্টার-ও কাজে ইস্তফা দিলেন। ইস্কুল চলা ভার হ'লো।

সন্মথ অনেক হাঙ্গামা সহ্য করেছে দশের কাজে। বিপদ এসেছে-ও যতো, কেটেছে-ও ততো। এবারে-ও তাই হ'লো। সন্মথ শিক্ষক পেয়ে গেলো চারজন যুবককে। একটা প্রাথমিক ইস্কুল চালাবার পক্ষে তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষিত। কেননা, প্রধান শিক্ষক গ্র্যাজুয়েট, আর বাকি তিনজন ম্যাট্রিক ও তদূর্ধ্ব।

নরেন্দ্র ও তার তিন বন্ধু তখন অসহযোগের হিড়িকে কলেজ ছেড়েছে। আর সকলেই যখন কলেজে পুনঃপ্রবেশ করলো, এরা চার বন্ধু তখনো আর কলেজে গেলো না: অথচ আশু কর্তব্য ঠিক করতে না পেরে সখারাম দেউস্করের "দেশের কথা" আর ব্রহ্ম-বান্ধব ইত্যাদির জোরালো লেখা প'ড়ে এবং

একটা কোচিং ক্লাস খুলে দিন কাটিয়ে যাচ্ছিলো। কলেজে আর গেলো না ব'লে ওদের অভিভাবকরা বিরক্ত হ'তেই ওরা ক-জনে একটা পোড়ো বাড়ি ভাড়া ক'রে বাসা বাঁধলো। তাতে অভিভাবকরা খুশি হ'লেন না। তবে নিজ বাড়িতে ওরা সমান যাতায়াত ক'রে যোগাযোগ বজায় রাখলো ব'লে নিতান্ত "দূর-ছাই" করতে পারলেন না পরিবারের অপর সকলে। এমন সময় সুমথ পেয়ে গেলো তাদের, ইস্কুলের জন্য।

সেই ১৯২২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বটতলা ইস্কুল বহাল তবিয়তে বেড়ে চলছিলো। স্বাধীনতার পর দুটো নয়, তিনটে নয়, চারটে বছর কেটে গেলো যখন, তখন সুমথ সকল রকম দেশকর্ম হ'তে অবসর নিয়েছে। চাকুরিতে অবসর পেয়েছে প্রায় দু-বছর আগে। বৈদ্যনাথধামে বিধবা মা-কে নিয়ে বসবাস করছে। সংসার দেখছে ছোটো ভাই। একটি মেয়ের পর আর কোনো সন্তান না হওয়ায় তার অবকাশ যথেষ্ট। কাজেই যথেষ্ট রকম খেটেখুটে জমিজমা এবং চাকরী সে ভালো ভাবেই বজায় রেখে চ'লেছে। সুমথ মা-কে দেবতার মতো ভালোবাসতো ব'লে আর দশের কাজ বেশ সহজেই চ'লে যাচ্ছিলো ব'লে সর্বকর্মপরিত্যাগী হ'য়ে মাতৃসেবায় ও [illegible] লেখাগুলি পুনর্বার পড়তে আত্মনিয়োগ করলো দেওঘর-নিবাসে। মধ্যে মধ্যে বটতলা ইস্কুলের খবর রাখতো ও পেতো। সম্প্রতি প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্র তাকে দুঃসংবাদে বিব্রত ক'রেছিলেন। বটতলা ইস্কুল এখন জগত্তারিণী উচ্চবিদ্যালয় হ'য়েছিলো। সরকারী সাহায্য-ও পাচ্ছিলো ইংরেজ আমলে। স্বাধীন আমলেও সাহায্য হ'তে বঞ্চিত হয় নি। কিন্তু অধুনা, প্রধান শিক্ষকের বি. টি. ডিগ্রি না থাকায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটির রীতিমতো অভিযোগ থাকায় শিক্ষাবিভাগ তাঁকে সরাতে চেয়েছেন এবং এম. এ. বি. টি. ডিগ্রীধারী এক ব্যক্তিকে সহকারী শিক্ষকরূপে নিয়োগ ক'রে আশু ভবিষ্যতে তাঁরই ধাক্কায় নরেন্দ্রকে বহিষ্কৃতি দিতে চাইছেন।

খবরটি পেয়ে সুমথ বিষণ্ণ হ'লো। সব খবর জানবার জন্য পত্র দিয়ে নরেন্দ্রকে আনলো বৈদ্যনাথধামে। নরেন্দ্র দেখলেন সুমথ বেশ বৃদ্ধ হ'য়েছে আর সুমথর মা অতিবৃদ্ধা হওয়ায় অকর্মণ্য। অতো বয়সে-ও সুমথ মায়ের সকল শুশ্রূষা নিজ হাতেই করে, মায়ের পথ্য ও নিজের আহার্য তৈরি করে..

মায়ের ছোটোখাটো ফরমায়েস তামিল করে। নিজে অনেক শীর্ণ হ'লেও অসুস্থ হয় নি সুমথ।

অনেক কথা-বার্তার পর নরেন্দ্র বললেন, "কাজ গেলেও আমার অসুবিধে হবে না। হাজার খানেক টাকা যা পাবো, তা নিয়ে কিছু মাস স্বচ্ছন্দে চলবে। তারি মধ্যে একটা হিল্লে হ'য়ে যাবে। আপনি ভাববেন না।" সুমথ এ-কথায় শান্ত হয় না। সে জানে কী অবস্থায় নরেন্দ্র ও তার বন্ধুদের সে এনেছিলো, কতো অল্প বেতনে খাটিয়েছিলো, কেমন ক'রে একটু একটু ক'রে নব্বুইজনের ছাত্রসমষ্টি বর্তমানে সাত শত সংখ্যায় এসে পৌঁচেছে; অধিকন্তু, বটতলা ইস্কুলের বহুজনবিদিত এতোখানি সুনামের মূলে নরেন্দ্রের ত্যাগ কতোখানি তা কার-ই বা অজানা? আবার সংকট এই যে, নরেন্দ্রের তিন সংগী এখন আর কেউই ইস্কুলে নেই। একজন বিবাহাদি ক'রে সংসারী ও চাকুরীজীবী। দ্বিতীয়জন কংগ্রেসের সেবা ক'রে কাটাচ্ছে; তৃতীয়জন কম্যুনিস্ট; লোকে বলে এক বিধবাকে নিয়ে তার গার্হস্থ্য। এই কলংক কাহিনী সত্য না কল্পিত, সে-তল্লাস করার মতো ছোটো মন নরেন্দ্রের নয় ব'লেই সঠিক খবর সে জানে না।

বৈদ্যনাথ থেকে নরেন্দ্র ফিরে এসে শুনলেন, ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষা-বিভাগের সাহায্যে ছাড়পত্র প্রায় সাব্যস্ত ক'রে ফেলেছেন, তবে সহকারী অপ্রধান এক শিক্ষক হ'য়ে থাকলে তাঁর অন্ন খাবেন না কমিটি। এদিকে সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে এসেছেন এক নূতন মানুষ। তিনি উত্তরবংগ থেকে উদ্বাস্তু; শিক্ষাতত্ত্ব বিদ্যায় বিশারদ, অর্থাৎ এম. এ-ইন্-এডুকেশন। সেই এম. এ. বি. টি ভদ্রলোক আসতে সম্মত হন নি ব'লেই উত্তরবংগের এই ভদ্রলোকটিকে নিযুক্ত করা হ'লো।

সেদিন কমিটির মিটিং। একঘণ্টা আগে সম্পাদক সুধীর ঘোষ নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় উপস্থিত হ'লেন। তার আধ ঘণ্টা পূর্বে নরেন্দ্র খবর পেয়েছেন, সুমথ তার অতিবৃদ্ধ মা-কে রেখে হঠাৎ হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে মারা গেছে; মৃত্যুকালে তার ছোটো ভাই ও ভাইঝি উপস্থিত ছিলো। এই পত্রসংবাদ প্রত্যক্ষ সংবাদরূপে দ্বিতীয়বার শুনলেন সম্পাদক সুধীর ঘোষের মুখে। তিনি শোনালেন বেশ একটু স্বস্তিতে। কেননা, গ্রামের পাঁচজন

নরেন্দ্রবাবুর জন্য অবহিত—চিন্তিত; এবং সুমথকে সকলেই ভালোবাসে। সুমথর দেওয়া মানুষকে বিদায় করলে পল্লীতে বাস করা অস্বস্তির হবে। অবশ্য, সম্পাদক সুধীর ঘোষ জেদী মানুষ। গ্রামের জনমত অগ্রাহ্য করতে তাঁর অক্ষমতা তো নেই-ই; বরং যুদ্ধ করার আহ্লাদ আছে।

সুমথর জন্য মনটা নরেন্দ্রের ভালো ছিলো না। তিনি সুধীরবাবুর কথাগুলি শুনছিলেন মনোযোগ দিয়েই, তবে উত্তর দিচ্ছিলেন কম-ই। সুধীরবাবু ভাবলেন, নিজের চাকুরী-সংকটের জন্যই এ-রকম অল্পবাক হচ্ছেন তিনি; কিন্তু নরেন্দ্রের বাক্যস্ফূর্তি যে স্বল্প হচ্ছিলো, নরেন্দ্র নিজে তা বুঝতে পারেন নি। তিনি সুমথর জন্য বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক।

শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ ব্যক্তিটির তিন মাস নবীসী কাল ধার্য হ'য়েছে! তাঁকেই কেন প্রধান শিক্ষক করা হবে না—এই প্রশ্ন নরেন্দ্র করলেন। তাতে সুধীরবাবু বললেন, "ছোক্‌রা বয়েস। তা ছাড়া এডুকেশনে এম. এ ডিগ্রিটা ঠিক কী বস্তু তা আমরা বুঝছি না। তার চেয়ে উনি থাকুন সহকারী; আর প্রধান শিক্ষক আনা হোক্‌ এক এম. এ. বি. টি। এই এম· এ· বি· টি মানুষটিকেই সহকারী প্রধানরূপে আনার কথা ছিলো। তখন তিনি আসতে সুবিধা পান নি। এইবার আর তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া এখন আর সহকারীর পদ নয়; প্রধান শিক্ষকের পদে আসতে অবশ্যই সুবিধা ক'রে নেবেন।

নরেন্দ্র যখন জানালেন তিনি একজন সাধারণ সহকারী হ'য়ে থাকতে চান না, চাকরী তিনি ছেড়েই দেবেন, তখন সুধীরবাবু মহা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। বললেন, "আহা! সে কি? সারাটা জীবন দশের কাজ ক'রে সঞ্চয় তো আর করেন নি? খাবেন কী? না, না; আপনি সহকারীই থাকুন-না।। আপনার শ্রদ্ধা মারে কে?" শুনে নরেন্দ্র চমৎকার একটি হেসে উঠলেন। সুধীরবাবু ভাবলেন, এ-রকম পাগল-ও থাকে?

জগত্তারিণী উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মকর্তৃসভার জরুরী একটি অধিবেশন বসেছে। অধিবেশন যে জরুরী তার কারণ সরকারী শিক্ষাবিভাগ শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে যে সব শিক্ষক বিশেষ ভাবে শিক্ষিত নন, তাদের প্রধান শিক্ষক রাখতে চান না। কাজেই নরেন্দ্রকে স'রে যেতে হবে। নরেন্দ্র বিনা ক্ষোভেই প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে দিতে সম্মত, কিন্তু নূতন কোনো ব্যক্তিকে প্রধান শিক্ষকরূপে নিয়োগ না ক'রে সহকারী প্রধান শিক্ষক জীবনকৃষ্ণ দত্তকেই যাতে প্রধান শিক্ষক করা হয় সেজন্য জেদী।

সভার অধিবেশনে নরেন্দ্র যুক্তি এই দিলেন যে, জীবনবাবু শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ। বি. টি তো বটে-ই। অধিকন্তু বি. এ অনার্স নিয়ে পাশ ক'রে-ছিলেন। অবশ্য তাঁর বয়স এখনো তেত্রিশ পার হয় নি। শিক্ষকতা করতে করতে নানা অবস্থাবৈগুণ্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এম. এ পাশ করতে জীবনকৃষ্ণের বিলম্ব না হ'লে প'চিশ-ছাব্বিশেই তিনি ডিগ্রি নিয়ে প্রধান শিক্ষক পদের প্রার্থী হ'তে পারতেন। এখন তো তবু বত্রিশ। এই বত্রিশ বয়সটা অবশ্যই প্রৌঢ়ত্বের পরিণতি দাবী করতে পারে না। কিন্তু এই ক-মাস মেলা-মেশা ক'রে নরেন্দ্র যা বুঝেছেন তাতে তাঁর উপর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অকুণ্ঠেই দেওয়া চলে। তা ছাড়া অনবরত নূতন নূতন শিক্ষক-নিয়োগে বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-ব্যাপারে অসুবিধা ঘটে।

নরেন্দ্র সাধারণ একজন সহকারী শিক্ষক মাত্র থাকতে চান না। অর্থাৎ এ-বিদ্যালয় হ'তে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন। অথচ প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর এই জেদাজেদি। কাজেই সম্পাদক ও সভাপতিকে নরেন্দ্রের জিদ্ বিরক্ত ও ক্রমে ক্রমে ক্রুদ্ধ ক'রে তুললো। তখন নরেন্দ্র বললেন, "আমি ইস্কুল থেকে অবশ্যই বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এখানে নানা রকমে কাজকর্ম করার ফলে বিদ্যালয়ের উপর আমার যে-মমতা জন্মেছে, তারই বশে বিদ্যালয়ের কল্যাণকল্পে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, এখনই আপনারা প্রধান শিক্ষক বাইরে থেকে নিয়ে আসবেন না। [illegible] সুযোগ দিন।"

নরেন্দ্রের আগ্রহাতিশয্য সম্পাদক ও সভাপতির অত্যন্ত অরুচিকর বোধ হ'লো। তাঁরাও জিদ্ ধরলেন নূতন প্রধান শিক্ষকই আনার জন্য। যাঁকে মনে ক'রে তাঁরা এ সব প্রস্তাব করলেন তিনি যে অভিজ্ঞ ও সুপটু প্রধান শিক্ষক হবেনই, সে-নৈশ্চিত্য সম্পাদক জোর গলায় সভার সকল সদস্যকে জানিয়ে দিলেন। ভাবী প্রধান শিক্ষক যে সম্পাদকের পরিচিত একথা সকলেই বুঝলেন।

অবশেষে নরেন্দ্র পকেট থেকে একখানি লিপি বাহির করলেন। সভাস্থ সকল সদস্য কৌতূহলী বোধ করলেন। নরেন্দ্র বললেন, "নূতন কোনো ব্যক্তিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করলে সকল শিক্ষকেরই আপত্তি। তাঁরা শিক্ষকসভায় এ-সম্পর্কে প্রস্তাব সাব্যস্ত ক'রে আপনাদের কাছে পেশ করবার জন্য আমাকে দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রস্তাব পেশ না করবারই ইচ্ছা ক'রে-ছিলুম। ভেবেছিলুম আপনাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবো। তা যখন সম্ভব হ'লো না, তখন এই প্রস্তাব আপনাদের অবগতির জন্য দিচ্ছি।"

লিপিখানি সভাপতি পড়লেন। সম্পাদক পড়লেন। অন্যান্য সদস্য-দের হাত-ফেরাফেরি হ'য়ে সম্পাদকের কবলে এলো। সভাপতি ও সম্পাদক ক্রুদ্ধ হ'লেন। সভাপতি বললেন, "এ-সব তা হ'লে আপনারই কাজ। চ'লে যেতে বাধ্য হচ্ছেন ব'লে আপনি শেষ চাল চেলে যাচ্ছেন। জীবনকৃষ্ণবাবু আপনার অনুগত, তাই তাঁর জন্য আপনার এতো সাগ্রহ সুপারিশ। শিক্ষকদের এই প্রস্তাব তো প্রকারান্তরে কর্মকর্তৃসভার প্রতি অনাস্থাসূচক।" সম্পাদক রুখে ব'লে উঠলেন, "নিশ্চয়ই।" অন্যান্য সদস্যদের কেউ কেউ তাতে আপত্তি জানালেন। অন্যতম সদস্য বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, "দেখুন, শিক্ষাব্যাপারটি শিক্ষকরাই বোঝেন ভালো। নরেন্দ্রবাবু এম. এ বা এম. এ-ইন্-এডুকেশন নন। বি. টি পর্যন্ত নন। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও কুশলতা আমরা জানি। সহকারী প্রধান শিক্ষক জীবনবাবুকে তিনি তিন মাস যাবৎ দেখে আসছেন। তিনি যখন তাঁকে প্রধান শিক্ষকরূপে নিয়োগ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন এবং অন্য সকল শিক্ষকই যখন সেই মতে একমত, তখন তদনুযায়ী কাজ করলেই সমুচিত কাজ করা হবে ব'লে আমার বিশ্বাস।"

এই কথায় সভাপতি ধৈর্যচ্যুত হ'য়ে ব'লে উঠলেন, "নরেন্দ্রবাবু তাহ'লে

আপনাকে-ও হাত করেছেন?" কথাটা বাতাসে পড়বামাত্র বৃন্দাবনবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন। পরক্ষণেই ব'সে প'ড়ে পকেট থেকে কলম বের ক'রে চিঠির প্যাড্‌খানি টেনে একপৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে পদত্যাগপত্র লিখে ফেলে সভাপতির সম্মুখে ফেলে দিয়ে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করলেন। নরেন্দ্রবাবু উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁকে কিছু উচ্চস্বরেই এরূপ কার্য হ'তে নিবৃত্ত হ'তে অনুরোধ করলেন, বৃন্দাবনচন্দ্র সদর্পে সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে তীব্র উক্তি ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চ'লে গেলেন।

তারপর সভার কার্য আর বেশিক্ষণ চলে নি। বৃন্দাবনবাবুর পদত্যাগ-পত্র অবশ্য ধার্য হ'লো না। অনুরোধে সম্মত ক'রে তাঁকে সদস্যপদে রাখতে চাইলেন সকলেই। এই আলোচনার শেষে নরেন্দ্র বিদ্যালয় পক্ষকে জানালেন নিজের কথা। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় তিনি বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিতে চান—জানালেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে একমাসের মেয়াদেই ছাড়পত্র দিতে রাজি হ'লেন;—অর্থাৎ পাপ যতো শীঘ্র বিদায় হয়, ততোই স্বস্তিকর। প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ভাবী প্রধান শিক্ষককে একখানি পত্র দেওয়া হ'লো। পত্রের খস্‌ড়া সম্পাদক রচনা করলেন, সভাপতি দেখে দিলেন। সভায় এমন সব সিদ্ধান্ত এমনভাবে ধার্য হ'লো যে, আইনানুসারে সেগুলি কানুন-বিরুদ্ধ। কিন্তু এমন বে-আইন বহু প্রতিষ্ঠানেই এদেশে চলে। স্বাধীনতার আগেও চলতো; স্বাধীনতার পরেও চলছে। নিন্দুকে বলে অধুনা কিছু বেশিই চলছে বে-আইন।

সভাভঙ্গের সময় সম্পাদক নরেন্দ্রকে বললেন, "আপনি এক মাসের নোটিসই দেবেন। আমরা তিন মাসের নোটিস চাই না। সরকার পক্ষ এ-বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্তে আপত্তি করবেন না।" নরেন্দ্র এই কথায় বললেন, "হ্যাঁ, সে-নিয়ম আমি জানি। তবে এই একমাস যদি আমাকে ছুটি দেন, ভালো হয়। জীবনবাবু ওয়াকিবহাল। আমি না থাকলেও চালাতে পারবেন। তা ছাড়া ছুটিতে থাকলেও আমি আসবো হামেশাই।" সম্পাদক বললেন, "আসেন ভালোই; তবে দরকার তেমন নেই। জীবনবাবু ডিগ্রিধারী লোক। এ-টুকু আর পারবেন না?" সভাপতি বললেন, "কিন্তু ছুটিটা এতো বেশিই দরকার কেন জানতে পারি কি?" নরেন্দ্র বললেন, "একটা

কাজকর্ম খ্‌ুজতে হবে তো?" সম্পাদক বললেন, "অবশ্যাই, অবশ্যই। তা যদি বলেন, আমার তো অনেক সাহেব-স্‌ুবোর সঙ্গে জানাশ্‌ুনা আছে"—কথা তাঁর শেষ হ'লো না। নরেন্দ্রের সবিনয় প্রত্যাখ্যান সকলকে তাঁর পৌর্‌ুষে বিস্মিত করলো।

সভাভঙ্গের পর ব্‌ৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়িতে অন্যান্য সদস্যদের তিনজন গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ইস্কুল সম্পর্কে নানা কথাবার্তা হ'লো তাঁদের। এই বটতলা ইস্কুল কেমন ক'রে ক্ষ্যাপা স্‌ুমথর প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠলো, কেমন ক'রে নরেন্দ্র ও তাঁর বন্ধ্‌ুদের তিনি সংগ্রহ ক'রেছিলেন, কি অক্লান্ত ত্যাগ ও সেবায় নরেন্দ্র ও তাঁর বন্ধ্‌ুরা ইস্কুলের প্রাথমিক গ্‌ৃহকে একটি নয়, দ্‌ুটি নয়, তিনখানি বড়ো বড়ো দ্বিতল ভবনে শ্রীব্‌ৃদ্ধ ক'রেছেন, তিন বন্ধ্‌ুর বিদায় সত্ত্বেও কেমন ক'রে নরেন্দ্র ইস্কুলকে ভিতরে-বাহিরে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছেন, 'প্রবাসী' ও মডার্ণ রিভিউ-এর সম্পাদক, সাংবাদিক ও দেশ-সেবাব্রতী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাশ্চাত্ত্য দেশ ভ্রমণ সমাধা ক'রে এই বিদ্যালয়ে প্‌ুরস্কার বিতরণ করতে এসে বিদ্যালয়কে তথা নরেন্দ্রকে কেমন অকুণ্ঠ ভাষায় অত্যন্ত বেশি প্রশংসা ক'রে গেছেন—এই সব প্‌ুরা কাহিনী ব্‌ৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ি চা পান করতে করতে সদস্যরা আলোচনা করতে থাকলেন আর সেই সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি গ্‌ুপ্ত সংবাদ প্রকাশ ক'রে ফেললেন অবশেষে।

তারিণীবাব্‌ু বললেন, "নরেন্দ্রবাব্‌ুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। বিবাহ করেন নি; একা মান্‌ুষ। ' সংসারের দায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু সঞ্চয়-ও তো নেই কিছ্‌ু। থাকবেই বা কি-ক'রে? মাস্টারিতে মান্‌ুষ পায়-ই বা কতো?" শ্‌ুনে সকলেই অন্‌ুকম্পা প্রকাশ করলেন। অবশেষে যোগীনবাব্‌ু বললেন, "গবর্ণমেণ্ট বি. টি ছাড়া হেড্‌মাস্টার রাখবে না ব'লে সাধারণ ইস্তাহার থাকলেও, কমিটি জোর দিলে নরেন্দ্রবাব্‌ুকে রাখা যেতো। তবে ওঁকে সরাবার ইচ্ছা সম্পাদকের স্‌ুধ্‌ু স্‌ুধ্‌ু নয়। বিশেষ কারণ আছে।" এই কথায় অন্যান্য সকলে কুত্‌ূহলী হ'তেই যোগীনবাব্‌ু বললেন, "স্‌ুধীরবাব্‌ুর ভাইপোটি গতবারে ম্যাট্রিকে যেতে পায় নি, ইংরেজি ও বাঙ্‌লায় ফেল্‌ ছিলো ব'লে। তা ছাড়া সভাপতির ছেলেটির বয়স বদল করতে নরেন্দ্রবাব্‌ু সম্মত হন নি।

নরেন্দ্রবাবু সরকারী রাস্তায় বয়স বদলাবার কথা বলেন। সভাপতি অতো-শতো করার পক্ষপাতী নন। কাজেই নরেন্দ্রবাবুকে খাতাপত্রে বয়সের হিসাব ঘসাঘসি করতে বলেন পরোক্ষভাবে। নরেন্দ্রের পক্ষে সে-কাজ অসম্ভব।"

ইত্যাদি রকমারি গুপ্ত খবর পেয়ে সকলে নরেন্দ্রের উপর দ্বিগুণ দরদী হ'য়ে উঠলেন। নরেন্দ্রকে চাই-ই। কিন্তু জেদী নরেন্দ্র থাকবেন না। তা ছাড়া শিক্ষাবিভাগের বিশেষ এক ধুরন্ধর ব্যক্তি সুধীরবাবুর দূর-আত্মীয়। কাজেই নরেন্দ্রের অনুকূলে তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হবে না।

চা পান অনেকক্ষণ শেষ হ'য়ে গেছে। সকলেই যখন আনন্দ প্রকাশ করছিলেন বৃন্দাবনচন্দ্রের সদস্যপদে থাকার সম্মতিতে তখন বৃন্দাবনের মেয়েটি ভৃত্য সঙ্গে ক'রে ঘরে এলো। চায়ের পাত্রগুলি ভৃত্য সরিয়ে নিলো। কন্যা বৃন্দাবনকে প্রশ্ন করলো, "বাবা, তুমি কি এ বেলা ভাত খাবে?" বৃন্দাবন বললেন, "না মা, দুখানা লুচিই করো। শরীরটা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে।" কন্যা আদেশ শুনে চ'লে গেলো। বন্ধুরা যখন বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়ে তো বি. এ পাশ করলো। এবার?" বৃন্দাবন বললেন, "আমি বিয়ে দিতে চাই। ও চায় এম. এ পড়তে। মেয়ে বোধ হয় বিয়ে-থা করবে না।" কথাটা শুনেই তারিণী তৎক্ষণাৎ একটু বেশি জোর গলাতেই ব'লে উঠলেন, "ছেরেপ বাজে কথা। মেয়েমানুষ আবার বিয়ে করবে না?" বৃন্দাবন বললেন, "না হে। মেয়েটার রকম আলাদা। মটে-টঠে নিয়মিত যায়। তা ছাড়া শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে, পণ্ডিচেরিতে যেতে চায়। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সম্বন্ধে ওদের এক অধ্যাপকের কাছে শুনেছে। ছোক্‌রা অধ্যাপক। ব্রিলিয়াণ্ট্। মেয়েই বলে।"

কথাটা শুনে যোগিনীবাবু বললেন, "তবে তার সঙ্গেই সম্বন্ধ করো-না। ব্রিলিয়াণ্ট্ হবে।' কথাটায় অপর সকলে হেসে উঠলো। অমনি কন্যা কমলা এসে পড়লো ঘরে। বললো, "বাবা, নরেন্দ্রবাবু নাকি ইস্কুল ছেড়ে দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ মা।"

"কেন বাবা?"

"সে অনেক কথা।"

"কিছু কিছু জানি। কিন্তু তোমরা সম্পাদক আর সভাপতিকে আটকাতে পারলে না?"

"নরেন্দ্র নিজেই চান না আর কাজ করতে।"

"তোমরা ওঁকে হারালে ইস্কুল নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

"তোর এই মত?"

"সবারই এই মত হওয়া উচিত। উনি অসাধারণ লোক। এক সভায় বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ওঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম। আশ্চর্য রকমের বলতে পারেন। বাবা, জানো কি উনি একটি অসহায় মুসলমান মেয়েকে মানুষ করছেন?"

"সে কি রে?"

"হ্যাঁ গো, সম্প্রতি। হাঙ্গামার পর কুড়িয়ে পেয়েছেন। মেয়েটার বয়স বোধ হয় এগারোর বেশি হবে না। সেই তো এখন ওঁকে রেঁধে খাওয়ায়। হাত পুড়িয়ে ওঁকে আর খেতে হয় না।"

শুনে সকলেই অবাক হ'লো। তারিণী বললেন, "কথাটা শুনেছিলুম বটে; তবে মেয়েটা মুসলমান, জানতুম না।"

[৩]

"আম্না মা?"

ডাক শুনে একটি এগারো বছর বয়সের রোগা ছিপ্‌ ছিপে মেয়ে জাম-রঙের ডুরে শাড়ি প'রে ঘরে এসে দাঁড়ালো। আম্না জানতো ঘরে তার বাবা নরেন্দ্রই আছেন। কিন্তু চৌকাটে পা ঠেকিয়েই দেখলো ঘরে অন্য এক ব্যক্তি। এর পূর্বে তাঁকে সে দেখে নি। আরো আশ্চর্য হ'লো যখন চোখ পড়লো তৃতীয় মানুষটির উপর। সেটি একটি তরুণী যুবতী। বেশ নরম মুখখানি তার। চোখ দুটি বড়ো বড়ো। আম্নার নিজের চোখ-ও খুব বড়ো। নরেন্দ্র সেইজন্য তাকে মাঝে মাঝে আঁখি ব'লে ডাকেন। ডাকনামের অর্থটাও আম্নাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য আঁখি শব্দের অর্থ তার অজানা ছিলো না।

ইস্কুল কমিটির বৃন্দাবনবাবু সকন্যা এসেছেন। মুসলমান মেয়ে মানুষ করার খবরে নরেন্দ্রের সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল চৌদুনে চ'ড়েছে। যেটুকু খবর কমলা বাপকে দিয়েছে, তাতে বৃন্দাবনের সংবাদপত্রের কৌতূহল মিটেছে, কিন্তু আন্তরিক আবেগ-পিপাসা তৃপ্ত হয় নি।

নরেন্দ্রকে আম্না বাবা বলে। মুসলমানী মেয়ে অনূঢ় প্রৌঢ় হিন্দু ব্রাহ্মণকে বাবা বলে। '৪৬ খৃীষ্টাব্দের সাংঘাতিক জাহান্নামির নাড়া কে না খেয়েছে? হিন্দুর কতো হাজার মেয়ে নিখোঁজ। সেবাশ্রমগুলি কতোজনকে খুঁজে পায় নি তা কে জানে? মুসলমানী এই নিখোঁজ মেয়েটিকে পাকিস্তানীরা কেউ খোঁজ করলো না? আইবুড়ো, জনসেবী, আদর্শবাদী, ভাবুক নরেন্দ্রকে তার ভার বইতে হ'লো? নরেন্দ্র আম্নাকে বললেন, "আম্না মা, আজ মাছের ঝোল কে রাঁধবে? না, না; মেয়ে আজ নয়। আজ আম্না-বাবার ছুটি। আজ বাবা রাঁধবে।" আম্না "না" ব'লেই চ'লে গেলো।

নিতান্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে আমিনা। তাই এগারো বছর বয়সে ডাল ঝোল চাপাতে নামাতে অবশ্যই পারে। ছোটো হাঁড়ির ভাত-ও। তবে ভাতটা নামাতে বা ফেন ঝাড়তে নরেন্দ্র তাকে সজোরে নিষেধ করেছেন। আদেশ দিলে নরেন্দ্রের কথা ছেলেরাও যেমন নড়-চড় করতে পারে না, আমিনা-ও তেমনি। তার মানে নরেন্দ্র ঘরেও জবরদস্ত মাস্টার? না। নরেন্দ্র ঘরে

বাইরে কোথাও মামুলী মাস্টার নন। তিনি পুরুষ। স্নেহবৎসল পুরুষ। অতি সহজেই ভালোবাসেন। তাই সত্যিকার শাসনের পৌরুষ-ও তাঁর আছে। অন্যায় ক'রে ফেলে আমিনা-ও বিব্রত হয়। কিন্তু অন্যায় ক'রে ফেলে আন্না যখন স্পষ্ট ক'রে নরেন্দ্রের চোখে চেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন নরেন্দ্র কিছু বলতে পারেন না। সুধু বলেন, "চায়ের পেয়ালা ভেঙেছো তো? তা, আমি-ও তো পরশু ভেঙেছিলুম একটা। আমাকে কে বকবে?"

মিথ্যে কথা। নরেন্দ্র ভাঙেন নি। মেয়ে-র হ'লো অবিশ্বাস। জেরা করলো সে। জেরায় প'ড়ে অবশেষে মিথ্যার উপর মিথ্যা বানাতেই হ'লো। বলতে হ'লো ভাঙা পেয়ালার বদলে তুলে-রাখা নতুন পেয়ালাটা তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে রেখে এসেছিলেন।

আন্নাকে কখনো-কখনো আমিনা-ও বলেন নরেন্দ্র। বারে খুবই অল্প ব্যবহার করেন ঐ ডাকনাম। যখন আন্না-মা বলেন তখন আমিনা চোখের পাতা ফেলে খুশির ঢোঁক গিলে নেয়। আবার যদি-বা আমিনা নাম শোনে তবে অল্প একটু তৃতীয়ার চাঁদ-হাসি মুখখানিতে প্রলেপ দেয়। নরেন্দ্র আন্না-মা বলেন মুখে; মনে ডাকেন ঐ-ডাকটির পুরো নাম—আন্নাকালি।

বিস্মিত বৃন্দাবন আমিনার ইতিহাস অনেকখানিই জেনে নিলেন। কমলা শুনতে শুনতে অবাক্ মেনে গেলো। কলকাতায় কালিঘাট অঞ্চলে মেয়েটিকে যখন নরেন্দ্র অসহায় দশায় কাঁদতে দেখেন, তখন রাত্রি আটটা। বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরবার সময় নয় সেটা। অমন বিপর্যস্ত গণ্ডগোলের দিনে কয়েক দিন তো স্থানান্তরে যাওয়া-আসা অচল। সেদিন এমনিই বন্ধুর বাড়ির রাস্তায় কাছা-কাছি ঘোরা-ঘুরি করছিলেন নরেন্দ্র। অকস্মাৎ বিপন্ন মেয়েটাকে পেয়ে গেলেন তিনি। মেয়েটা নরেন্দ্রকে বলেছিলো, তার বাবা ছিলো না। ম'রে গিয়েছিলো দু'বছর আগে। মা, সে আর ছোট্ট ভাইটি তাদের পরিবারে। মাকে ওরা লাঠি দিয়ে মেরে ফেলেছে; ছোট্ট ভাইটাকে-ও। আমিনা পালিয়ে ওই গলিটাতে চ'লে আসায় বেঁচে গেছে। নরেন্দ্র বুকে ক'রে মেয়েটাকে বন্ধুর বাড়ি এনে ফেলেন। বন্ধু আপত্তি করলে-ও নরেন্দ্র শোনেন নি। তার তিন দিন পরে 'আন্না-মা' ডাকতে ডাকতে, আমিনাকে 'বাবা'-ডাক ডাকাতে ডাকাতে ভবানীপুর গ্রামের নিজস্ব বাসাবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত

করেন মেয়েটিকে। দশ মাইল দূরে শ্রীরামপুর শহর। সেইখানেই প্রথম বছরটা আম্নাকে রেখেছিলেন এক মুসলমান বন্ধুর কাছে। সে নরেন্দ্রের সহপাঠী ছিলো। নরেন্দ্র শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্র দিলেন। শ্রীরামপুর থেকে শনিবার আম্নাকে নিজের বাসায় আনতেন, আবার সোমবার সকালে রেখে এসে ইস্কুল করতেন। সেইখানেই রজ্জবের বাড়ি খাওয়া সেরে আসতেন।

নরেন্দ্র-চরিত্রের অতীত গৌরব কাহিনী শুনে কমলা বললো, "মাস্টার মশাই, আপনি আর বাবা গল্প করুন, আমি আম্নার সঙ্গে থাকি; ওর ঝোল রান্নার কাজে সাহায্য করি। আমার হাতে খাবেন তো? না কি "মুসলমানী না হ'লে আপনার রান্নায় কারো অধিকার নেই?" নরেন্দ্র শুনে বললেন, "সেটা বাড়াবাড়ি হবে। আমি হিন্দু-কমলা আর মুসলমানী-আমিনা দুজনের দুহাতের মিলিত রান্না মাছের ঝোল আজ খাবো।" কথা শুনে কমলা বাড়ির ভিতর চ'লে গেলো।

বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, "নরেন্দ্রবাবু, ইস্কুল তো ছাড়লেন, এইবার চলবে কি ক'রে? জানতুম একা মানুষ; এখন তো দেখছি রীতিমতো সংসার। আচ্ছা, ওকে মানুষ করবেন বরাবর তো?"

"নিশ্চয়। ও যদি পালিয়ে না যায়।"

"সে-সম্ভাবনা আছে নাকি?"

"দুনিয়ায় কোন্‌টা অসম্ভব?"

"কিন্তু, তার পর? যখন ওর বয়স ষোলো হবে?"

"ষোলো পার হ'লেই ওর বিয়ে দিয়ে দেবো।"

"কেমন ক'রে দেবেন? হিন্দু-ঘরে?"

"মুসলমান-ঘরেই খোঁজ করবো। তবে, বুঝে দেখবো, আমিনার নিজের মনটা কী চায়?"

"এখন কী করবেন?"

"আপাততঃ আপনারা নাকি তিন মাসের মাইনে আমাকে দেবেন শুনছি। গভর্ণমেণ্ট তাতে রাজি হবে কিনা জানি না। সম্পাদকের এই দয়া আমি প্রত্যাখ্যান করবো না। এই দাক্ষিণ্যদ্বারা তিনি অবশ্য আমাকে

ছোটো ক'রে দিয়ে মনে-মনে দৃপ্ত থাকতে চান। আমি কিন্তু মনে-মনে ছোটো না হ'য়েও সে-দাক্ষিণ্য দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রেই নেবো। তারপর, ইতিমধ্যে প্রভিডেন্ট্ ফণ্ডের টাকাটা তুলে ফেলতে পারবো। যৎসামান্য হাজারখানেক টাকা পোষ্ট অফিসেও গচ্ছিত আছে।"

"তারপর?'

"অতো তারপর?"

"হ্যাঁ, একা তো নন?"

"কাজ খুঁজে নেবো।"

"অফিসে চাকরি করতে আপত্তি আছে?"

"কেন, অন্যত্র মাস্টারি জুটবে না বলছেন?"

"হেড্ মাস্টারি তো নয়?"

"না-ই বা হ'লো? সাধারণ সহকারী হ'য়ে কাজ করবো। অন্যত্র সাধারণ শিক্ষক হ'তে আটকাবে না। সেখানকার ছাত্ররা অপরিচিত।"

"সাধারণ সহকারী হ'য়ে কতোই বা পাবেন?"

"তদ্বির করতে পারলে আশি পেতে পারবো।"

"বাড়ির ভাড়াই তো তিরিশ?"

"আপনাকে আর জিজ্ঞাসা করতে দেবো না। তবে আপনার দরদ ভুলবো না। যদি অসুবিধায় পড়ি, আপনাকে জানাতে কুণ্ঠিত হবো না। আমার সে-রকম অহঙ্কার নেই।"

এমন সময় কমলা এসে জানালো, "ঝোল চাপালুম। আন্না তরকারি কুটে দিলো।"

অতঃপর কমলা-ও ঘরে রইলো। আন্না মধ্যে মধ্যে এসে দরজার পাল্লায় হাত দিয়ে দাঁড়ালো। একবার নরেন্দ্রের কানে-কানে কী ব'লে চ'লে গেলো। কমলা কৌতূহল প্রকাশ করতেই নরেন্দ্র জানালেন, "ঝোলে জল বেশি থাকবে না কম থাকবে, আন্না জানতে চাইলো। আমার চুমুক দিয়ে ঝোল খাওয়ার অভ্যাস আছে।"

কখন ঝোল হ'য়ে গেছে। আন্না নামিয়ে রেখে এলো। বসলো নরেন্দ্রের গা ঘেঁসে। কমলা যখন বললো, "বসলে যে? ঝোল কতোদূর?"

আন্না বললো, "হয়ে গেছে। নামিয়ে ঠিক্ ঠাক্ ক'রে রেখে এসেছি। জালির মধ্যে একেবারে। বেড়াল মুখ শুকিয়ে ফিরে যাবে।"

এই কথায়, একদিন ঝোলের কড়া থেকে কেমন ক'রে মাছ খেয়ে নিয়েছিলো বেড়াল, সেই কাহিনী সংক্ষেপে বলতেই আমিনার সে কী হাসি। বললো, "বাবা, সেদিন কী খেলুম? দুধ ভাত। মাঝে মাঝে দুধ ভাত বেশ লাগে, না বাবা?"

মেয়েটির বাবা-ডাকটি খুব সহজ। খুব স্বতঃস্ফূর্ত। সম্প্রদায় আর সমাজের বেড়াটা খুঁটি আর খোঁটার না হ'য়ে যদি সুতো আর জালের হ'তো, তবে বোধ হয় মানুষের অগ্রগতি ক্ষিপ্রতর হ'তো। এই রকম চিন্তা বৃন্দাবন ও কমলাকে স্পর্শ করলো।

ওরা উঠলো। কমলা আন্নাকে বুকে চেপে ধরলো। আন্না বললো, "তোমাকে কী ব'লে ডাকবো?"

"যা ইচ্ছে।"

"বাবা, কী বলবো ওকে?"

"দিদি; কমলাদি। কেমন?"

"হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি কবে যাবে?"

"বাবা যেদিন নিয়ে যাবে।"

"আমি এসে নিয়ে যাবো।"

"হ্যাঁ বাবা?"

"হ্যাঁ। কমলা নিয়ে যাবে। আমি গিয়ে নিয়ে আসবো।"

"কমলা-দি, আমি কিন্তু তোমাদের হাঁড়ি ছুঁয়ে দেবো। আমি তো আর হিন্দু নই।"

"তোমার বাবা?"

"বাবা আর আমি একজাত্।"

"সে কী জাত্?"

"মানুষ। বাবা বলেছে।"

"বাবা বলেছেন?"

"তাই তো : না হ'লে ছোটোবেলার কথা জানবো কি-ক'রে? আমার ততো মনে নেই।"

আন্না'র চোখ ছলছল করলো। দেখে নরেন্দ্র তাকে কোলে বসিয়ে নিলেন। মাথায়, কপালে চুম্ খেলেন। কমলা অবাক হ'লো। কখন এক সময় আন্না ছুটে ঘর থেকে চ'লে গেলো।

বৃন্দাবনচন্দ্র সপ্রশ্ন মুখ তুলতেই নরেন্দ্র বললেন, "ওকে গত বছর সব কথা বলেছিলুম। কিছু কিছু মনে ছিলো ঝাপ্‌সা রকমের। রজ্জবকে সবিশেষ কিছু স্মরণ করাতে নিষেধ করলে-ও আশপাশ থেকে কিন্তু কিছু জেনেছে। আমি কেবল ওর জিজ্ঞাসা মতো ওর পারিপার্শ্বিক ওকে জানাতে দ্বিধা করি নি। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। এই কমলার বয়স যখন চোদ্দ তখন ওর যা মনের বয়স ছিলো, আন্না আগামী বছরেই সেই মন পাবে। জনে জনে মনের বয়সের তফাৎ হয়। ওটা মনস্তত্ত্বের কথা। সত্য কথা।"

ওঁরা উঠলেন। আন্না এলো। বিদায় নেবার পালা সারা হ'লে ওরা চ'লে গেলো। ঘরে এসে নরেন্দ্র বললেন, "আন্না, আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন বাবা?"

"ওরা পাজি লোক।"

"কমলাদি-রা? না, না; ওরা ভালো।"

"কমলা ভালো। ওর বাবা ভালো। ইস্কুলের আরো যারা কর্তা, তারা খারাপ।"

"তবে মাইনে পাবে কি-ক'রে?"

"অন্য কাজ করবো।"

"আচ্ছা।"

আন্না যেনো ভাবতে লাগলো।

অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকরূপে একমাসকাল-ও জীবনকৃষ্ণ বটতলা ইস্কুল চালাতে সময় পেলেন না। নরেন্দ্রের ছুটি শেষ হ'তে না হ'তে অর্থাৎ তিনি পদত্যাগপত্র অনুযায়ী বিদায় নিতে না নিতেই নতুন প্রধান শিক্ষক দুদিন বিনা বেতনে ইস্কুলে হাজিরা দিয়ে গেলেন। অফিসঘরে জমাট হ'য়ে ব'সে রইলেন। জীবনবাবু সমানে কাজ চালিয়ে গেলেন। যে সব ছেলে ইস্কুলের অন্দরমহলের-ও সংবাদ রাখবার মতো ইস্কুলকে ভালোবাসে এবং বুদ্ধিতে চালাক, তা'রা কিছু-কিছু কানাঘুসা শুনেছিলো মাত্র। নতুন হেড্‌মাস্টারের অফিস ঘরে অবস্থিতি তাদের আরো ব্যগ্র ক'রে তুললো। জীবনবাবুকে তা'রা টিফিন-ঘণ্টায় ছেঁকে ধ'রে প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণে জ্বালিয়ে তুললো। যতো তিনি ঘাঁটাতে চাইলেন না, ততোই ছেলেরা জিদ্‌ ধরলো। অবশেষে ঘণ্টা পড়তেই জীবনবাবু নিষ্কৃতি পেলেন।

জীবনকৃষ্ণ দত্ত পাবনার লোক। বহুদিন কলকাতায় থাকেন। দারিদ্র্য-বশতঃ কোনোক্রমে বি. এ পাশ ক'রেই শিক্ষকতা শুরু করেন। পরিশ্রমের গুণে ও কার্পণ্যের দক্ষতায় অল্প আয় থেকে এবং অনেক ছেলেকে বাড়িতে পড়িয়ে অর্থসঞ্চয় ক'রে বি. টি. পরীক্ষা দিলেন। তারপর দু'বৎসর ধ'রে শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ পড়লেন। মাসতুতো এক ভাই-এর সংসারে খাওয়ার খরচ দিয়ে রইলেন দু'বছর। বড়ো অঙ্কের বেতন নিয়ে তিনটি ছাত্র পড়িয়ে শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়ন সাফল্যের সঙ্গে শেষ ক'রে ফেললেন। তারপর জগত্তারিণী প্রথম শ্রেণীর ইস্কুল ব'লে এখানেই কাজ নিলেন। একটি ছেলের বাড়িতে পড়িয়ে থাকা ও খাওয়ার খরচ-ও বাঁচালেন।

জীবনবাবু ভেবেছিলেন নরেন্দ্র চ'লে গেলে তিনিই প্রধান শিক্ষক হবেন। কিন্তু নরেন্দ্রবাবু নিজে অনুকূল হ'লেও, এমন কি তাঁর জন্য অতো চেষ্টা করলে-ও সম্পাদক ও সভাপতি তৃতীয় ব্যক্তিকেই প্রধান শিক্ষকের পদে চাইলেন। কারণ আর কিছু নয়। [illegible] বয়স চল্লিশের অনেক নিচে এবং নরেন্দ্রবাবু তাঁকে সুপারিশ করেছেন। নরেন্দ্রবাবুর যতোটুকু

পরিচয় তিনি পেয়েছেন তাতে তাঁর মতো লোককে সরিয়ে প্রধান শিক্ষক হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা যায় না, কিন্তু ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রকে সরতেই যখন হচ্ছে তখন নিজ পদোন্নতিতে তাঁর আনন্দই হচ্ছিলো।

এখানে আসবার আগে জীবনকৃষ্ণ খবর নিয়েছিলেন যে, জগত্তারিণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিচক্ষণ, সুনিপুণ ও জনপ্রিয় হ'লে-ও সরকার পক্ষ এম. এড্ বা এম. এ. বি. টি-দেরই পেয়ার করবেন। মনের কোণে তাঁর এই কারণে একটি দুষ্ট না হ'লে-ও অশিষ্ট ইশারা ছিলো। কাজে কাজেই নরেন্দ্রবাবু যখন বিদায় নেবেন-ই, তখন তাঁরই পড়্‌তা। কিন্তু এ আবার কি? বরিশালের এই দীনবন্ধু মজুমদারটি তো রীতিমতো হাঙ্গাম।

নতুন প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু মজুমদার বরিশালের লোক। প্রথম দর্শনেই তাঁকে জেলের অধিকর্তা বা থানার দারোগা ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে। ভদ্রলোকের মুখে কী একটা ভাব প্রকাশিত, যাতে প্রথম দর্শনেই আলাপ করতে অনিচ্ছা হয়, দ্বিতীয় দর্শনে মুখোমুখী কথায় অস্বস্তি আসে, তৃতীয় দর্শনে চতুর্থ দর্শনের প্রয়োজনবোধ নিভে যায়। অথচ ভদ্রলোক ইংরেজিতে এম. এ। কথ্য ইংরেজিতে বিশেষ প্রশংসা আছে; ডিগ্রী-ও। অর্থাৎ ডিপ্লোমা ইন-স্পোক্‌ন্ ইংলিশ। বেশভূষা ও চালচলন সাদামাটা। 'ধুতি মিহি নয়; পাঞ্জাবী মোটা; জুতো মামুলী য়্যাল্‌বার্ট; মাথার চুল কদমছাঁটে কণ্টকিত; অর্থাৎ, যাকে বলে 'বেশ লোক'।

সুধীরবাবুর সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় সামান্যই। তবে কিনা, কমিটির মিটিং-এ তিনি এই সামান্য পরিচয়কে বহু পরিচয় ব'লে সকলকে দলে ভিড়িয়েছিলেন। তার ফলে, নরেন্দ্র গেলেও ইস্কুলের বিশেষ অসুবিধা হবে না—এইটি সকল সদস্যকে বোঝাতে আর বেগ পেতে হ'লো না।

এক সপ্তাহ দীনবন্ধু ইস্কুল করলেন। প্রথম দিনে নরেন্দ্র তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। তাতে দীনবন্ধু মজুমদার আশ্চর্য হ'লেন। আশ্চর্য হ'লেন নরেন্দ্রের ভাবুকতায়। ইস্কুল মাস্টার যে এই ধরণের বেহিসেবী ভাবুক হয়, তা তিনি এর পূর্বে জানতেন না। ভদ্রলোকের দৃষ্টির প্রসার কম। তাই তিনি জানতেন না যে দেশের অনেক কৃতীজন ইস্কুল মাস্টার ছিলেন। স্বদেশী যুগের অনেক অগ্নিকর্মী ছিলেন ইস্কুল মাস্টার।

নরেন্দ্র ও দীনবন্ধু অফিস ঘরে কথা শেষ করলেন। কথার শেষে নরেন্দ্র জানলেন, ছেলেরা তাঁকে বিদায়-অভ্যর্থনাসভায় নিয়ে যাবে। দীনবন্ধু-বাবু স্বয়ং তাতে আগ্রহ দেখালেন। বিদায় সভার কথাটা তিনি একেবারে ভুলেছিলেন। ছেলেরা তাঁকে যতো ভালোবাসে' তাতে মামুলী বিদায়সভা মাত্র নয়; খুব আন্তরিক একটি ছাত্র-শিক্ষক মিলন সভার সম্ভাবনা ছিলোই: এই একমাসের ছুটিতে তিনি কয়েকবারই ইস্কুলে এসেছেন। ইস্কুলে কার্যক্ষণের মধ্যেই এসেছেন। ছেলেদের সঙ্গে চোখের দেখা ঘটেছে; কিন্তু কেউই কোনো কথা বলে নি। ছেলেরা যে মর্মাহত হয়েছে, তা তিনি তাদের মুখ দেখে খেয়াল করতে পারেন নি।

সভায় ছেলেরা আবেগে বক্তৃতা করলো দুজন। ফুঁপিয়ে কাঁদলো কয়েকজন। চোখ ছল্‌ছল্‌ করলো সকলেরই। শিক্ষকরা সকলেই বিষণ্ণ। নরেন্দ্র অল্প দশ মিনিটকাল অত্যন্ত ওজস্বিনী কথ্য সহজ ভাষায় দেশসেবা ও ছাত্রসমাজ সম্পর্কে আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দিলেন। জীবনকৃষ্ণ বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেললেন। দীনবন্ধুবাবু রাষ্ট্রবুদ্ধিতে বেঁচে গেলেন! তিনি বললেন, "বাবারা, ডিগ্রি সব নয়। আমি এম. এ; জীবনবাবু এম. এ-ইন্‌-এডুকেশন। আরো দুজন এম. এ. তোমাদের এখানকার ইস্কুলে রয়েছেন। দেশে শিক্ষিতজন সকলে নয়ই; লিখতে-পড়তে পারে শতকরা ক-জনই বা? অথচ, তাদের মধ্যে এম. এ. পাশ অনেকেই আছেন। নরেন্দ্রবাবু বি. টি নন; এম. এ. নন; এম. এ-ইন্‌-এডুকেশন নন। কিন্তু, অল্প আলাপেই তিনি আমাকে পরাজিত ক'রেছেন। তাঁর মনুষ্যত্বের কাছে আমি দীনবন্ধু মজুমদার দীনহীন মজুমদার মাত্র; তাঁর বিদ্যাবত্তার কাছে আমার বিদ্যা অল্প মাত্র; শিক্ষাতত্ত্বের এতো জ্ঞান যে তাঁর আয়ত্তে, তা বোধহয় কমিটি জানতেন না, বা বোঝেন না। আর বর্তমান গভর্ণমেণ্ট্‌? তাঁরা ব্যতিব্যস্ত ব্যস্ত-বাগীশ সরকারী কর্মচারী। মানুষ চেনেন না। আমি যথাসাধ্য তোমাদের কল্যাণ করবার চেষ্টা করবো; আমি তোমাদের গুরু নরেন্দ্রবাবুর শুভ কামনা পাথেয় করবো।"

মানুষটিকে দেখে যে-বিরাগ অনেককেই পেয়ে বসে, তাঁর এই চতুর বক্তৃতায় তা কেটে যাওয়ার কথা। অন্ততঃ কতিপয় শিক্ষক ও সমুদয় ছাত্রই

মন অনুকূল ক'রে তাঁর কথাগুলি শুনলো।

নরেন্দ্র যে এই শহরেই এখনো থাকবেন তাতে ছেলেরা অনেকেই অত্যন্ত আনন্দিত হ'লো। কয়েকজন এসে জানালো, তা'রা অনেকে তাঁর কাছে পড়তে যাবে। তিনি বললেন, "সে কথা পরে হবে; বাড়িতে যেয়ো।"

প্রধান শিক্ষক অফিস-ঘরে নরেন্দ্রকে চা-খাবারের জন্য অনুরোধ করতেই তিনি অত্যন্ত অসম্মত হ'লেন। ছেলেদের-দেওয়া দুটি দামী ঝর্ণা কলম দেখিয়ে বললেন, "এই কলম দুটি আমার সম্পদ হ'য়ে থাকবে। বরাবর সাহিত্যরচনা ক'রে থাকি গোপনে। গোপন মনোনিবেশ এইবার প্রকাশ্যে আত্মনিয়োগ করবে। ছেলেদের-দেওয়া কলম দিয়ে প্রথম যে-বই লিখবো ভেবেছি, তার নাম দেবো 'শিক্ষার গুরুপরম্পরা।' অর্থাৎ, Doctrine of the Great Educators. বুঝতে পারছেন?"

"পারছি; রাস্ক্ সাহেবের লেখা।"

"হ্যাঁ; তাতে প্লেটো থেকে মন্তেসরি পর্যন্ত আছে। আমি তারপর-ও অগ্রগমন করবো। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাগুরুদের সংক্ষেপে সেরে নিয়ে, শেষে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, অরবিন্দ প্রভৃতির কথা অর্থাৎ তাঁদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় কথাগুলি লিখবো।"

"খুব ভালো হবে। তবে গুরুতর বিষয়; পাঠক বেশি পাবেন না।"

"প্রকাশক পাবো কি?"

"পেতে পারেন যদি একজন বিলিতী ডিগ্রিধারী এম. এ-ইন্-এডুকেশনকে সহযোগী লেখক করেন।"

"তা করবো না।"

"বেশ, বেশ; যা ইচ্ছা ক'রে যান। আপনি ভাবুক লোক; আপনাকে পরামর্শ দেওয়া চলে না।"

রাত্রি ন'টা বেজেছে। নরেন্দ্র ব'সে ব'সে ভগিনী নিবেদিতার 'Hints on National Education' পড়ছেন। আন্না-মা তাঁরই পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখে মশা লাগছে, নরেন্দ্রের সে-খেয়াল ছিলো না। পাঠে মগ্ন ছিলেন। যখন খেয়াল হ'লো তখন মহা বিব্রত হ'য়ে অতি সন্তর্পণে কোলে নিয়ে 'আঁখি'কে মশারির মধ্যে শুইয়ে দিলেন। মুদ্রিত দুটি বড়ো বড়ো চোখে দৃষ্টি পড়তেই নরেন্দ্রের তাকে 'আঁখি' ব'লে ডাকতে ইচ্ছা গেলো। কিন্তু ডাকলেন চুপি-চুপি, নীরবে। মায়ের আমার ঘুম ভেঙে যাবে যে।

আন্না অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এমন সময় কমলা ভৃত্য-সঙ্গে এসে পড়লো। এ-সময়ে তাকে দেখে নরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হ'লেন বৈ কি! বললেন, "এখন? এতো রাত্রে?"

"আপনি কাল আমাদের বাড়ি খাবেন। আনিকে নিয়ে যাবেন।"

"ওঃ। এই বলতে? যাবো বৈ কি। আনি বলছো কি আন্নাকে?"

"হ্যাঁ; আমি ওকে 'আনি' বলবো। আজ এই রাত্রে এলুম। এবার থেকে যখন খুশি, যতোবার খুশি এ-বাড়িতে আসবো। আমাকে আপনি বারণ করবেন না।"

"আমি বারণ করবো না। তোমার বাবার অমতে কিন্তু ক'রো না কিছু।"

"বাবার আবার মত। আমাকে তিনি কিছুতেই দুঃখ দেন না।"

তারপর কমলা কিছুক্ষণ থেকে গেলো। নরেন্দ্র যে ভগিনী নিবেদিতার বই পড়ছেন তা দেখে সে আগ্রহ জানালো। পার্শ্ববর্তী শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় শিক্ষার বইখানি দেখে আরো আগ্রহ হ'লো তার: কমলার সে-আগ্রহের উত্তরে নরেন্দ্র শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বললেন, "শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার বিষয়ে এই বইখানি এর পূর্বে দু'বার পড়েছি। আধ্যাত্মিক বিষয়ে বা সংস্কৃতির বিষয়ে তাঁর লেখা বইগুলি এবার পড়বো। আমি স্বামী বিবেকানন্দের বই খুব পড়েছি। তুমি পড়তে ভালোবাসো না স্বামীজির বই?" কমলা স্বামীজির

বই পড়ে, পড়তে ভালোবাসে—সেকথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললো। এর পর কথাবার্তা আর বেশি হ'লো না। রাত্রি এগিয়ে আসছে। কমলা বিদায় নিতে যাবে এমন সময় আন্না চেঁচিয়ে উঠলো ঘুমন্ত।

নরেন্দ্র মশারির বাইরে আনতেই প্রথমটা সে কথা কয় নি। তারপর যা বললো, তাতে নরেন্দ্র বিষণ্ণ হ'লেন। এরকম ঘুমে-চিৎকার তার আরো কয়েকবার হ'য়েছে। পাঁচ-ছ বার অন্ততঃ। বুকে ক'রে তাকে নিয়ে কমলাকে বললেন, "ওর নাকি মায়ের হত্যাকে মনে প'ড়ে যায়; ভাইটির হত্যা-ও।" আন্না শুনে ব'লে উঠলো, "বোলো না, বাবা।"

"নারে আঁখি, আর বলবো না। কাল নিমন্ত্রণ খেতে বলতে এসেছিলো কমলাদি। মাংসের ঝোল আর ভাত।"

"যাবো।" ব'লেই কমলার দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেললো। কমলা নরেন্দ্রকে বললো, "আপনাকে কজন জানে?"

"সবটা?"

"সবটা না হ'লে-ও অনেকটা?"

"বুঝতে পারছি। না-ই বা জানলো কেউ? তুমি তো জানলে? বেশি জনে না জানলে-ও চলবে। জানাজানির দরকারই বা কি? তা'রা সুধু বাইরেটুকু জানলেই যথেষ্ট। মানুষের ভিতরটা ভিতরে-ভিতরেই থাক্। কেমন? এই যে তুমি বি. এ পাশ বাঙালিনী। তুমি বিবেকানন্দ পড়, অরবিন্দ জানতে চাও। সাড়িচুড়ি-ও চাও না, হাতাবেড়ি-ও চাও না। এ কজন জানে?"

"না, না; আমি কিছু নয়। আমাকে আপনার চেলা করবেন?"

"আমি তো গুরু নই?"

এই কথা শুনে আন্না বললো, "বাবা গুরু কাকে বলে?" নরেন্দ্র গালে হাত বুলিয়ে বললেন, "কাল বলবো। চলো কমলা, আন্নাকে কোলে ক'রে তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি। আন্না তখন জোর আপত্তি ক'রে বললো, "না বাবা, কোলে ক'রে বাইরে নয়। ও-বাড়ির নলিনী আমাকে ভারি ক্ষ্যাপায়। বলে, বাবার আদুরী।"

"তোর বুঝি রাগ হয়?"

"না। ভালো লাগে। আদুরীই তো। কিন্তু ও বলবে কেন?"

"বারণ ক'রে দেবো।"

"না, না। তুমি ওকে বলতে যাবে কেন?"

তারপর কথা আর অগ্রসর হ'লো না। কমলার ভৃত্য কমলাকে স্মরণ করিয়ে দিলো,—সাড়ে ন'টা বাজলো।

কমলাকে এগিয়ে দিয়ে এসে নরেন্দ্র বহুদিন পরে আন্নাকালির মুখে অতিমৃদু একটি চুম্বন করলেন। যেনো পাখির পালক ছোঁয়ার মতো স্পর্শ লাগলো আন্নার মুখে।

আন্নার তখন যে-খুশিটা উপ্‌ছে উঠলো তার বর্ণনা আমি করতে পারবো না। তবে, আন্না সে-খুশি কি-ক'রে প্রকাশ করলো তা বলবো। সে বাবার গালে একটি মাত্র নয়, দু-দুটি চুমো খেয়ে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে তাঁর বুকে মুখ রাখলো।

এমনি ক'রে সমগ্র মুসলমান সমাজ যেদিন হিন্দুর সংস্কৃতির বুকে মুখ রাখবে, এমনি ক'রে যখন সমগ্র হিন্দু-হৃদয় মুসলমানের নমাজমুখী মনকে স্বীকার করবে, তখন নরেন্দ্রের পাশে তার গায়ে হাত রেখে আন্নাকালির দল আমিনা আর থাকবে না।

জগত্তারিণী উচ্চ বিদ্যালয় চলছিলো ভালোই। অর্থাৎ, নরেন্দ্রের অভাবে ছাত্রদের অন্তরে যতোটা অভাব-বোধই থাকুক, ইস্কুলের নিয়মিত কাজকর্ম সমান চাকায় ঘুরে চলছিলো। এগারোটা—চারটে ঘণ্টা বাজছিলো, অফিসের হিসাবপত্র কর্মচারী সমানই রাখছিলেন, শিক্ষকরা নিয়মিত পাঠদান ক'রে চলছিলেন, জীবনকৃষ্ণ সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজকর্ম দীনবন্ধুর তাঁবে যথাযথই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ছেলেরা পড়াশুনা ক'রে চ'লেছিলো সমানে। প্রধান শিক্ষকের উপর ছেলেদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আসছিলো না বটে, কিন্তু স্পষ্ট কোনো অবজ্ঞা বা অবহেলা তাদের পেয়ে বসলো না।

যান্ত্রিক গতিবিধি যাতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিদুষ্ট না হয়, সে-বিষয়ে দীনবন্ধুর কড়া নজর। অন্যায় করলে-ও ছেলেদের তিনি মারধোর করেন না, কিন্তু ভয়মিশ্রিত সকুণ্ঠভাব ছেলেদের মন আচ্ছন্ন ক'রে থাকে। প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ দেন। পড়ান ইংরেজি। পাঠদান খুবই নির্দোষ। রসকস নেই পাঠদানে; কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতি ঠাসা শৃঙ্খলায় মজ্‌বুত্‌। ছেলেরা শিখবার বিদ্যা পায় প্রচুর। তাদের খাটতে হয় বেশি, কিন্তু প্রধান শিক্ষক নিজেও পাঠদানে আগ্রহী ও অনলস। কাজেই ছেলেরা তাঁকে ভালো না বাসলে-ও অপছন্দ করবার কোনো স্পষ্ট কারণ পেলো না।

সম্পাদক সুধীরবাবু প্রায়ই ইস্কুলে আসতেন। দীনবন্ধু মজুমদারের মনে মনে তাতে ঘোর আপত্তি; মুখে তখন-ও অর্থাৎ প্রথম-প্রথম কিছু বললেন না। কিন্তু দেখলেন সম্পাদক তাঁর শৃঙ্খলাকুশলতায় খুশি। অতএব একটি জোর পেলেন তিনি ক্রমে ক্রমে নিজ মত জাহির করার। কিছুদিন অতীত হ'তেই একদিন বললেন, "সুধীরবাবু, সম্পাদকের পক্ষে প্রায়ই বিদ্যালয়ের কার্যক্ষণে আসা ঠিক নয়। তাতে চালাক ছেলেরা ধ'রে ফেলে যে, ইস্কুলের হেড্‌ মাস্টার কেমন কাজ চালাচ্ছেন সেক্রেটারি তাই তদারক করতে আসছেন।"

"না, না; তা কেন? আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তা ছাড়া ওসবে আমার অধিকার কোথায়?"

"অধিকার একেবারে যে নেই তা নয়। তবে ছেলেরা ভারি বুদ্ধিমান, এই সব ব্যাপারে। কাজেই ওদের মনের মধ্যে আমার সম্মানটা ক'মে যাবে এতে।"

এই কথা শুনে থেকে সুধীরবাবু আর ইস্কুলে বিশেষ যান না। সভাপতি মহীতোষবাবুকে এই সংবাদটি জানিয়ে সুধীরবাবু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ আঁটতে লাগলেন। দীনবন্ধুকে নিজেরাই এনে বসিয়েছেন তাঁরা, তাঁরাই তাঁর অন্নদাতা, অথচ প্রধান শিক্ষকের স্বাধিকারে তিনি যদি এতোখানি প্রমত্ত হন তবে সুধীরবাবুর মতো দাম্ভিকের সমূহ চিত্তবিক্ষোভ।

সুধীরবাবু অবসর-অলস মানুষ। গৃহে ছেলেরা পরিণতবয়সী ব'লে সেখানে গৃহস্বামিত্বের দম্ভ তাঁর খেলবার সুযোগ পায় না। বেশি কথা বলতে গেলে ছেলেরা অনাস্থা জানায় মুখে: পুত্রবধূরা অবহেলা গোপন ক'রে-ও পারে না গোপন করতে: গৃহিনীর তাঁর প্রতি জৈবিক উদাসীনতা। ষাট বছর বয়স পেরিয়ে গেছেন সুধীরবাবু। স্ত্রী-ও তিপ্পান্নোর পারে। কাজেই নাতি-বৌ-ছেলে নিয়ে সে-রমণী স্বামীকে আর কতোখানি নিবিষ্টচিত্তে তদারক করবে? তদারকের দরকার-ও হয় না। সেবা করবার লোকের অভাব কোথায়?

সুতরাং সমস্ত সময়টা কাটে কি-ক'রে? চাকরিতে পদস্থ ছিলেন. পেতেন মোটা মাইনে, অফিসার-ও হ'য়েছিলেন;—তা ব'লে উচ্চশিক্ষিত নন যে, বই প'ড়ে সময় কাটাবেন। ধর্মভাবী মানুষ নন যে, পূজা-অর্চনা ক'রে দিন যাবে। এমন অবস্থায় ইস্কুল-তদারকে অনেকখানি সময় দিতে পারলে তাঁর মন থাকে ভালো। আবার ক্ষমতা-বিস্তারের একটা ক্ষেত্র-ও মেলে! কিন্তু ক্ষমতা-বিস্তারের সেই জাল ফেলাতে বাধা পড়লো। দীনবন্ধু-ও ক্ষমতালোভী মানুষ। ইস্কুলের ব্যাপারে তিনি সর্বময় প্রভুত্বের পক্ষপাতী।

একদিন ইস্কুলের সামনে দিয়ে সুধীরবাবু সভাপতির বাড়ি যাচ্ছিলেন এমন সময় দেখলেন অনেকগুলি ছাত্র ভিড় ক'রে বটতলায় গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। তখন টিফিনের ঘণ্টা পার হ'য়ে গেছে। সুধীরবাবু অফিস ঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে প্রতিবেশীর একটি ছেলেকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন

ব্যাপার কী? ছাত্রটি বললো; এবং আরো কয়েকজন জোট বেঁধে সমর্থন করলো।

"আমরা ধর্মঘট করেছি।"

"কেন? কেন?"

"হেড্ মাস্টার মশাই নরেন্দ্রবাবুর নিন্দা করেছেন।

"নরেন্দ্রবাবু: তিনি তাঁর কথা আবার কেন?"

"গ্রামার পড়াতে গিয়ে তিনি বললেন, **noun of multitude** আর **collective noun** সম্পর্কে তোমরা আগে যা পড়েছো, আমি দেখছি তাতে তোমাদের ও- lesson টা পড়ানো ঠিক হয়নি।"

"নরেন্দ্রবাবু পড়িয়েছিলেন বুঝি?"

"আজ্ঞে। তিনি চমৎকার পড়াতেন। সব বিষয়-ই। কেবল সংস্কৃতটা বেশি পড়াতেন না। আমরা হেড্ মাস্টারকে বললুম, নরেন্দ্রবাবুকে দোষ দেবেন না; তিনি খুব ভালো পড়াতেন।"

"বটে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। নরেন্দ্রবাবুকে আমরা এখনো ভুলতে পারি না এটা বুঝে হেড্‌মাস্টার চ'টে যান। শেষকালে যুক্তিতে এঁটে উঠতে না পেরে তিনি বললেন, 'নরেন্দ্রবাবু বি. টি. নন, ইংরেজিতে এম. এ. নন তাঁর বিদ্যার দৌড় আর কতো হবে?'—এই কথায় আমরা বললুম, 'তাঁকে অশ্রদ্ধা করবেন না। তিনি আপনার চেয়ে-ও ইংরেজি জানতেন।' কথাটা ব'লে ফেললো বংশীধর। সে ফার্স্ট বয়। নরেন্দ্রবাবুর কাছে এখনো যায় প্রায়ই।"

"তাই নাকি?"

"বংশীর এই কথায় হেড্ মাস্টার কান ম'লে গালে চড় মারলেন। আমরা প্রতিবাদ করায় ক্লাশ থেকে সকলকে বেরিয়ে যেতে বললেন। তারপর আবার দশ মিনিট পরে ক্লাশে যেতে বলেছেন কিন্তু আমরা যাই নি। যাবো-ও না।"

"কতোদিন এ-রকম ধর্মঘট করবে?"

"যতোদিন-না হেড্ মাস্টার ভুল স্বীকার করেন।"

এমন সময় অফিস ঘরের বারান্দায় হেড্ মাস্টারকে রেলিং-এ হাত দিয়ে দাঁড়াতে দেখা গেলো। সুধীরবাবুর সঙ্গে তাঁর চোখোচোখী হ'লো। সুধীর-বাবু নড়লেন না। অগত্যা হেড্মাস্টার অফিসঘরে চ'লে গেলেন। একটা ঘণ্টা পড়লো। সুধীরবাবু বাড়ির দিকে রওনা হ'লেন।

বেশ একটি তৃপ্ত হাসি ঠোঁটে এঁকে নিয়ে সুধীরবাবু পথ চলতে থাকলেন। এতোদিনে প্রধান শিক্ষকের ত্রুটি পাওয়া গেছে ব'লে মহাখুশি তিনি। লোকটাকে আর তিনি বরদাস্ত করতে পারছেন না। কাজেই এ-সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ।

ছেলেদের মধ্যে যুক্তি ক'রে স্থিরীকৃত হ'লো আগামীকাল থেকে তা'রা যথারীতি ইস্কুল করবে। ধর্মঘট প্রত্যাহাব করবে। অথচ এ-সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে হেড্মাস্টারকে কিছু বলবে না। এদিকে সম্পাদকের সঙ্গে তাদের কথা কইতে দেখেছেন দীনবন্ধু। তার ফল কী হবে কে জানে। কিন্তু পরদিন ছেলেরা দেখলো হেড্ মাস্টার সে-সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। ছেলেরা বুঝলো ধর্মঘটে কাজ হ'য়েছে।

পরদিন গ্রামারের ক্লাশে দীনবন্ধুবাবু পড়ালেন যথারীতি। ছেলেরা প্রশ্নের উত্তর ভালোই দিলো। এক সময় হেড্ মাস্টার বললেন, "যদি আমার পড়ানোতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, বলো। আমি শুনবো। কাল আমি নরেন্দ্রবাবু সম্পর্কে যা বলেছি তাতে আমার হাত ছিলো না। বাড়িতে আমার ছোটো ছেলে খুব অসুস্থ, তাই মনটা ভালো ছিলো না ব'লে অসতর্ক কথা বলেছি। কিছু মনে ক'রো না।"

বংশীধর ভেব্ড়ে গেলো। তার পাশের ছেলেটি সুচতুর। সে টিফিন-ঘণ্টায় বংশীকে বললো, "ওঁর ছেলের অসুখের কথাটা বিশ্বাস হ'চ্ছে না। খোঁজ নিতে হবে।" বংশী নিষেধ করলো। তার অবিশ্বাসের জন্য তাকে তিরস্কার-ও করলো। দৈবক্রম এমনি যে, ঠিক সেই সময় দেখা গেলো, হেড্ মাস্টারের ছোটো ছেলে তার দাদার হাত ধ'রে রাস্তা দিয়ে মাস্টার মশাই-এর বাসার দিকে চলেছে। ছেলেরা চিনতো। বংশীর মনে এমন ধিক্কার এলো প্রধান শিক্ষকের উপর যে, মনে মনে সে তাঁর পদত্যাগ কামনা করলো।

বংশী সেদিন সন্ধ্যার পর নরেন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়ে শুনলো তিনি কলকাতায় গেছেন। ফিরতে দেরি হবে। বাসায় ছিলো আন্নাকালী আর বাড়িতে যে বুড়ি ঝি কাজ করে সে। আন্না বংশীকে বললো, "বসবে না বংশীদা? বাবা এখনই আসবেন হয়তো।" বংশী বললো, "না ভাই, তুমি ব'লো আমি একটু পরে আসবো। আমি লাইব্রেরিতে বই বদ্‌লে নিয়ে আসি ইতিমধ্যে।"

স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের একজন সভ্য বংশীধর। স্বামী বিবেকানন্দের 'চিকাগো বক্তৃতা' বইখানা সে গ্রন্থাগার থেকে নিতে গেলো। বই নিয়ে ফেরার পথে আবার একবার নরেন্দ্রবাবুর বাসায় যাবে। চিকাগো বক্তৃতার কথা নরেন্দ্রবাবু তাদের ক্লাশে কয়েকবার বলেছিলেন। বইখানা বংশী কয়েকবারই পড়বার কথা ভেবেছে, কিন্তু বইখানা গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে যাওয়া তার ঘ'টে ওঠেনি।

বই নিয়ে ফেরার পথে বংশী আমিনার কথা ভাবতে লাগলো। আরো অনেকের মতো সে তো জানতো নরেন্দ্র তাকে পালন করেন, সে মুসলমানী, নিগৃহীতা। আরো পাঁচজনে এ-সংবাদ জানতো, কিন্তু বংশী এই কথাটি অনেকবারই মনে মনে ভাবতো। নরেন্দ্রবাবুর চারিত্র পূজায় তার অনুরাগ বেড়ে যেতো এই কথা ভেবে। বংশী ছেলেটির প্রকৃতি সৎ।

গ্রন্থাগার থেকে স্বামী বিবেকানন্দের 'চিকাগো-বক্তৃতা' নিয়ে ফেরার পথে বংশী নরেন্দ্রবাবুর খোঁজ করলো। তখনো তিনি ফেরেন নি। কাছা-কাছি এক বন্ধুর বাড়ি অপেক্ষা করবার জন্য বংশী চ'লে গেলো। আমিনাকে ব'লে গেলো আবার আসবে একটু পরে, কাছে এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা ক'রে আবার খোঁজ নেবে তাঁর।

মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র কলকাতায় যান। আন্না থাকে বাড়িতে। সাধারণতঃ বুড়ি ঝি সন্ধ্যার পর ঘরে চ'লে যায়; কিন্তু নরেন্দ্র এই রকম কলকাতায় গেলে, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত বুড়ি ঝি চ'লে যায় না, আন্নার কাছে থেকে যায়। অবশ্য সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে আধ ঘণ্টার বেশি দেরি নরেন্দ্রের কখনো হয় না। আজ কিন্তু এক ঘণ্টা হ'তে চললো সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

আন্নাকালি বুড়ি ঝি-র সঙ্গে আবোল-তাবোল ব'কে যাচ্ছিলো।

"বাবা আমাকে খুব ভালোবাসে।"

"বাসবে না? তুমি তাঁর একটি মেয়ে যে।"

"তোমার মেয়ে নেই?"

"আছে, আছে। বড়ো মেয়ে আছে। তার বিয়ে থা হ'য়ে গেছে। নিজের ঘর করে। আমি ছেলে-বউ-এর কাছে থাকি।"

"তুমি ছেলেকে ভালোবাসো?"

"খুব ভালোবাসি।"

"বাবা এখনি আসবে, না?"

"এখনি।"

"বাবা কেন কলকাতা গেছে জানো?"

"না তো। কেন?"

"আমার জন্যে দু'খানা বই আনবে।"

"তোমার বাবা তো ইস্কুলের কাজ ছেড়েছে?"

"হ্যাঁ। বাবা অন্য কাজ করবে। বাবা তো লিখেছে অনেক খাতা। তাইতে টাকা পাওয়া যায়।"

"তাই বুঝি?"

এক বালিকা, আর একজন প্রৌঢ়া। এদের অসম বয়স, অসম পরিবেশ, অসম বংশধারা। কিন্তু এদের যোগসূত্র আছে। একটি প্রবীণ চিত্ত একটি কিশোর প্রাণকে চায়। সেই যোগসূত্রই আসল। বাড়ির ঝি আর গৃহস্বামীর কন্যা—সম্পর্কের এই হিসাব সামান্য হিসাব। সত্য হিসাব অন্য রকম।

নরেন্দ্র যখন এলেন তখন আটটা বাজে প্রায়। ঝি-এর সাহায্যে আন্না-মা রান্না কখন সারা ক'রে ফেলেছে। এতোক্ষণ দু'জনে কথাবার্তা সমাধা ক'রে চুপচাপ বসেছিলো। সামান্যক্ষণ নীরবে কাটার পর আন্না যখন একখানি ছবির বই নিয়ে ব্যস্ত, তখন আন্না-মা ডাক শুনতেই তার বুকটা লাফিযে উঠলো—ঠিক যেমন সমুদ্র থেকে সূর্য উঠে পড়ে। ছুটে গিয়ে সে নরেন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলো। নরেন্দ্র তাকে কোলে তুলে নিলেন।

নরেন্দ্র গিয়েছিলেন মধ্যাহ্নে। নূতন একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র বার হচ্ছে 'Independence' নাম দিয়ে। নাম দেখে অনেকে "স্বাধীনতা" নামক বাঙ্‌লা সংবাদপত্রখানারই নামান্তর ভেবেছিলো। কিন্তু কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর, বিচক্ষণ যারা তারা আশান্বিত হ'য়েছে পত্রখানার আবির্ভাবে। সরকারী তাঁবের তোষামুদে পত্র নয়; সরকার—অসহিষ্ণু সাম্প্রদায়িক পত্র নয়; সরকার-উচ্ছেদপ্রয়াসী সাম্য-সামিয়ানার পত্র নয়। কাগজখানি সত্য "স্বাধীনতা"। অর্থাৎ স্বাধীন মন এই পত্রখানি পরিচালনা করছে। এই সংবাদপত্র দপ্তরে নরেন্দ্র গিয়েছিলেন।

পত্রখানিতে স্বাধীন ও আত্মবশ মনের সাহসী লেখা প্রকাশিত হয়। তাই তিনি দু'খানি নিবন্ধ লিখে পাঠিয়েছিলেন। ডাকযোগে প্রথমটির দক্ষিণা পেয়ে তিনি কিছুটা বিস্মিত হ'য়ে সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। না চাইলেও অখ্যাত লেখকের লেখার জন্য অযাচিত দক্ষিণা মেলে, এটা নরেন্দ্রের বিদিত ছিলো না। আজ দ্বিতীয় রচনাটির জন্য পনেরোটি টাকা নিয়ে ফিরলেন তিনি। অবশ্য দু'খানি বাঙ্‌লা বই কিনে এনেছেন আন্নাকালীর জন্য।

প্রথম সাক্ষাতের আবেগ কাটতেই আন্না বই দু'খানি দখল করেছিলো। অবনীন্দ্রনাথের 'নালক' আর 'শকুন্তলা'। শকুন্তলার ছবিগুলি দেখতে যখন

ব্যস্ত হ'লো আন্না, তখন তিনি জামা খুলে মাদুরে বসলেন। ঝি-কে ছুটি দিলেন। জালির মধ্যে খাবার ঢাকা রয়েছে দেখলেন। যেদিন-যেদিন নিজে থাকেন না, সেই-সেইদিন ঝি আন্নাকে রান্নায় সাহায্য করে। প্রথমটায় তার আপত্তি ছিলো। কারণ নরেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাঁর জন্য কৈবর্ত হ'য়ে রান্না করায় পাপ আছে; দ্বিতীয়তঃ আন্না মুসলমানী, তার সঙ্গে রান্নার কাজে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু মনুষ্যত্ব জয়ী হ'য়েছিলো। নরেন্দ্র আড়ালে তাকে সব কথা বুঝিয়ে রাজি করাতে পেরেছিলেন। না হ'লে মেয়েটাকে একাই সব করতে হয়। একা সে পারে করতে। কিন্তু নরেন্দ্র তা চান না। হাজার হোক্ ছেলেমানুষ যে। একি তার রাঁধবার বয়স? যতোই এক-তরকারি ভাত হোক।

বাপবেটি সবে খাওয়া শেষ করেছে এমন সময় বংশীধর এলো। তার হাতের সেই বইখানা দেখে নরেন্দ্র খুশি হ'লেন। বললেন, "তুমি যে ইংরেজি-বইখানাই এনেছো, ভালো হ'য়েছে। বিবেকানন্দর বইগুলির বা বক্তৃতাগুলির বাঙলা অনুবাদ যা হ'য়েছে তা অত্যন্ত ভালো। তবু-ও ইংরেজি যখন শিখেছো, অনুবাদ না প'ড়ে আসলে পড়াই ভালো নয় কি?"

"মাস্টার মশাই, নতুন হেড্ মাস্টারকে চাই না; অনেকেই চায় না। কী করি বলুন তো?"—বংশীর এই কথায় নরেন্দ্র সকল কথা জানতে চাইলেন! সব কথা শুনে বললেন, "তোমরা ধৈর্য ধরো একটু। কমিটির মেম্বর বৃন্দাবনবাবু আমাকে ব'লেছেন, সম্পাদক ও সভাপতি তাঁর উপর বিরক্ত এই ধর্মঘটের ব্যাপারে। দেখোই-না উনি টেঁকেন কিনা। তবে সুধু ওঁকে সরালেই ইস্কুলের মঙ্গল হবে না।"

"আপনি আবার চলুন।"

"সে তো হবে না, বংশীধর।"

"শিক্ষা বিভাগকে রাজি করানো যায় না?"

"কে রাজি করাবে? কমিটি করাবে না।"

"আমরা।"

"পাগলা।"

তারপর ছাত্র-শিক্ষকে নানা কথা হ'লো। ইতিমধ্যে আঁখির চোখ মুদে

এসেছিলো। সে গিয়ে বিছানায় মশারির মধ্যে শুয়ে পড়লো। বললো, "বাবা, তোমরা কথা বলো যেমন বলছো, আমার ঘুম ভাঙবে না। যতোক্ষণ না ঘুমই, শুনবো।" এই কথায় নরেন্দ্র বুঝলেন ইস্কুলের ব্যাপারে সে সবটা না বুঝলেও ব্যাপারটিতে তার আগ্রহ আছে। ওর আবার একটি মনের বয়স তেরো; অথচ অন্য একটি মনের বয়স সাত। সেই সপ্তমী মনটা বাবাকে ভালোবাসে, আর তেরোর মনখানি বাবার পরিচর্যা করে।

বংশী এক সময় বললো, "মাস্টার মশাই, আন্নাকে আপনি খুব ভালো বাসেন। আন্না আপনাকে কি-রকম ভালোবাসে?" নরেন্দ্র উত্তর দেবার সময় পেলেন না। মেয়ে মশারীর মধ্য থেকে উত্তর দিলো। সে তখনো ঘুমোয় নি ব'লে ওদের খেয়াল ছিলো না। আন্না বললো, "বংশীদা, আন্না বাবাকে একগাদা ভালোবাসে।" কথাটি শুনে শিক্ষক-ছাত্র উভয়েই হেসে উঠলেন। এ-হাসি সমর্থনের। খুশির আবেশে আন্না আর কথা কইলো না। কখন যে তার ঘুম এসে গেলো সে তো জানলোই না, বংশী আর নরেন্দ্র-ও নয়। নরেন্দ্র একবার গিয়ে মশারীতে চোখ ঠেকিয়ে দেখে এলেন মেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

বংশী বাড়ি চ'লে গেলো। দুয়ার বন্ধ ক'রে নরেন্দ্র খাতা-কলম নিয়ে বসলেন। আলোর দিকে এমন ক'রে ফিরে বসলেন যাতে মেয়ের চোখ-মুখে আলো না পড়ে। Doctrine of the Great Educators বইখানি কাছে প'ড়ে রইলো। আর রইলো রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষা"। তিনি পাতার পর পাতা লিখে চললেন।

দেশ স্বাধীন হ'য়েছে। শিশুরাষ্ট্র। অনেকখানি দাবী অবশ্যই করা চলে না। কিন্তু এতো-শতো পরিকল্পনার হৈ-হুল্লোড়ে শিক্ষা-পরিকল্পনা কই? পরিকল্পনার মতো পরিকল্পনা? দেশ যখন পরাধীন ছিলো সেই যুগেই তো শিক্ষা-স্বাধীনতার কথা দেশনেতারা চিন্তা ক'রে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাবিষয়ক উক্তিগুলি কে ভাবছে? নিবেদিতার লেখাগুলি? অরবিন্দের বইখানি? রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাকর্ম? জাতীয় শিক্ষার বেদনা রবীন্দ্রনাথের আর অরবিন্দের কতোখানি তা নরেন্দ্র বুঝেছেন। তা ছাড়া মামুলী শিক্ষাধারাতেই যতোদিন শিক্ষা চলবে ততোদিন শিক্ষকের

দক্ষিণার কথাটা এতো অবান্তর কেন? কথা আছে, "কঙ্কালের কাছে দেহের পাপের কথা তোলা অর্থহীন।" তেমনি যদি বলা যায়, "দুর্ভিক্ষপীড়িত শিক্ষকের কাছে উত্তম শিক্ষাদান আশা করা অন্যায়।"—তা হ'লে ভুল বলা হবে কি? তা'ছাড়া গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে বাহ্যাড়ম্বরেই কি জাত গড়বে? চরকায় যেমন স্বাধীনতা আসেনি, বুনিয়াদী শিক্ষায় তেমনি জাতীয় শিক্ষা আনবে না। চরকা পথ্য নয়, ন্যূনতম পরিচর্যা মাত্র। বুনিয়াদী শিক্ষার তোড়জোড় সামান্যতম একটি ক্রিয়া মাত্র; তাতে জাতীয় শিক্ষায় বহুলতম ও প্রবলতম প্রাণশক্তি আনবে না।

নরেন্দ্রের মনে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিশেষ বেদনা আছে। সেই মর্মবেদনার বশে তিনি পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছেন, "শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ" সম্পর্কে। বইখানি উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশকরা ছাপাবেন বলেছেন। তাঁরা বাঙ্‌লা বই-ও ছাপেন। প্রেস্‌ তাঁদের নিজেদের এবং প্রেসখানি বড়ো।

এক সময় আন্নাকালী ব'লে উঠলো, "বাবা, তুমি লেখো, আমি শুয়ে আছি।"

"সে কিরে? ঘুমুস্‌ নি?"

"ঘুম আসছে না বাবা।"

"তবে একটু সবুর কর্‌। আমি যাচ্ছি।"

"তুমি লেখো বাবা, আমি চুপ্‌টি ক'রে শুয়ে আছি।"

"আমার লেখা হ'য়ে গেছে রে, আজ আর নয়।"

কিছু পরেই নরেন্দ্র এসে মেয়ের কাছে শুয়ে পড়লেন। আন্না তখন বাবার গায়ে হাতখানি ছুঁইয়ে চোখ মুদলো। নরেন্দ্র ভাবলেন, এ-মেয়ে মুসলমানী। এর বয়স প্রায় বারো। যখন পনেরো হবে, এমন ক'রে গলা জড়িয়ে শোবে না। নরেন্দ্র বাস্তবী চিত্তের সোজা মানুষ। তিনি জানেন যেদিনই আন্না 'বড়ো' হবে, সেই থেকেই তার আলাদা বিছানা হবে। না, না। বরং তার আগে থেকেই করা ভালো। অজুহাত একটা বানিয়ে রাখতে হবে। ঠিক হ'য়েছে। তাঁকে রাত্রে উঠে উঠে লিখতে হয়। মশারীর মধ্যে না লিখলে মশা কামড়ায়। এ যাবৎ মশারীর বাইরে ব'সেই মশার কামড় খেয়ে লিখেছেন। মেয়ে সে-খেয়াল করে নি। এখন ঐ কথার যুক্তি দিলে স্বতন্ত্র বিছানায়

তার আপত্তি থাকবে না। তবে মেয়ে যা ভালোবাসে বাবাকে, সে হয়তো বলবে তার চোখে আলো লাগে না, ইত্যাদি। যাই হোক্, নরেন্দ্র এর একটা ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু সত্যই যখন আন্না 'বড়ো' হবে তখন নারীহীন এ-সংসারে তাকে বোঝাবে কে? মায়েরাই বোঝায়। কি ক'রে বোঝায় জানেন না নরেন্দ্র। হয়তো ভুল ক'রে বোঝায়। যাই হোক্, বোঝায় একরকম নিশ্চয়ই। ছেলেদের-ও দেহের পরিবর্তন ঘটে। তাদের কেউ শেখায় না। অনেককেই হাতড়াতে হয়। ভীষণ ভুগতে-ও হয় অনেককে মনে-মনে। বিকৃতির কথা নরেন্দ্র জানেন বৈ কি। যাক্ ছেলেরা, কিন্তু মেয়েরা? আন্নারা? আন্নাকালী? তাকে কে বোঝাবে?

কেন? নরেন্দ্র এতো ধীমান, এতো মার্জিত, এতো সংস্কৃত, এতো ভাবুক—সে নিজে কন্যাকে বোঝাতে পারবে না?

শিক্ষা ও যৌন সংস্কার সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য মনস্তাত্ত্বিকদের অনেক লেখা নরেন্দ্র পড়েছেন। ইস্কুলে কোনো কোনো ছেলেকে তিনি এমন পরামর্শ দিয়েছেন যাতে তাদের উপকার হ'য়েছে। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের একটি পরিণত মন আছে; মত নয়। যে-ছেলেদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিয়েছেন তিনি, তারা উপকৃত হ'য়েছে। এই গোপন শিক্ষণ-কার্য কেউ জানে না।

নরেন্দ্র ঠিক করলেন আন্নাকে বোঝাবেন তিনি। অল্প কথায়। সংযত কথায়। তা ছাড়া রজ্জবের স্ত্রী তো রয়েছে। তবে আর ভাববার কী আছে?

অদ্ভুত পরিবেশ। অদ্ভুত বাপ-বেটি। অদ্ভুত মানুষ এই নরেন্দ্র। এই সব চিন্তা মেয়ের পাশে শুয়ে শুয়ে ভাবছেন, এক সময় দেখলেন চাঁদের আলো এসে আন্নার গায়ে পড়েছে। জানালার ফাঁকে আলো এসেছে। নরেন্দ্র দেখলেন আন্নাকালী চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে, আর মায়ের আমার কোমরের কসি আল্‌গা হ'য়ে দেহখানি উলঙ্গ শুচিতায় চন্দ্রালোকে শুভ্র হ'য়ে রয়েছে। নরেন্দ্রের মনে মানবদেহের পবিত্রতা একটি প্রবল রেখাপাত করলো। মানব-দেহ পবিত্র। শিশুর দেহ পবিত্র। বালকের নগ্নতা পবিত্র। বালিকার অনাবৃত অঙ্গসৌষ্ঠব পবিত্র। যুবক-যুবতীর দেহ-ই কি পবিত্র নয়? দেহ

সুন্দর। নরেন্দ্রের অন্তরে একটি অত্যন্ত শুচি মার্জনা আছে, যা সকলের নেই। না-ই বা থাকলো? সকলকে নিয়ে কাজ কি? আমাদের কাজ আন্নাকে নিয়ে; নরেন্দ্রকে নিয়ে। আন্না ও নরেন্দ্র একটি অন্তর-প্রদেশ। থাক্,—

ছেলেদের ধর্মঘটের ব্যাপারটি বেশিদূর গড়ালো না বটে, কিন্তু সম্পাদক সুধীরবাবু ব্যাপারটিকে কর্মকর্তৃসভার গোচর করলেন। সেই সম্পর্কে কর্তৃ-সভার অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে এটি-ও ছিলো। আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম রূপে ছাত্র-ধর্মঘট ব্যাপারটি দেখে দীনবন্ধুবাবু সম্পাদককে প্রশ্ন করেছিলেন এবং এ-বিষয় যখন ছেলেরা আপন হ'তেই গুটিয়ে নিয়েছে তখন কমিটির মিটিং-এ এ-বিষয়ে আর আলোচনা কেন সে প্রশ্ন-ও তিনি করলেন। সুধীরবাবু আলোচ্য থেকে এ-বিষয়টি বাদ দিতে অসম্মত হলেন।

সভার অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়গুলি বিনা বিতণ্ডায় আলোচিত হ'য়ে যাবার পর ছাত্র-ধর্মঘটের বিষয় উত্থাপিত হ'তেই প্রধান শিক্ষক মশাই প্রশ্ন করলেন, "এ বিষয়ে ছাত্ররা কি সম্পাদক মশাইকে কোনো অভিযোগ জানিয়েছেন?"

"না; তবে আমি বিষয়টি অবগত।"

"আলোচনায় গুরুত্ব বিষয়ে আপনি কী যুক্তি দিতে পারেন?"

"ছাত্র-ধর্মঘট জিনিসটি ভালো নয়। এই ইস্কুলে আজ পর্যন্ত কোন কারণেই ঐ হাঙ্গামা কোনো দিনই ঘটে নি।"

"কংগ্রেসের ব্যাপারে এবং নানান্ রাষ্ট্রনৈতিক হাঙ্গামার সময় কলকাতা এবং তার বাইরে-কার অনেক ইস্কুলেই ধর্মঘট হ'য়েছিলো।"

"এখানে হয় নি। কখনো হয় নি।"

এই সময় বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, "বরাবরই নরেন্দ্রবাবু ছেলেদের এমন একটি সততা ও স্নেহের প্রভাবে শাসিত করতেন যাতে ধর্মঘটের কথা এ-ইস্কুলে অজানিত।" দীনবন্ধু এই কথায় নরেন্দ্রবাবুর প্রশংসা সমর্থনই করলেন। তাঁর কথায় একটি বিশেষ চাতুরী ধরা পড়লো অনেকের মনে। তাঁর এই উক্তি যে গুণীর আদর নয়, এটি যে চালাকি, সেকথা সকলেই বুঝলেন। তখন ধর্মঘটের ব্যাপারটি সুধীরবাবু সকল সদস্যের গোচর করলেন এবং প্রধান শিক্ষককে তাঁর বক্তব্য বলতে অনুরোধ করা হ'লো।

বাদানুবাদে একথা সকলেই জানলেন যে, দীনবন্ধু নরেন্দ্রের নামে অপমানকর মন্তব্য করার ফলেই ছাত্ররা অন্তরে আঘাত পেয়ে ধর্মঘট করেছে। বৃন্দাবনচন্দ্র এতোক্ষণে বললেন যে, ধর্মঘট সম্পর্কে তিনি জানতেন এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক জীবনকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতে এ-বিষয়ে সংবাদ কিছু বিশেষ রকমে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তখন জীবনকৃষ্ণ-বাবুর বক্তব্য বৃন্দাবনচন্দ্রের মারফতে সকলে অবগত হ'লেন। বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, "জীবনবাবু শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ। তিনি বলেছিলেন, এক শিক্ষকের নামে অন্য শিক্ষক, অধিকন্তু প্রধান শিক্ষক যদি অশ্রদ্ধার মন্তব্য ক'রে ছাত্রমনকে আঘাত করেন, তাতে শিক্ষার মূলনীতিকে আঘাত করা হয়।"

কথাটি বৃন্দাবনবাবু সাধ্যমতো স্পষ্ট করলেন। তিনি বললেন যে, ছেলেদের মনে কোনো মান্যকেই অমান্য করার ইন্ধন যোগানো নীতিবিরুদ্ধ। তা ছাড়া নরেন্দ্রবাবুকে ছেলেরা অসাধারণ শ্রদ্ধা করতো। শেষ কথা এই যে, পড়ানোর ব্যাপারে দীনবন্ধুবাবু যে প্রাক্তন শিক্ষক নরেন্দ্রবাবুর চেয়ে বেশি পারদর্শী তার কোনো মানদণ্ড নেই আর সে-বিচার এখন অপ্রাসঙ্গিক। বৃন্দাবনচন্দ্রের এই উক্তিতে সুধীরবাবু প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে আরো অনেক গুপ্ত-কথা সকলকে বললেন।

তিনি বললেন, দু-এক দিনের নৈমিত্তিক ছুটি দেওয়ার সময় দীনবন্ধু-বাবু শিক্ষকদের লাঞ্ছনা করেন। অন্যতম শিক্ষক মনোজবাবু তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য একদিন গরহাজির হন। ছুটির দরখাস্তে স্ত্রীর অসুস্থতাই কারণরূপে উল্লিখিত ছিলো। কি-বিশেষ অসুস্থতা শিক্ষকের স্ত্রীর, তা না জানলে ছুটি মঞ্জুর হবে না, প্রধান শিক্ষক এই কথা বলতেই উক্ত শিক্ষক স্ত্রীর অস্বাস্থ্যের যে-নাম উল্লেখ করলেন তাতে প্রধান শিক্ষকই লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হন। তা ছাড়া সকল শিক্ষকই প্রধান শিক্ষকের ব্যবহারে বিব্রত। ইস্কুলের সহজ হাওয়া বেশ গুমোট্ ক'রে ফেলেছেন দীনবন্ধুবাবু। ছেলেরা-ও বদলে গেছে। তা'রা-ও ইস্কুলকে আর ভালোবাসছে না।

এতো খবর সম্পাদক কি-ক'রে সংগ্রহ করলেন, কি-ক'রে এতো খবর সংগ্রহ করা একজন সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব, তা দীনবন্ধুবাবু জানতে

চাইলেন। তিনি বললেন, এই সব কথায় এইটি-ই কি পরিস্ফুট নয় যে, সম্পাদক মশাই প্রধান শিক্ষকের পিছনে গোয়েন্দার কাজ করছেন?

এই উক্তিতে সভা চঞ্চল হ'লো। সুধীরবাবু রুষ্ট হ'লেন। সভাপতি বিরক্ত, এমন কি, ক্রুদ্ধই হ'লেন। অবশেষে হাওয়া যখন চরম গরম হ'য়ে উঠেছে তখন বৃন্দাবনচন্দ্র সেদিনকারমতো এ-আলোচনা স্থগিত রাখতে অনুরোধ ক'রে ব্যাপারটি আপাততঃ সামলে নিলেন।

কিন্তু এর পর সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের সম্বন্ধ অপ্রিয়তর হ'য়ে উঠলো। পরীক্ষার ফল বাহির হ'লো। যান্মাসিকী পরীক্ষার। দশম শ্রেণীর যে-সব ছাত্র ফল খারাপ করলো তাদের অনেকেরই অভিভাবককে প্রধান শিক্ষক পত্র দিলেন যে, "এ-রকম অনুৎসাহী ছাত্রকে পড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। এ-রকম ছেলেদের জন্য পয়সা খরচ অভিভাবকদের বাজে খরচ।" এই মন্তব্যের ফলে দুজন অভিভাবক রুষ্ট হ'য়ে শিক্ষাবিভাগে পত্র দিলেন, বিদ্যালয়ের কর্তৃসভার সম্পাদকে-ও। সুধীরবাবু সুযোগ পেলেন। একবার তিনিই এই রকমের কার্যকে কড়া হেড্ মাস্টারের যোগ্য কাজ ব'লে মনে করেছিলেন যখন ঘন-ঘন ইস্কুলে আসতেন। তখন এ-রকম পত্র অভিভাবককে দেওয়ার কোনো কারণ ঘটে নি। সাধারণভাবে উপর-পড়া হ'য়ে সুধীরবাবু যে-সমস্ত উপদেশ দীনবন্ধুবাবুকে দিতেন, এই উপদেশটি তারই অন্যতম ছিলো। কিন্তু এখন দীনবন্ধু যখন কার্যতঃ কড়া হেড্ মাস্টারের এই নমুনা দিলেন তখন সুধীরবাবু সুযোগ নিলেন। কর্তৃপক্ষের সভায় এ-বিষয়ে কথা উঠলো। হেড্ মাস্টার নিজ কার্য নানা যুক্তিতে সমর্থন করলেন। শেষকালে সুধীরবাবুর পূর্বোক্ত মতটির উল্লেখ করতেই সম্পাদক প্রধান শিক্ষককে মিথ্যাবাদী ব'লে উঠলেন।

এর পর দীনবন্ধুবাবুর ইস্কুলে থাকা স্বস্তির রইলো না। জীবনবাবুকেও তিনি ভয় করতে থাকলেন। জেলা-পরিদর্শক এসে জীবনবাবুকে খুব খাতির ক'রে গেলেন। ব'লে গেলেন, ঐ রকম যুবক ও কৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষকই প্রধান শিক্ষকের কাজের যোগ্য। জেলা-পরিদর্শক যখন এ-মন্তব্য করলেন, সেখানে তখন প্রধান শিক্ষক-ও ছিলেন। জেলা-পরিদর্শক একজন শিক্ষাতত্ত্বের এম. এ। বিলেতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা।

জীবনকৃষ্ণবাবুকে প্রধান শিক্ষক কতকগুলি বিশেষ কাজের ভার দিলেন। হিসাব দেখা-ও তার মধ্যে আছে, পরীক্ষার তত্ত্বাবধান-ও আছে, বিদ্যালয়ের খেলা-ধুলোর পরিদর্শন-ও আছে, গ্রন্থাগারের তত্ত্ব-তল্লাস-ও আছে। জীবনবাবু বুঝলেন তাঁকে যা-তা কাজ দিয়ে যেমন ক'রে হোক্ অদক্ষ প্রমাণিত করবার চতুর কৌশল প্রধান শিক্ষক ফাঁদলেন।

জীবনকৃষ্ণ একটু অলস প্রকৃতির। এমনিতেই এ-ধরণের নানা কাজের তৎপরতা তাঁর অপছন্দ। তার উপর তিনি কিছু অভিমানী। এডুকেশনে এম. এ পাশ ক'রে এসে এই সব কাজ করা তাঁর মর্যাদার হানিকর। অথচ কোন্ বিশেষ মর্যাদাকর কাজ যে তিনি করতে পারেন, আজ পর্যন্ত কেউ-ই তার দৃষ্টান্ত পায় নি।

কর্তৃসভার বৃন্দাবনবাবু অতোশতো বোঝেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে জীবনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লেই তাঁকেই ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হ'তে হবে—এ কথার উল্লেখ করেন। সেকথা শুনে জীবনবাবু অবশ্যই পুলকিত হন, কিন্তু তাঁর নিজেরই দক্ষতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস কম। সেজন্য বিশেষ উৎসাহে এ-প্রস্তাব সমর্থন করেন না। বলেন "থাক্, থাক্; চলুক-না এই রকম।"

এর পর জেলা-পরিদর্শক আবার এলেন। তিনি বিশেষ ক'রে মন্তব্য ক'রে গেলেন যে প্রধান শিক্ষক অফিস ঘরেই থাকেন বেশি। নিজের ক্লাস অবশ্যই নেন; হিসাবাদি সুদক্ষ কর্মচারীই সব করেন; সহকারী প্রধান শিক্ষক অনেক কাজ ক'রে থাকেন; প্রধান শিক্ষক কদাচ ক্লাস পরিদর্শন ক'রে থাকেন। পরিদর্শকের, সহকারী প্রধান শিক্ষকের উপর মন্তব্যটি সত্য নয় বটে, কিন্তু প্রধান শিক্ষক যে ক্লাস পরিদর্শন করেন না সেটি সত্য।

দীনবন্ধুবাবুর, ইস্কুলে যথেষ্ট অবসর। তিনি তিন ঘণ্টা ক্লাস নেন না। নেন মাত্র দু-ঘণ্টা, বাকি একঘণ্টা মাত্র দপ্তরের কাজ ক'রে থাকেন। অবশিষ্ট সময় টেক্সট্‌বুক্ রচনা করেন। ছাত্রদের জন্য তাঁর পাঁচখানি পাঠ্যপুস্তক আছে। আরো তিনখানি রচনায় তিনি ব্যস্ত। এ-খবর কর্মচারী দিয়েছেন জেলা-পরিদর্শককে। কর্মচারী দীনবন্ধুর উপর বিরক্ত। বড়ো বেশি পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে।

আরো কিছুদিন কেটে গেলো। সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদি সকল কর্তৃস্থানীয়ের, অধস্তন শিক্ষকবর্গের, অধীনস্থ ছাত্রসমষ্টির উপেক্ষা, বিরাগ ও ঔদাসীন্য ক্রমশঃই দীনবন্ধুকে অস্বস্তিতে অস্থির ক'রে তুললো। তদুপরি এক পারিবারিক বিপর্যয় তাঁকে বিমনা ক'রে তুলতেই তিনি স্থির করলেন ভবানীপুরের জগত্তারিণী বিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দেবেন। ইতিমধ্যে বেহালার একটি ইস্কুল তাঁকে সাধাসাধি করছে। ইস্কুলটি ছাত্রসংখ্যার দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর। সেখানকার কমিটির সভাপতি তাঁর পরিচিত। সভাপতি তাঁকে খুবই চান। সেইখানেই যাবেন এখানকার কাজ ছেড়ে, এই রকম সিদ্ধান্ত মনে নিয়ে তিনি একবার নরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কামনা মনে আনলেন। হঠাৎ কেন যেনো মানুষটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এলো। অনুকম্পা-ও। না জানি নরেন্দ্রবাবু এখনো বেকার কিনা।

দীনবন্ধুর পারিবারিক বিপর্যয় গুরুতর রকমের। তাঁর ছোটো মেয়ে ইলা নার্সিং পড়ছিলো। মেয়েটির একটি পা খোঁড়া, তাই বিবাহের চেষ্টা ক'রে তাকে পাত্রস্থ করতে না পেরে ধাত্রীবিদ্যা শিখতে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি স্ত্রী দীনবন্ধুকে বলেছেন কন্যা ভ্রষ্টা হ'য়েছিলো। নিজেই কলঙ্ক সামলে নিয়েছে।

দীনবন্ধু আর যাইহোক্, রক্ষণশীলতার অকারী গুণে কিছুটা গুণবান্। অকারী অর্থাৎ passive. কন্যার এই পাতিত্য তাঁকে পীড়িত তো করলো-ই, বরং রুষ্ট-ও। কাজেই এমন মনঃপীড়িত অবস্থায় অস্বস্তির চাকরি ছেড়ে একটা স্বস্তির আশ্রয় তিনি মন-প্রাণ এক ক'রে চাইবেন বৈকি। বেহালার ইস্কুলেই যাবেন তিনি।

ঠিক করলেন মেয়েকে ছেড়ে দেবেন স্বৈরিণী-জীবনে। অর্থাৎ তিনি চাইলেন মেয়ে ধাত্রীবিদ্যা শিখে যা-খুশি করুক; তিনি আর তার কোনো খোঁজ রাখবেন না। বড়ো ছেলেদুটি সপরিবারে বিদেশে, কাজকর্ম করছে। তা'রা স্বাচ্ছন্দ নির্বিঘ্নতায় থাকুক। তিনি পরিণত জীবনে স্ত্রীকে নিয়ে আর ছোটো ছেলেকে নিয়ে তাঁর বেহালার কর্মস্থানের কাছে বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকবেন। ডায়মন্ডহারবারের বাড়িটা একটা ভালো ভাড়াটের তত্ত্বাবধানের দিয়ে রাখবেন।

এই সিদ্ধান্ত যে-মুহূর্তে স্থির করলেন সেই মুহূর্তে সহকারী প্রধান শিক্ষক তাঁর অফিস ঘরে কার্যসূত্রে এলেন। যে-প্রসন্নতায় জীবনবাবুকে দীনবন্ধু অভ্যর্থনা করলেন, জীবনবাবুর কাছে তা অপ্রত্যাশিত।

[৯]

দীনবন্ধুর কাছে অপ্রত্যাশিত প্রসন্নতা পেয়ে জীবনকৃষ্ণ ভাবলেন, ভদ্রলোক যাবার-মুখে একটু উদ্বৃত্ত প্রসাদ বিলিয়ে যাচ্ছেন সকলকে। দীনবন্ধুর পারিবারিক দুর্ঘটনার সংবাদ সন্নিহিত কারোর-ই জানার নয়। তাঁর কন্যার কথা কেউ-ই জানে না। সেই কারণেই যে বিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দেওয়ার জরুরী ইন্ধন তা জীবনবাবু জানেন না। তবে, দীনবন্ধু যে চ'লে যাচ্ছেন বটতলা ছেড়ে, এবং যাচ্ছেন যে বেহালায়, সে কথা তিনি জেনেছেন। বেহালার কথা দীনবন্ধুই তাঁকে বলেছেন।

অতি প্রসন্নচিত্তে দীনবন্ধুবাবু কাজকর্ম বুঝিয়ে পড়িয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে, জীবনবাবুকে এম. এ-ইন্-এডুকেশন ডিগ্রির জন্য প্রশংসা ক'রে, জেলা-ইস্কুল-পরিদর্শকের তাঁর প্রতি দরদেব মন্তব্যটি উল্লেখ ক'রে তাঁকে উল্লসিত-ই ক'রে দিলেন। ব্যাপার যা-ই হোক্, জীবনবাবু এতোদিনে প্রধান শিক্ষকের পদ পাবার নৈশ্চিত্যে মনে মনে ব্যক্তিগত বিশেষ একটা সংকল্প স্থির ক'রে ফেললেন। সংকল্পটা ইস্কুল সম্পর্কে নয়; নিজের আন্তর-জীবন সম্পর্কে।

জীবনকৃষ্ণের বাপ-মা মৃত। ভাই নেই। বোনেরা বিবাহিত এবং স্ব স্ব পরিবারে প্রমত্ত। মাস্টারি করতে করতে নানা ইস্কুলেই অর্থাৎ নানা স্থানেই তাঁকে অবস্থান করতে হ'য়েছিলো। তাই নিকট বা দূর আত্মীয়দের থেকে ক্রমশঃই দূরে প'ড়ে গেছেন। এডুকেশনে এম. এ পড়বার সময় এক পরিবারে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেই অনাত্মীয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় তাঁর আত্মীয়তা ঘ'টে ওঠে তাঁদের প্রতি।

যে-তিনটি মেয়ে শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ পড়ছিলো তাঁদের সঙ্গে, তার মধ্যে একটি মেয়ে একটু বেশি গায়ে প'ড়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে। অধ্যাপককে মধ্যস্থ ক'রে প্রথম আলাপ। অধ্যাপক বলেন, "জীবন, তোমার সাইকলজির নোট্গুলি বাণী হালদারকে দেখিয়ো। ও-বেচারী সব নোট্ রাখতে পারে নি।"

বাণী হালদার দ্বিতীয় আলাপে জীবনকে বাড়িতে নিয়ে যায়। চা আর কাঁচকলার চপ খাওয়ায়। মনস্তত্ত্বের নোটের কথা আদৌ পাড়ে না। দু-তিনবার এই রকম চা-চপ খাওয়ার পর জীবনের তাকে ভালো লাগে না। সহপাঠিনী অমিতা বলতো, ভালো না লাগার কারণ অন্য। বাণী হালদার যেমন মোটা, তেমনি কালো। তা ছাড়া মুখের হাঁ খানা মুখব্যাদান না করলেও বিস্তৃতি লুকোতে পারে না ঠোঁটের পরিধিরেখায়।

এদিকে পুষ্পকণা দে নামের মেয়েটির জীবনকে মনে মনে ভালো লাগতো। পুষ্পকণার বয়স তেইশ। ভালো ছাত্রী। দেখতে ভালোই। মোটা নয়, কালো নয়, হাঁ বড়ো নয় খুব রোগা-ও নয়, খুব ফর্সা-ও নয়· চোখ বড়ো বড়ো। পুষ্পকণা যখন দেখলো জীবনকে হালদার-ধুমসি হাত করছে, সে তখন মনে মনে উঠে প'ড়ে লাগলো। ছিনিয়ে নিলো জীবনকে। জীবন তাদের অর্থাৎ পুষ্পদের বাড়ি চা-চপ না হ'লেও চা-সিঙাড়া খেতে যেতে লাগলো।

পুষ্পকণা বুদ্ধিমতী। পড়াশুনায় কৃতী। তার বাবা তাকে মেনে চলেন। পাকিস্তান থেকে আসার সময় যে-সম্পত্তি অর্থাৎ টাকা-কড়ি সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন, তাতে একটি ছোটো বাড়ি করা চলে এবং তার পরেও যে-টাকা থাকে, তাতে দুঃখ-কষ্টে সংসারে চ'লে যায়। কিন্তু পীতাম্বরবাবু বাড়ি এখনো করেন নি। চুঁচড়ো-শ্রীরামপুর বা তেমনি-তরো কলকাতা-সন্নিহিত কিছুটা শহর যে সব জায়গা, সেইখানে ছোটো বাড়ি কেনবার বা তৈরি করবার ইচ্ছে আছে তাঁর।

পীতাম্বর আরো কয়েকজন অনুরূপ পুরুষ মানুষের মতো স্বার্থপর বাপ। পুষ্পকণার লেখাপড়ার মেধা দেখে বেঁচে গেলেন। ভাবলেন, বিয়ের জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। বয়সকালে মেয়ে স্বয়ংবরা হবে; আজ-কালকার তাই তো রেওয়াজ। পরবর্তী মেয়েটি বি. এ পর্যন্ত সিঁড়ি উঠেই ধুপ্ ক'রে ব'সে পড়লো। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতেই পড়া শেষ করলো। পড়ার চেয়ে গেরস্থালির কাজেই তার মন বসলো বেশি। মাকে রান্নাঘর থেকে ছুটি দিয়ে বাড়ির সব রকম গার্হস্থ্য-পরিসেবায় আত্মনিয়োগ করলো। এমন কি, মেয়েলি সেলাইবোনাটুকু পর্যন্ত তার ভালো লাগে না। কেননা, তার

মধ্যে মেয়েলি কিছু থাকলেও সকারী মেয়েমানুষী নেই।

পুষ্পকণা মেয়েটি দেখতে খারাপ নয়। যেটুকু বর্ণনা পূর্বেই ক'রে রেখেছি, তদুপরি এইটুকু বাড়াতে চাই যে, আজকালকার আরো অনেক শিক্ষিত মেয়ের মতো নারীসুলভ দেহাবয়বে পুষ্পকণা কৃশ। বক্ষপ্রাচুর্যে তার দেহ দীন। মুখের গঠনে একটি অনিশ্চিত মোহ আনে কিন্তু মেয়েলি মাধুর্য-ও নেই, কামিনীর লোলতা-ও নেই।

পুষ্পকণা জীবনকে তার প্রতি অনুকূল ক'রে নিলো। অদ্ভুত রকমের আনুকূল্য। নর-নারীর প্রীতি নয়, সোহাগ নয়, শৈথিল্য নয়। পুষ্প জীবনের সঙ্গে য়্যাডাম্‌সের শিক্ষাতত্ত্বের বিবর্তন-ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে, নান্‌ সাহেবের শিক্ষাতত্ত্ব বলিয়ে নেয় জীবনকে, ক্যাম্‌প্যাগ্‌ন্যাক-ও বলতে পারে। এদের সে পড়েনি, অধ্যাপকদের মুখেই যা এদের কথা শুনেছে। জীবনকৃষ্ণ কিছু-কিছু পড়েছে। ভালো পাশ করতে গেলে ছেলেরা মেয়েদের চেয়েও যতোটা বেশি প'ড়ে থাকে, তার বেশি অবশ্য জীবন পড়ে নি। কিন্তু জীবনের অধীত বিদ্যাটুকুই পুষ্পর পক্ষে প্রচুর। তা ছাড়া বিদ্যার আলাপ ও আলোচনার আকর্ষীতেই জীবনকে পেড়ে ফেলেছে সে।

ক্রমে ক্রমে কবে যে পুষ্পকণা থেকে তার ছোটো বোনের দিকে জীবন আকৃষ্ট হ'লো, তা সে নিজেই জানে না;—মনস্তত্ত্ব পুষ্পকণার চেয়ে যতোই পড়ুক সে। পুষ্পকণার কিন্তু জীবনের কণিকাপ্রীতির প্রতিটি ধাপ বিদিত। কণিকা পুষ্পকণার বোনের নাম।

হেড্‌মাস্টারি পেলেই কণিকাকে বিবাহ করতে হবে, পুষ্পকণার এই আবদার যখন জীবন শুনলো, সেদিন তখন সে পুষ্পকণার দিকে একদৃষ্টে একটু চেয়েছিলো। পুষ্প বুঝলো। চাউনি দিয়ে কী উত্তর দিলো জানি না। মুখে বললো, "আমি বিয়ে করবো না। কণিকার বিয়ে হ'য়ে গেলে বাবা-মা নিশ্চিন্ত হবেন, এই আমার পুরস্কার।"

পুষ্পকণা এযাবৎ ব'সেই ছিলো। সম্প্রতি চুঁচড়োতে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধানা শিক্ষিকার কাজ পেয়েছে। সেখানে ইস্কুলটি এখন ক্লাস নাইন্‌ পর্যন্ত। সেক্রেটারি পুষ্পকে খুব খাতির করেন। পুষ্প সেখানে একটি বাসাবাড়ি পেয়েছে। জীবন বিয়ে করলেই সে বাবা-মা-কে নিয়ে

সেখানে থাকবে। জীবন-ও কণিকাকে নিয়ে অনায়াসে সেখানে থাকতে পারে। চুঁচড়ো থেকে ভবানীপুর গ্রাম বাস-চলাচলের পথ। ট্রেন তো আছেই।

জীবনকৃষ্ণ মনে মনে কণিকাকে বিবাহ করা স্থির ক'রে ফেলেছে। বিবাহ-উৎসবের দিনটির কথা যতোবারই মনে এসেছে ততোবারই তার কণির পাশে পুষ্পকে মনে পড়ে কেন? একদিন সে গোপনে পুষ্পকে চুমু খেতে গিয়েছিলো। সেদিন পুষ্প তার উপর খুব রাগ করে। তখন কণিকা রঙ্গস্থলে আসে নি; সাজঘরে তৈরি হচ্ছিলো। জীবনকৃষ্ণ স্থির করলো আজ সে নরেন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করবে। নরেন্দ্রবাবু তার হিতৈষী।

পুষ্পকণাকে একখানি চিঠি লিখতে বসলো জীবন। জানালো যে, আগামীকাল রবিবার; সকালেই সে তাদের বাড়ি যাবে। লিখবার অবসরে কখন এক সময় তার মনে হ'লো কণিকার বয়স কুড়ি মাত্র; তার প্রায় তেত্রিশ। বয়সের কথাটা তার এর পূর্বে একবার-ও মনে হয় নি। অবশ্য কণিকা ও জীবনকৃষ্ণ বরকন্যা রূপে পাশাপাশি দাঁড়ালে বিশেষ কারো নজর হবে না বয়সের ফারাকের। কেবল যা মুখের ভাবে জীবন একটু বেশি বয়সের পরিণতি প্রকাশ করবে। অকারণে জীবনকৃষ্ণ পুষ্পকণার উপর অসন্তুষ্ট হয় মনে মনে।

নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য যখন সে বাড়ি থেকে বাহির হবে তখন তার গৃহ-ছাত্রটি বললো, "মাস্টার মশাই, আজ কখন পড়তে বসবো?" জীবন বললো, "তুমি একটু পরেই বসবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরবো। যেখানটা অনুবাদ করবার কথা সেটা নিয়ে বসবে। অনুবাদের জন্য hints আমি কালই দিয়ে দিয়েছি। তোমার খাতায় লেখা আছে।"

নরেন্দ্র দীনবন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। বটতলা ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকতা ছেড়ে দীনবন্ধুবাবু বেহালা ইস্কুলে যাচ্ছেন একথা বংশীধরের কাছে নরেন্দ্র শুনেছিলেন। স্বয়ং দীনবন্ধু আজ সে-খবর দিলেন। ভদ্রলোক হিসেবী; কিন্তু কেন জানি না নরেন্দ্রকে কন্যার দুষ্কৃতির কথা ব'লে ফেললেন। শুনে নরেন্দ্র চুপ ক'রে রইলেন। দীনবন্ধু তাঁর পরামর্শ চাইলেন। নরেন্দ্র বললেন, "স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করতে দিয়ে সম্পূর্ণ সামলানো সকলকে যায় কি-ক'রে?"

"কিন্তু অপবাদ সহ্যকরা যায় কি-ক'রে?"

"মেয়ে তো নিজেই সামলে নিয়েছে।"

"ডাক্তারি রাজ্যে ও-সব সম্ভব বৈ-কি।"

"তার বাইরে-ও আজকাল সম্ভব হচ্ছে।"

"নরেনবাবু, আপনি ব্যাচেলর, এতো খবর রাখেন কি-ক'রে?"

"শহরের প্রত্যেক বড়ো বড়ো মোড়ে ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখেন না? প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন ছাড়া গোপন সংবাদ-সরবরাহের রাস্তাটা সমাজের অলিতে-গলিতে প্রবিষ্ট। এখন বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পেরিয়ে গেছে।"

তার পর দীনবন্ধুবাবু নরেন্দ্রকে জানালেন মেয়েকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন, অর্থাৎ তার আর কোনো খোঁজ রাখবেন না। নরেন্দ্র বললেন স্বাধীনতা দেওয়ায় আপত্তি করা যায় না কিন্তু তিনি যখন বাপ তখন প্রায়ই মেয়ের খবর রাখতে তাঁকে হবেই। রাখা উচিত। দীনবন্ধু মেয়ের কথা চাপা দিলেন নরেন্দ্রবাবুর পালিতা কন্যার কথা তুলে।

"তাকে দেখছি-না।"

"শ্রীরামপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়ি গেছে; প্রায়ই যায়। কাল আসবে।"

"আপনি আশ্চর্য মানুষ।"

"আমি অতি সাধারণ মানুষ।"

"বিয়ে করলেন না কেন?"

"চাকরি গেছে। তা হ'লে খেতুম কী?"

"চাকরি যাবে কুষ্ঠীতে তো লেখা ছিলো না?"

"কুষ্ঠী নেই। বিয়ে করিনি নানা কারণে। সে অনেক কথা। তবে এইটুকু বলতে পারি, আদর্শবাদ আর ভাবুকতা নিয়ে দারিদ্র্যের সংগে দিন কাটতে কাটতে বিয়ে করা আর ঘটে নি।"

"অর্থাৎ ভীষ্মপণ কিছু ছিলো না তা হ'লে?"

"ঠিক ধরেছেন।"

"আজকাল করছেন কী?"

"লিখছি। Independence-এ লেখা দিচ্ছি। মাসে দুটি। তিরিশ টাকা পাই।"

"বাড়িতে ছেলে পড়ান না?"

"দেখি, হয়তো পড়াতে হবে।"

"আত্মীয়দের সংগে যোগাযোগ রাখেন না?"

"প্রথম প্রথম রেখেছিলুম। ক্রমে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছে। বাবা-মা গেছেন। ভাই নেই। বোনেরা অক্লেশেই আমাকে ভুলেছে এবং নিজ নিজ গার্হস্থ্যে মশগুল আছে। অবশ্য খুড়ো আছেন একজন। আমার খবর না পেলেও সপরিবারে স্বস্তিতে আছেন তিনি।"

"মাস্টারি আর করবেন না?"

"রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো ইস্কুলে হ'লে ভালো লাগবে। সেই চেষ্টা একটু-আধটু করছি।"

"বেশ, বেশ।"

এর পর দীনবন্ধু চ'লে গেলেন। তখন নরেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষা"-খানি খুলে বসলেন। পঠিত অংশগুলি পুনর্বার পড়তে থাকলেন। নূতন পাঠে মন দিলেন না। কারণ জীবনকৃষ্ণ খবর দিয়েছিলেন দেখা করবেন ব'লে।

বেশি দেরি হ'লো না। জীবনবাবু এসে পড়লেন। ইস্কুল নিয়ে

কথা হোলো। প্রধান শিক্ষকের পদ পাবেন ব'লে তিনি খুশি দেখালেন। তিনি যে বিবাহ করবেন তা-ও ব'লে ফেললেন। শেষকালে নরেন্দ্রবাবুর নিজের খোঁজ নিলেন। অতি সংক্ষেপে নরেন্দ্র নিজ সংবাদ সরবরাহ করলেন:

জীবনকৃষ্ণ চ'লে যাবার পর নরেন্দ্র ষ্টোভ জ্বাললেন। একবাটি দুধ গরম করলেন। একখানা হোটেল-রুটি এনে রেখেছেন। দুধ আর রুটি খাবেন রাত্রে। আজ আন্না-মা নেই। রান্নার হাঙ্গামা কেন? বুড়ি ঝি জিজ্ঞাসা করেছিলো উনুনে আগুন দেবে কিনা, তিনি 'না' করেছেন। ঝি-বুড়ি সকাল-সকাল বাড়ি চ'লে গেছে।

এমন সময় বংশীধর এলো। জীবনবাবু প্রধান শিক্ষক হবেন, সে-কথায় বংশী কিছুটা আনন্দ প্রকাশ করলো। একবার বললো, "মাস্টার মশাই, আপনি কি কিছুতেই ইস্কুলে যাওয়া সম্ভব করতে পারেন না?" নরেন্দ্র বললেন, "তুমি ভেবো না, আমার দিন চ'লে যাবে।" বংশী যে তাঁর জন্য ভাবে না, সে যে নিজেদের জন্য ভাবে, সে যে ভাবে নরেন্দ্রের অভাবে বটতলা ইস্কুল এলতলা-বেলতলা হ'তে বসেছে, তারা অনেক ছাত্রই যে তাঁকে ছেড়ে দুঃখ পাচ্ছে;—সেই কথাগুলি অনেক ভাব ও আবেগে বংশী মাস্টার মশাইকে জানালো। নরেন্দ্রবাবু বংশীধরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। শেষে বংশী এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলো।

বংশীধরের বাবা পাটের ব্যবসায়ী। শেওড়াফুলি ছাড়া মেদিনীপুরের তিনটি স্থানে তাঁদের ব্যবসাকেন্দ্র আছে। তাঁদের কলকাতা অফিসে যে-ভদ্রলোক চিঠি-পত্রাদি লিখতেন তিনি নেই। কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেছেন। নরেন্দ্রবাবু কি সে-কাজ করতে পারেন না। বংশীর বাবা প্রাক্তন কর্মচারীকে দেড়শত টাকা বেতন দিতেন। শুনে, নরেন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, "আমি যে টাইপ্ করতে জানিনা। এসব কাজে কেরাণীকে টাইপ-ও জানা চাই না কি?" বংশী জানতো সেকথা। তাই অপ্রস্তুত হ'য়ে নীরব রইলো।

চ'লে যাবার সময় বংশীধর যখন নরেন্দ্রকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো, তখন তিনি ছাত্রকে মস্তক-চুম্বন করলেন। ছাত্র সজলচক্ষে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। শিক্ষক-ও নত-মস্তক তুললেন। উভয়েই আগন্তুককে দেখে চমকে গেলেন। আগন্তুক আর কেউ নয়; সে কমলা।

যাবার কালে বংশী বললো, "আন্নাকে দেখছি না?"

"শ্রীরামপুরে রুজবদের বাড়ি গেছে।"

"কতো রাত্রে আসবে?"

"কাল আসবে। তুমি আন্নাকে খুব ভালোবাসো মনে মনে, না বংশী?"

কথাটি শুনে বংশীর মুখখানি কুমারীর ব্রীড়াতে রক্তিম হ'য়ে উঠলো। অল্পালোকে কেউ দেখতে পেলো না। নরেন্দ্র বললেন, "তুমি না এলেই আন্না-মা তোমার কথা আমাকে বলে।"

"কী বলে?"

"বলে, বংশীদা কি পড়াতে খুব ভালো?"

"আন্নাকে ইস্কুলে দেন না কেন? ঐ মেয়ে-ইস্কুলটা মন্দ নয় তো? তিনবার পাঁচজন ক'রে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'য়েছে।"

"ওকে আমি নিজেই পড়াই।"

"যখন ইস্কুলে যেতেন আন্না একা থাকতো কি-ক'রে মাস্টার মশাই?"

"দু-চারজন প্রতিবেশী ছেলেমেয়ে সংগী আছে। বুড়ি ঝি থাকে। তা ছাড়া আন্না অদ্ভুত মেয়ে; ভয়-ডর নেই। সংগহীন একাকী থাকতে পারে অনেকক্ষণ।"

"আমি আসি। কাল আসবো। আন্নাকে আজ দেখতে পেলুম না।"

বংশীধর চ'লে গেলো। এতোক্ষণ কমলা চুপচাপ দেখছিলো আর শিক্ষক-ছাত্রের কথোপকথন শুনছিলো। অদ্ভুত মানুষ নরেন্দ্র। ছাত্রভাগ্য-ও অদ্ভুত। পনেরো বছরের কিশোর ছেলে কতো সহজে প্রকাশ করলো বারো বছরের মেয়ে তাকে ভালোবাসে। প্রকাশ করায় তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। কমলা শুনছিলো আর অন্য মনে "শিক্ষা" বইখানির পাতা উল্টে যাচ্ছিলো।

নরেন্দ্র কমলাকে চেয়ে দেখলেন। আজকাল কমলা সময় পেলেই খুশি আর খেয়ালমতো এখানে আসে। আসে, বসে, পড়ে, গল্প করে। আন্নার সংগে কল্ কল্ করে, খল্ খল্ করে, গল্ গল্ করে। আন্না আর কমলা যেনো দুই বোন। যেনো বয়সের আড়া-আড়ি চার বছরের। আবার সময় সময় কমলা যেনো খুব বড়ো বয়সের দিদি। আনি অনেক ছোটো বয়সের বোন। এক-একবার আন্নার, মা-কে অস্পষ্ট মনে পড়ে কমলার মুখে

চেয়ে। কোথায় যেনো হিন্দু কমলা আর মুসলমান ফতেমার মিল আছে। ভুল, ভুল, আন্নার ভুল। কোথাও মিল নেই। মুখে নয়, চোখে নয়, কেশে নয়, বেশে নয়। হাসিতে নয়, নীরবতায় নয়, কোলাহলে নয়, ব্যস্ততায় নয়, অবসরে নয়। তা ছাড়া আন্নার মনে আছে কতোটুকু? লাঠির ঘা মনে আছে। সেকথা মনে হ'লে মায়ের ঝাপ্‌সা মূর্তিখানি-ও একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় স্মৃতি থেকে। তবে কি মিল নেই? আছে।

সুধু কি মুখই মনে থাকে? সুধু কি আকৃতিই মনে থাকে? মাকে কি আন্না চোখ দিয়ে পেয়েছিলো সুধু? মা কি তাকে চুমু খায় নি? গলা জড়ায় নি? ঘুম পাড়ায় নি? খেতে দেয় নি? শুতে বিছানায় নিয়ে যায় নি? কমলা যখন রান্নায় সাহায্য করে, ক্যারম্‌ খেলায় সঙ্গী হয়, পড়ায় শিক্ষিকা হয়;—তখন মায়ের কথা মনে পড়ে আন্নাকালীর, আঁখির,—না, আমিনার।

কমলা এম. এ পড়লো না কলেজে অর্থাৎ য়ুনিভার্সিটিতে। চুঁচড়োর যে-ইস্কুলে পুষ্পকণা প্রধানা শিক্ষিকা সেখানে কমলা দরখাস্ত করেছিলো কিন্তু কাজ পায় নি। তারা নাকি বি. টি পাশ মেয়ে পেয়ে গেছে। সম্প্রতি কমলা স্থানীয় মেয়ে-ইস্কুলে কাজ পেয়েছে। বাড়িতে প'ড়ে এম. এ. পরীক্ষা দেবে সে। বাঙ্‌লাতে এম. এ। ভবানীপুর এখন তো বেশ একটি শহর। ছোটো অবশ্য। তবে খুব ছোটো আর কই? '৪৭ খৃষ্টাব্দের পর আয়তন দ্বিগুণ হ'য়েছে এখন ইস্কুলটির। '৪৩ সালে স্থাপিত হ'য়েছিলো। বাড়তে বাড়তে এরি মধ্যে এখন বেশ বড়ো ইস্কুল। তখন নাম ছিলো উইলিংডন্‌ বালিকা বিদ্যালয়। লাটসাহেবের নামে ইস্কুল। স্বাধীনতার পর নাম বদলাবার হিড়িকে ভবানী-বিদ্যালয় নাম ধরেছে। নামটা শুনতে ভালো। ভবানীপুরের ইস্কুল ব'লেই নামটা ঐ রকম হ'য়েছে, কিন্তু ভবানী বিদ্যালয় বললে হিন্দুর মনে যে-আভাস আসে সেটি প্রসন্ন ও সুন্দর।

এক সময় কমলা বললো, "বিয়ে না ক'রে থাকা যায় না?"

"আমি তো আছি।"

"না। মেয়েরা?"

"কেউ কেউ আছে।"

"অগত্যা নয়; স্বেচ্ছায়?"

"যতো দিন স্বেচ্ছা থাকে ততোদিন কেন পারবে না?"

"চিরদিন স্বেচ্ছা থাকতে পারে না?"

"চিরদিনের কথা আজকের দিনেই নিশ্চিত করা যায় কি-ক'রে?"

"তবে আপনি নিশ্চিত নন?"

"এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত।"

"আপনাকে আমার ভারি ভালো লাগে। আমি এতো বেশি আসি ব'লে রাগ করেন না তো?"

"প্রকাশ পেয়েছে কি?"

"না।"

"তবে কি চেপে থাকি?"

"না। আপনি অকপট।"

"তুমি?"

"নিজের মুখে কি বলা যায়?"

কমলা মেয়েটি গভীর চিত্ত। এই তরুণ যৌবনে যখন চলায়, ছলায়, বলায় জ্ব'লে ওঠা ও জ্বালিয়ে তোলার কথা, তখন মেয়েটা সরস হ'য়ে-ও তরল নয়, বুদ্ধিমতী হ'য়ে-ও ধূর্ত নয়, চিত্তশালিনী হ'য়ে-ও সুখ-সোহাগিনী নয়। কমলা নরেন্দ্রকে শ্রদ্ধা করে। বৃন্দাবনচন্দ্র মেয়েকে কী রকম একটি গভীর স্নেহে ভালোবাসেন যাতে তার স্বাধীনতায় হাত দিতে ইচ্ছা করেন না। না হ'লে দারিদ্র্যের লেশ-ও যাদের সংসারে নেই, তাদের ঘরের মেয়ে শিক্ষিকা হয় কেন? অতি-ধনী ও অতি-শিক্ষিতের ঘরের মেয়ে বিলেত যায়। বিলেত থেকে এসে কলেজে প্রফেসারি করে। বিলিতী যাদের ডিগ্রী তারা মহিলা-শিক্ষিকা তৈরি করার বিদ্যায়তনে প্রিন্সিপ্যাল-ও হয়। কিন্তু কমলা? সে যে কেন বিয়েতে নারাজ, কেন স্বাধীন ভর্তৃকা; কেন চঞ্চল হ'য়ে-ও তরল নয়— তা অনেকেই বুঝতে পারে না।

কমলাকে নিয়ে যাবার জন্য ভৃত্য একটু আগেই এসে গেছে। কমলা যখন বাড়ি যাবার জন্য উঠতে যাবে, তখন হঠাৎ আম্রাকে নিয়ে রজব উপস্থিত।

কমলাকে দেখে আন্না খুব খুশি। বললো, "কমলাদি, আজ তবে তোমার রান্না বাবা খাবে?"

"না ভাই, উনি দুধ-রুটির ব্যবস্থা করেছেন।"

"দুষ্টু বাবা।"

"দুষ্টু আমি। চ'লে এলি যে?"

"মন-কেমন করলো।"

কমলা চ'লে গেলো। আন্না দরজা পর্যন্ত বাবার সঙ্গে এগিয়ে গেলো। রঞ্জব আজ এইখানেই থাকবে। কাল সে অফিস যাবে না। অনেক ছুটি পাওনা হ'য়েছে। এসে যাবে না। অবশ্য, খাওয়া সে সেরেই এসেছে।

কয়েকটা মাস কেটে গেলো। বটতলা ইস্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক জীবনকৃষ্ণের নায়কত্বে বিদ্যালয়ের দিনগুলো কেটে গেলো চট্‌পট্‌। জীবনকৃষ্ণের নিজ জীবনের অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের তথা পারিবারিক জীবনের মাসগুলি-ও অনতিমন্থরতায় অতীত হ'য়ে গেলো। নরেন্দ্র মাস্টারের অদ্ভুত পিতাপুত্রী জীবনের দিনগুলি অতিক্রান্ত হ'লো কিছুটা কষ্টেই। একেবারে কপর্দকহীন হ'তে নরেন্দ্রের এখনো বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে পত্রিকায় লেখা জ'মে উঠেছে। Independence ভিন্ন অন্য দুখানি কাগজে নিবন্ধ লিখছেন তিনি; বোম্বাই-এর একখানি পত্রিকাতে-ও লেখা দেন। তা ছাড়া শিক্ষাবিষয়ক বইখানি শেষ ক'রে প্রকাশক স্থির করার অসুবিধা দূর হ'য়েছে। শীঘ্রই বইখানির মুদ্রণ শুরু হবে।

ইতিমধ্যে বংশীধরের মারফৎ নরেন্দ্র ইস্কুলের খবর পান। বংশীধর এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে। রীতিমতো পড়াশুনা করছে সে। নরেন্দ্র তাকে সপ্তাহে তিনদিন একঘণ্টা ক'রে তত্ত্বাবধান করার সময় ক'রে নিয়েছেন। তা ছাড়া আরো ছয়জন ছাত্র এখন নিয়মিত তাঁর কাছে পড়ে। সপ্তাহে তিন-দিন মাত্র তিনি পাঠ দেন বংশীধরেরেই সঙ্গে। তারা-ও বংশীর সহপাঠী। এই অধ্যাপনার দক্ষিণারূপে তিনি যে টাকা পাচ্ছেন তাতে ছোটো বাড়িখানার ভাড়া দিয়ে সংসারযাত্রার দায় অনেকখানিই মিটে যায়।

আন্নাকালি বংশীদা'র লেখাপড়ার সময় বাবার কাছে ব'সে ব'সে আপন পাঠের নীরব অনুশীলন করে। নরেন্দ্রের বুঝতে দেরি হয় না আন্নার এ-আগ্রহ পাঠের প্রতি যে নয় তা নয়, তবে ভালো ছাত্র বংশী তার আদর্শ হ'য়ে ওঠার ফল এটি অনেকখানি। মনে মনে আন্না বংশীকে স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে। চোখ ফেলে চাইছে সস্নেহে, মন ফেলে ছাইছে হৃদয় বিস্তার ক'রে। পল্লবিনী এই লতিকার আত্মবিস্তার খুব কঠোর নয়, সুদৃঢ় নয়।

পড়াবার সময় বাবাকে চা দিতে গিয়ে যেদিন আনি বললো, "বাবা, বংশীদা চা খায় না, না?" সেদিন নরেন্দ্র স্মরণ করতে পারলেন যে, আন্নার কাছে তার অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি একথা-ও বলেছিলেন।

কিন্তু বংশীর সম্মুখে এই কথার উত্থাপনে নরেন্দ্র বুঝলেন আন্নাকালি হৃদয়ের কোন্ মালঞ্চ-কোণে বলছে যেনো, বংশীদা-ও যদি চা খেতো, মন্দ তো হ'তোই না, বরং বেশ ভালো হ'তো। বংশীর অন্যান্য সহপাঠীদের কথা তার একবার-ও মনে হয় নি।

একবার-ও যে নরেন্দ্রের শিক্ষাতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিত্ত কোনো সুমধুর সংশয়ে দোলায়মান হয় নি, তা নয়। তবে এই অতি-মৃদু, অতি-কোমল, অতি-অস্পষ্ট হৃদয়-হিন্দোলটুকু তাঁকে খুশি করেছে যতো, অবহিত করেছে তার চেয়ে কম।

জগত্তারিণী বিদ্যালয়ের সংবাদ ভালো নয়। বংশী বলে। কমলা-ও বাপের মুখে শুনেছে এবং নরেন্দ্রকে বলেছে। কমলা আবার নরেন্দ্রকে বলেছে, এক বাণী হালদার নামের এডুকেশনে এম. এ. মেয়ে তাদের ইস্কুলে প্রধানা শিক্ষিকা হ'য়ে এসেছে। সে নাকি জীবনকৃষ্ণবাবুর এম. এ. ক্লাসের সহপাঠিনী।

জীবনকৃষ্ণের বিবাহের পর তিনি চুঁচড়োতে শ্যালিকা পুষ্পকণার বাসায় স্ত্রীকে নিয়ে বাস করছিলেন। তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ী-ও সে-বাসায় থাকতেন। দেড় মাস যাবৎ জীবনকৃষ্ণ চুঁচড়োতেই আলাদা বাসা করেছেন। ইস্কুলে তিনি ভালো ক'রে কাজ করতে পারছেন না। বৃন্দাবনচন্দ্র তাঁর কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট। সুধীরবাবু বা মহীতোষবাবু-ও অখুশি। সুধীরবাবু খুব বেশি বিরক্ত। সুধীরবাবু নিজে কলেজী লেখা-পড়ার ধার দিয়ে-ও যান নি জীবনে। তৎসত্ত্বে-ও অফিসের চাকরিতে খুব বড়ো পদে অধিষ্ঠিত হ'তে পেরেছিলেন। ডিগ্রিধারী মাস্টার-শ্রেণী বা সাধারণভাবে ডিগ্রিধারী শিক্ষিতের প্রতি তাঁর একটা অনাস্থা ছিলো। অফিসে এম. এ. ডিগ্রিধারী অধস্তনদের ইংরেজি চিঠির খসড়া অনেক বদল করলে তবে তিনি স্বীকার করতে পারতেন: সব সময় অধস্তনদের ভুল না থাকলেও রীতিপদ্ধতিতে ত্রুটি থাকতো রচনায়। এই যে শিক্ষিতের প্রতি সুধীরবাবুর বরাবরের অনাস্থা, সেটি এখন জীবন-কৃষ্ণের বিদ্যালয়-পরিচালনার অদক্ষতায় শিক্ষিত-বিরাগে পর্যবসিত হ'লো।

বিদ্যালয়ের দপ্তরখানায় সরকারী চিঠিপত্রে জীবনকৃষ্ণের লেখায় ভুল পেলেন তিনি; বিদ্যালয়ের নোটিশ-খাতায় ত্রুটি দেখলেন ভাষার, ছেলেদের পাঠদানে যথেষ্ট অদক্ষতা তাঁর গোচর হ'লো। যতোখানি ত্রুটি-বিচ্যুতি-

অনৈপুণ্য তিনি দেখলেন এবং যতোখানি ক'রে সেগুলি অপরের অর্থাৎ কমিটির মেম্বরদের গোচরে আনলেন, ততোখানি দোষ ও অপরাধ জীবনবাবুর প্রাপ্য ছিলো কিনা পারদর্শী ইস্কুল-পরিদর্শক তা বলতে পারেন। তবে বিলেতী য়ুনিভার্সিটির শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ. যে পরিদর্শক মশাই তাঁকে খাতির ক'রে গিয়েছিলেন, তিনি এখন আর এ-জেলায় নেই; তাঁর পরিবর্তে একজন যে এম. এ. বি. টি ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি জগত্তারিণী বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসে গত মাসে জীবনবাবু সম্পর্কে সুবচনী ব'লে যান নি। মানুষটি যে অত্যন্ত অলস, সেই ত্রুটি সবিস্তার একটি পুরো অনুচ্ছেদ ব্যেপে তিনি লিখে গেছেন।

জীবনকৃষ্ণ যে ভালো পড়াতে পারেন না, সে-খবর বংশীধর-ও নরেন্দ্র-বাবুকে দিয়েছিলো। ইংরেজি গদ্যাংশের পাঠ্যপুস্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কলনে যোয়ানদার্ক আছে পাঠ্য। রচনা আর্থার মী'র। স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা জীবনবাবু যা করেছেন, নরেন্দ্র দেখলেন সে-ব্যাখ্যা সুধু দুর্বল নয়, সে-ব্যাখ্যা ভুল-ও। তিনি অকপট ছাত্রদের সে-কথা গৃহে পড়াবার সময় বুঝিয়ে ব'লে দিয়েছেন। সংগে সংগে সাবধান করেছেন তা'রা যেনো এই নিয়ে গোলমাল না করে এবং তাঁর ব'লে-দেওয়া ব্যাখ্যা জীবনকৃষ্ণকে দেখায়। ব্যাখ্যা দেখে জীবনকৃষ্ণ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন এবং বংশীধরকে বলেন তার ব্যাখ্যাটি ছেলেদের লিখিয়ে দিতে। ছেলেরা জানে এ-ব্যাখ্যা বংশী নরেন্দ্র-বাবুর কাছে পেয়েছে। তা'রা ব্যাপার বুঝে প্রকাশ্যে চেপে গেলো। কিন্তু অসন্তোষ তাদের জেগে রইলো। অবশ্য জীবনবাবু বংশীকে একদিন বললেন, "এ সব ব্যাখ্যা তোমার নিজের রচনা?"

"আজ্ঞে না। আইডিয়া আর পয়েন্ট্‌গুলি মাস্টার মশাই-এর এবং ভাষা আমার। তবে মাস্টার মশায়ের করেক্‌সন্‌ আছে।"

"একটা-ও তাঁর নিজস্ব রচনা নয়?"

"কয়েকটা আছে। নমুনা দেবার জন্য আমাকে ডিক্টেট্‌ ক'রেছিলেন।"

"তুমি তাঁর কাছে পড়ো জানি। আর কে পড়ে?"

"আমরা ছ-জন পড়ি।"

এই কথা শুনে জীবনবাবু তাদের সকলের খাতা দেখলেন পুনর্বার

নজর ক'রে ক'রে। বুঝলেন শিক্ষক সকলকে তাদের স্ব স্ব ভাষায় রচনা করিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে স্বতন্ত্ররূপে সংশোধন ক'রে দিয়েছেন।

জীবনকৃষ্ণ অদক্ষ। জীবনকৃষ্ণ অলস। কিন্তু গুণীকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা তাঁর নেই। মানুষটি কোথায় যেনো ভালো-মানুষ। অথচ খুবই সামান্য চিত্তপরিধিতে সীমাবদ্ধ। বিদ্যালয়ের তদারক করা তাঁর দেহে-মনে অনিচ্ছিত। একটা তামস গহ্বরের আশ্রয়ে শীতের সাপের মতো তিনি। অন্ন উপার্জনের জন্য ঘটনাক্রমে শিক্ষকতার অবহেলিত পথে এসে পড়েছেন। একটা কলমপেষা চাকরির রাস্তায় গেলেই ভালো হোতো। ইস্কুল মাস্টারি যতোই অবজ্ঞার কাজ হোক্ সাধারণের বিবেচনায়, আসলে মাস্টারি, বিশেষতঃ হেড্ মাস্টারি অনলস, বুদ্ধিমান ও সৎ মানুষের কাজ। একথা বুঝতে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রধুরন্ধরদের কতো দেরি লাগবে সেটা পাক্-ভারত রূপ বিভক্ত ভারত যিনি আমাদের স্বাধীনতার উপহার দিয়েছেন সেই বিধাতাই জানেন:

জীবনকৃষ্ণ মানুষটা বিয়ে না করলে কি এতো তামসিক হ'য়ে যেতো না? তবে কি তেত্রিশের জীবনকৃষ্ণ কুড়ির কণিকাকে বিবাহ ক'রেই যতো বিভ্রাট? তাই বা কেন? তবে কি পুষ্পকে পাশে রেখে কণিকাকে দাম্পত্যের দখল দেওয়ায় এই ঝঞ্ঝাট? কি জানি!

কণিকা মেয়েটি বেশ। কাজ-কর্মে বেশ। স্বামী সেবায় বেশ। বাবা ও মায়ের প্রতি ভক্তিতে বেশ। দিদি অর্থাৎ পুষ্পকণার প্রতি আনুগত্যে বেশ ছিলো, এখন নয়। জীবনকৃষ্ণ যখন জানলেন কণিকা অন্তঃসত্ত্বা, তার আগেই পুষ্পকণা জেনেছিলো সে-খবর মায়ের মুখে। তখন থেকে পুষ্প, কণিকার কাছ থেকে দূরে থাকে। কণিকা ছাড়া আর কেউ সেটি বুঝতে পারে না। কারণটা এতো অস্পষ্ট যে, নিজে ভাবতেই কণিকার দেরি লাগবার কথা। তা ছাড়া, কণিকা সাদাসিধা। সাদাসিধা হওয়া কিন্তু অতো সহজ কি? তবে কি বলবো বোকা? বলবো না-ই বা কেন? জীবনের গহনপ্রদেশের সূক্ষ্ম জালজঞ্জালের ব্যাপারে সেয়ানা যারা তারা সমুদয় নয়; কতিপয়।

কণিকা দেখেছে জীবন পুষ্পকণার পরীক্ষার খাতা দেখে দেয়, সরকারী চিঠিপত্র লিখতে সাহায্য করে, শিক্ষা সম্পর্কে অর্থাৎ নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক-সমিতি বা নিখিল-ভারত-শিক্ষক সম্মেলন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে।

তা ছাড়া আর কিছু তো নয়? তবে সামান্য সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে জীবনের সঙ্গে কণিকার যদি প্রণয়-কলহ হয়, তবে পুষ্প সে-কলহে হস্তক্ষেপ করে। কণিকার মতো সরল ছেলেমানুষকে দুঃখ দেয় ব'লে জীবনের মতো বুদ্ধিমান পুরুষকে তিরস্কার করে। কণিকা তাতে অস্বস্তি পায়। কারণ ঝগড়াটা তাদের, ঝগড়া সামান্যই এবং ঝগড়াটা কণিকার খারাপ লাগে না। একবার জীবনের কাছে একথার উত্থাপন-ও করে। জীবন বুঝিয়ে দেয় যে, নিজে বিবাহ করেনি ব'লে পুষ্প্ স্বামী-স্ত্রীর মধুর ঝগড়া-মস্করা বুঝতে পারে না।

যাই হোক্ তলিয়ে তলিয়ে দিন যাচ্ছিলো। কিন্তু সম্প্রতি কণিকার গর্ভ নষ্ট হওয়ায়, জীবনকৃষ্ণ বিষণ্ণ ও অত্যন্ত বিব্রত হ'লেন। তার ফলে ইস্কুলের কাজে একেবারে এলোমেলো ও আল্‌গা ভাব চূড়ান্ত হ'য়ে উঠলো। ছেলেরা নরেন্দ্রবাবুর পরামর্শ চাইলো বংশীধরের মারফৎ। বংশীধর জানালো মাস্টার মশাই আরো অপেক্ষা করতে বলেছেন। মোট কথা, বংশী বুঝেছে মাস্টার মশাই এ সব কথায় আর থাকতে চান না। তা ছাড়া তিনি শীঘ্রই শ্রীরামপুরে চ'লে যাবেন। রজবদের বাড়ির কাছে একটি ছোট্ট সুন্দর দ্বিতল বাড়ি পেয়েছেন এবং সে-বাড়ির উপর তলায় যিনি থাকেন তিনি একটি বড়ো প্রেসের মালিক। নরেন্দ্রবাবু সেই প্রেসে চাকরি করবেন এবং ভবানীপুরকে ছেড়ে যাবেন।

এদিকে বৃন্দাবনচন্দ্রের কথায় সুধীরবাবু জীবনবাবুকে সরাবার কথা ভাবছেন। বৃন্দাবন বলেন প্রধান শিক্ষককে সরলভাবে সব বলা হোক্, বলা হোক্ অন্যত্র কাজ খুঁজতে; এবং তাঁরা-ও যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান করুন। বৃন্দাবনের ইচ্ছা নরেন্দ্র আবার আসুন। কিন্তু সেটি সম্ভব নয়; এবং জীবন বাবুই বা যাবেন কেন?

একদিন বৃন্দাবনচন্দ্র জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সকল বৃত্তান্ত অকপটে বললেন তিনি। আশ্চর্য এই, জীবনকৃষ্ণ অসন্তোষের কোনো লক্ষণ দেখালেন না। পরে সুধীরবাবুর মুখে বৃন্দাবনচন্দ্র শুনলেন জীবনকৃষ্ণ বেশ একটু হালচাল হ'য়েছেন এবং ইস্কুলের কাজে খাটছেন। ছেলেরা-ও বিমুখ-মন ফিরিয়ে তাঁর কিছুটা অনুকূল হচ্ছে। বৃন্দাবনচন্দ্র ভাবলেন; "হবে না? দু-পাতা পেটে গেছে তো?"

নরেন্দ্র এসেছেন শ্রীরামপুরের বাড়িতে। কমলা-ও এখন ভবানীপুরের ইস্কুল ছেড়ে শ্রীরামপুরের এক বালিকা বিদ্যালয়ে কাজ নিয়েছে। বৃন্দাবনচন্দ্র এতে খুশি হন নি। কিন্তু কমলার অসুবিধার কথা যখন সে বাবাকে অনেকখানি বললো, তিনি তখন চুপ করতে বাধ্য হলেন। তবে কমলার চাকরির দরকার-ই বা কী? কিন্তু যে-মেয়ে যৌবনে ভাসছে অথচ বিবাহ করবে না, তার একটা কিছু তো করা চাই। কাজেই কমলার এই কাজ নেওয়ায় বাপের অনিচ্ছা থাকলেও আপত্তি মাথা তুললো না।

বাণী হালদার কমলাদের উইলিংডন্ বালিকা বিদ্যালয়ে অর্থাৎ ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ে হেড্ মিস্ট্রেস্ হ'য়ে এসে জীবনকৃষ্ণকে দেখলো। জীবন দেখলো বাণী হালদার তেমনটিই রয়েছে দেখতে-শুনতে। সেই খানিকটা-স্থূল দেহ, সেই নাকের ডাঁটির অতি কাছে দুটি তির্যক চোখ, সেই অগোছালো বেশ-বাস, সেই প্রগল্‌ভ কথাবার্তা, সেই রকমই পুরুষদের সমীহ করে না আদৌ।

আজকাল একশ্রেণীর মেয়ে পথে-ঘাটে চোখে পড়ে, যারা কোন্ জাতির মেয়ে রবীন্দ্রনাথ নজর করলে বলতে পারতেন। প্রবীণতম একটি বড়ো-গল্পে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন যে, মেয়েরা দুই জাতের; এক মায়ের, অন্যটি প্রিয়ার। কিন্তু বাণী হালদার-রা প্রিয়া-ও নয়; মা-ও নয়। তাকে দেখলে আলাপ করতে চায় না যুবকরা, কাছে ঘেঁসতে চায় না শিশুরা। সব চেয়ে মুশ্‌কিল্ হ'য়েছে বাণীর পেট্‌টা। কুমারী মেয়ে, ছেলেপুলে পেটে ধরে নি, কিন্তু বেশ একটু স্থূলোদরী। কি করবে বেচারা? নিজের হাতদুখানা দিয়ে তো আর নিজের দেহটা বানাবার স্বাধীনতা পায় নি সে? তা ছাড়া বাণীর কণ্ঠস্বর কর্কশ। এ-ব্যাপারেই বা তার হাত কৈ? অভিনেতা সরেশ মিত্তিরের কণ্ঠ যে অস্বাভাবিক রকমের একটা চিল্‌তে-কাটা আওয়াজ, অভিনেতা স্বরাজ ভট্টাচার্য যে ট্যারা; তাতে তা'রা কি করবে? বলতে পারে কেউ, তাদের রঙ্গজগতে আসা কেন? অর্থাৎ হালদারদের বহির্জগতে প্রকাশ্য

হওয়া কেন? তাই যদি বক্তব্য হয় তবে গায়িকা তনুশ্রী দেবীর সকলের সামনে ব'সে গাওয়া উচিত নয়; সে দেখতে বিদ্‌কুটে। উৎফুল্ল সেনের মন্ত্রী হওয়া উচিত নয়; সে-ব্যক্তি ক্যাঁক্‌লাসে মাকড়সা। শ্রীযুক্ত হরিশংকরের সাত ছেলের বাবা হওয়া অনুচিত; কারণ তিনি তিন হাত দীর্ঘ কিনা সন্দেহ।

গোল বেধেছে মেয়েরা বাইরে আসাতেই। যতোদিন ওরা ঘর আর বর, ছেলে আর ছাউনি, সিঁদুর আর সাড়ি নিয়ে অন্দরে ছিলো—ততোদিন ঘোম্‌টার ঘের দিয়ে ওরা স্থূলোদর, ত্যার্‌চা চোখ আর কর্কশ কণ্ঠ ইত্যাদি ব্যাপারকে একখানি প্রাঙ্গণের পরিধিতে সসীম রেখেছিলো। তখন তাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে এতো ব্যস্ততা কারোরই ছিলো না। আজ সদরে-দরবারে, গল্পে-উপন্যাসে, নাটকে-চলচ্চিত্রে এই সব প্রকাশ্য মেয়েদের নিয়ে ভুল দেখা আর ভুল বোঝার বোঝা বেড়েই চলেছে।

বাণী হালদার একালের এডুকেশনে এম. এ. পাশ করা মেয়ে। তার রূপব্যাখ্যা ছেড়ে দিলে তার প্রকৃতি তো একটা আছেই। মানুষ হিসেবে সেই প্রকৃতির একটা আলোচনা তো এসে পড়বেই। মিশতে গেলেই যে বা যারা মিশবে তা'রা একটু বলবে বৈ কি। উইলিংডন্‌ বালিকা বিদ্যালয়ে বাণী এলো প্রধানা শিক্ষিকা হ'য়ে। যে-মহিলা এতোদিন ওখানে প্রধানা শিক্ষিকা ছিলেন, তিনি সম্প্রতি এক সরকারী বড়ো চাকুরেকে বিয়ে ক'রে রাঁচিতে গৃহস্থালি করছেন। বাণীর তো সে-সৌভাগ্য হয়নি। তাই বিরূপ নিয়েই সদরে র'য়ে গেলো সে। স্বরূপ অবগুণ্ঠিত ক'রে অন্দরে ঢুকতে পারলো না।

বাণী জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে কিছু কিছু মিশবার চেষ্টা করতে একটু দ্বিধা করলো প্রথমটায়। কারণ, মধ্যে অনেক সময় কেটে গেছে। য়ুনিভার্সিটির জীবনে মেশার দিনগুলি আর নেই। জীবন যে বিয়ে করেছেন তা বাণী জানে। এমন কি জীবনবাবুর একটি সন্তান হ'তে হ'তে যে হ'লো না, সে-খবর-ও সে পেয়েছে। হাজার হোক্‌ মেয়ে কিনা। অন্দরের আঁচল সদরে-ও বিছিয়ে বসে। সকলে নয়; অনেকে।

সকলে নয় কিনা জানি না। তবে কমলা নয়। কমলা মেয়েটি স্বতন্ত্র। বিদ্যালয়ে প্রধানা হ'য়ে এসেই কমলার সঙ্গে বাণীর সংঘর্ষ হ'লো। কমলা মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেশে; কমলা সরল ভাবে সাড়ি প'রে ইস্কুলে

আসে, ত্যার্‌চা ক'রে পাছায় প্যাঁচ্‌ দেয় না; কমলা রীতিমতো সংস্কৃতির ধার ধারে;—কাজেই তার একটি সহজ ব্যক্তিত্ব অনায়াসেই সকলকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে, প্রসন্ন করে। বাণীর সেটা সহ্য হয় না।

বাণী এসেই জগত্তারিণী বিদ্যালয়ের নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিয়েছে, এমন কি নরেন্দ্র মাস্টারের ইতিবৃত্ত-ও। দৈবাৎ Independence কাগজে নরেন্দ্রের দুটি লেখা প'ড়ে ফেলেছিলো সে। শ্রদ্ধা হয় নি যে তা নয়; তবে ততো মনঃসংযোগ করে নি। জগত্তারিণী ইস্কুলের সদস্য বৃন্দাবনবাবুর কন্যা কমলা, কমলা নরেন্দ্রকে শ্রদ্ধা করে, নরেন্দ্রের বাড়ি যায়,—এ সব খবর-ও জেনেছিলো বাণী।

পড়ানোর ব্যাপারে-ও কমলার সঙ্গে বাণীর সংঘর্ষ লাগলো। একটি ছাত্রীর খাতায় বাণী ভুল করেছিলো ভুল-সংশোধনে। বাণীকে সেটি কমলা নিভৃতে দেখিয়েছিলো।—ইত্যাদি কারণে কমলা বাণী হালদারের কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে কামনা করছিলো মনে মনে। কিছুদিন পরেই তার সুযোগ মিললো।

কমলা নতুন কাজ পেয়ে খুশিই হ'লো। তবু মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের বাড়ি যেতে পারবে। আনিকে সে ভালো বেসেছিলো। আর নরেন্দ্রকে-ও সে সান্নিধ্যে চায়। অন্তরের সান্নিধ্যে। অন্তরে সান্নিধ্য চাইলে বাইরে-ও সান্নিধ্য পেলে অন্তর খুশি হয় বৈ কি।

নরেন্দ্র প্রেসের কাজে যান দুপুরে। ফিরতে তাঁর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়। কাজেই কমলা মাঝে মাঝে কিছু আগের এক ট্রেনে গিয়ে বা কোনো-দিন একটু আগে বাসে গিয়ে আনির কাছে কিছুটা সময় থেকে, ইস্কুলে যায়। ওদের ইস্কুল নরেন্দ্রের বাসা থেকে পাঁচ মিনিটের পথ-ও নয়।

প্রায়-রবিবারই কমলা সকালে আন্নাকালিদের বাড়ি আসে। প্রথম দু-একবার বৃন্দাবনবাবু-ও এসেছিলেন। ইদানীং কমলা সকালে আসে আর খাওয়া সেরে সন্ধ্যার পূর্বে ফেরে। নরেন্দ্রের শিক্ষাতত্ত্বের নতুন বইখানি প্রকাশিত হ'তে আর দেরি নেই।

নরেন্দ্র যে-প্রেসে কাজ নিয়েছেন সেটি উত্তর কলকাতার মধ্যে বেশ বড়ো প্রেস। নরেন্দ্র ইচ্ছা জানিয়েছেন, মালিক সুবিধা মতো যাতে একখানি ভালো

মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অবশ্য সম্পাদনার ভার নরেন্দ্রেরই থাকে যদি। মালিক ভুবনমোহনবাবু কারবারী; কাজেই সতর্ক। তবুও নরেন্দ্রকে তিনি বুঝে নিয়েছেন। চতুর জাঁহাবাজ তো নয়ই, বরং নরেন্দ্র এ-যুগে হাটে-বাজারে অচল। নরেন্দ্রের সাহিত্যক্ষমতা ভুবনমোহন স্বীকার করেছেন মনে মনে।

সেদিন রবিবার ছিলো। কমলা এসেছে আটটা নাগাৎ। নরেন্দ্র তখন ব'সে ব'সে শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় বইখানির পাণ্ডুলিপি তৈরি করছেন। বইখানির নাম দেবেন "জাতীয় শিক্ষা কোন্ পথে?" কমলা হাজির হ'য়েই শুনলো আনি রঞ্জবদের বাড়ি গেছে। নরেন্দ্র একাকী একমনে লিখে চলেছিলেন। কমলা আসতেই লেখা থামালেন। কমলা অপ্রতিভ হ'য়ে বললো, "আপনি লিখুন, আমি একখানা বই টেনে নিয়ে পড়তে থাকি। আনি এলে আর আমাকে একা থাকতে হবে না।"

"না, না; আমার ব্যাঘাত ঘটে নি। এখনো ঠিক লিখতে শুরু করিনি। খসড়া করছি মাত্র।"

"এখানা মৌলিক গ্রন্থ হবে তো আপনার?"

"আশা করি। এখানা পূর্বের বইখানার মতো পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য শিক্ষাগুরু অর্থাৎ ওঁরা যাদের Educator বলেন—তাঁদের কথা কথা ও কাহিনীর আলোচনা নয়। জাতীয় শিক্ষা কেমন ক'রে ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠবে, তারই ভাবনা ভেবে চলবো এই গ্রন্থে। অবশ্য পথ দেখাবেন আমাদের জাতীয় শিক্ষাগুরুরা। রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ।'

"মাস্টার মশাই, এখানে বাড়ির কাজ-কর্মের জন্য যাকে পেয়েছেন সেটি তো পুরুষ মানুষ? রাঁধতে-বাড়তে কি আপনিই শেখালেন ওকে?"

"পুরুষ মানুষ অবশ্যই। তবে বয়েস মাত্র আঠারো। জাতে কাহার। রাঁধতে যৎসামান্য জানতো। এর আগে এক সব-জজের বাড়ি কাজ করতো। সেখানে দেখে দেখে কিছুটা শিখেছিলো। এখানে আমার চেয়ে বেশি শিখেছে আনির কাছে।"

"আনি কখন আসবে?"

"এখনই।"

"ও কি অনেকটা সময় রঞ্জবদের বাড়ি থাকে?"

"থাকে। দুপুরে রজ্জবের বৌ আসে এখানে। আনি-ও যায় সেখানে। যার যখন যেমন খেয়াল হয়।"

রজ্জব নরেন্দ্রের কলেজ-সহপাঠী ছিলো। আনি 'বড়ো' হ'লে কি-ক'রে আনিকে পালন করবেন বালিকার প্রথম যৌবনের সন্ধিতে, সে-ভাবনা থেকে নরেন্দ্র রেহাই পেয়েছেন। রজ্জবের বৌ রয়েছে। মুসলমান শিক্ষিত পরিবারে নরেন্দ্র কিছু মিশেছেন; রজ্জবের মতো গৃহস্থ বেশি দেখেন নি। রজ্জব তার বৌ আর দুটি মেয়েকে নিয়ে বেশ সহজ বাঙালীর জীবন কাটাচ্ছে। মেয়ে দুটির জন্ম হ'য়ে ছিলো আরো দুটি ছেলেমেয়ের জন্মের পর। তারা বেঁচে নেই। বর্তমানে বড়ো মেয়েটির বিবাহের সম্বন্ধ করছে। ছোটোটি ইস্কুলে পড়ে। কমলা যে-ইস্কুলে পড়ায় সেই ইস্কুলে এনে ভর্তি ক'রে দেবে রজ্জব।

আন্নাকালি ফিরলো ঘরে। কমলাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলো। বললো, "আজ মাংস রান্না করবো কমলাদি। 'গোপী' মাংস রাঁধতে শিখেছে।" কমলা জানতো না কাহার ভৃত্যটির নাম 'গোপী'। এর পূর্বে 'ঝাপ্সি' ব'লে ডাকতে শুনেছে নরেন্দ্রের মুখে। প্রশ্ন ক'রে জানলো, নরেন্দ্র 'গোপী' নামের প্রবর্তক। কমলা বুঝলো, নরেন্দ্র সত্যিই ভাবুক। মুসলমানী 'আমিনা' নামকে বদল ক'রে রাখেন 'আন্নাকালি'; 'ঝাপ্সি' নামের খোট্টাই গন্ধ বেমালুম চ'লে যায় 'গোপী' নামে ডাকলে। গোপীর হাতে কিন্তু লোহার বালা আছে এখনো। তাতে সেই কালো মজবুত্ কিশোর ছেলেটিকে সুন্দর দেখায়।

গোপী এলো। কালো, মজবুত্, ঋজুদেহী, আঠারো বছর বয়সের সুস্থ সেই যুবক আন্নাকে বললো, "আন্নাদি, কখন রান্না চড়াবে?"

"দেরি আছে রে। তুই অন্য কাজ কর্। আগে কমলাদি-কে চা এক পেয়ালা ক'রে দে। বাবার জন্যে-ও। বাবা, আজ আমি আধ পেয়ালা খাবো?"

"খাবে। আধ নয়, পুরো পেয়ালা।"

"খুব মজা হবে।"

আন্নাকালির আনন্দিত করতালি নরেন্দ্রের মুখে মনোহর যে-হাসিটি ফোটালো, কমলা তার তাপ অনুভব করলো। কমলা নরেন্দ্রের অন্তর-সন্নিধানে অনেকখানি জায়গা দখল করেছে।

[১৩]

জীবনকৃষ্ণ বটতলা ইস্কুল চালিয়ে যাচ্ছেন পূর্বের আলস্য ও অমনোযোগিতা কিছুটা কাটিয়ে ফেলে। চুঁচড়োর বাসাবাড়ি ছেড়ে তিনি ভবানীপুরেই বাসা নিয়েছেন একটা। ইস্কুল থেকে বেশি দূরে নয়। এই বাসা-বদলের ব্যাপারে তার শ্বশুর-শাশুড়ির আপত্তি ছিলো, খুব বেশি আপত্তি ছিলো পুষ্পকণার। সে বলেছিলো, "কণির একলা অসুবিধে হবে খুব। এটা গোঁয়ার্তুমি হচ্ছে নাকি?" এ কথায় জীবনকৃষ্ণের আপত্তি ওঠবার আগেই কণিকা নিজে পুষ্পকণাকে বেশ একটি সাফ্ জবাব দিয়েছিলো। কণিকার মুখে এতো দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাষা শুনে পুষ্পকণা প্রথমটা ভেব্ড়ে গিয়ে পরে সামলাতে পারলে-ও ধাক্কাটা ভুলতে পারে নি।

ভবানীপুরের বাসাতে উঠে এলে পর পুষ্প যেদিন এসেছিলো ওদের ঘর-কর্না দেখতে, সেদিন প্রথম যে-কথা পুষ্পকণা বললো তাতে পুরোণো সেই ধাক্কাটা বেশ খানিকটা কেটে গেলো, অন্ততঃ জীবনকৃষ্ণের মন থেকে। পুষ্প বললো, "বাসা-বদলের সময় বাবা-মা এসে সব গুছিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তো গেরস্থালি কায়েম। আমার আসার দরকার ছিলো না অবশ্য। তবে—।" শেষ হ'লো না ওর কথাটা। কণিকা ব'লে উঠলো, "দিদি, অমন ক'রে বোলো না। মন ভালো ছিলো না ব'লে সেদিন বাসা-বদলের ব্যাপারে তোমাকে হয়তো বেশি বলেছিলুম কিছু। কিন্তু এটা-ও তো ভোলো নি আমি এর আগে কোনোদিন তোমাকে কোনো উঁচু কথা কই নি।"

এর পর পুষ্প সহজ না হ'য়ে পারলো না। নিচু হ'তে হ'লো অনেকখানি। কণিকাকে নানা গৃহ-সাহায্য করলো। কর্মের ব্যস্ততায় মনে মনে ভাবতে লাগলো কণি অনেকটা বদলেছে। ওর মনটা বয়স্থা হ'লো এতোদিনে। বোধহয় মা হ'তে যাচ্ছিলো, তাই।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে গেলো। খাওয়া-দাওয়া সারা হ'য়ে গেলো। তারপর ওরা খানিকটা ঘুমিয়ে-ও নিলো। কণিকা আর জীবনকৃষ্ণ ঘুমুলো: পুষ্পকণা চোখ মুদে পনেরো মিনিট থাকার পর উঠে পড়লো। আর কোনো কাজ ঠিক করতে না পেয়ে কণিকার ভাঁড়ার গোছাতে মন দিলো।

এক সময় বাণী এলো সেখানে। বাণীকে দেখে পুষ্প প্রথমটা চমকে' উঠলে-ও পরক্ষণে বেশ সহজ হ'য়ে তাকে বসিয়ে দুজনে অনেক গল্প করলো। প্রথমটা যে-যার নিজের নিজের ইস্কুলের গল্প, তারপর বাড়ির, তারপর নিজেদের। নিজেদের অন্দরমহলের গল্প অবশ্যই নয়। ক'জন মেয়ে তা করে?

ওদের কথাবার্তা যখন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আর সদরমহলে কুলোচ্ছে না তখন গৃহস্বামী আর গৃহিনী ঘুম ভেঙে এলো। চারজনে তখন চা খাওয়ার উদ্যোগ করতে থাকলো। কণিকার ঠিকে-ঝি তখনই আসবার সময়। সে-কথাটা কণিকা বললো। পুষ্প বললো, "চা করবো, তারজন্যে ঝি-চাকর ডাকতে হবে নাকি? আমরা ও' বড়োমানুষী চাল দেবার মানুষ নই; বাণী-ও নয়। কী বলো ভাই বাণী?"

কথাটায় বাণী সায় দিলো অবশ্যই। না দিয়ে করে কি? তারপর চা খাওয়ার অবসরে জীবনকৃষ্ণের ইস্কুল সম্পর্কে জীবনকৃষ্ণ, বাণীর ইস্কুল সম্পর্কে বাণী, পুষ্পর ইস্কুল সম্পর্কে পুষ্প হেড্ মাস্টারির কথা নানা রকম বলতে থাকলো। কথা কম বললো কণিকা। সে হেড্মাস্টার বা হেড্ মাস্টারণী নয়। তা ছাড়া কথা বলে কম। বরাবরই। ইদানীং পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হওয়ার পর থেকে আরো স্বল্পভাষিণী হ'য়েছে সে। অন্ততঃ জীবন তাই মনে করে।

চা খাওয়া সারা হ'লো। বাণীর মোটের উপর সময়টা এইভাবে কাটায় মন্দ লাগলো না। মাঝে মাঝে সে আসবে ঠিক করলো। অবশ্য অন্যদিনে পুষ্পর না থাকারই সম্ভাবনা। কণিকাকে বেশ লাগে। সব সময়ে তাকে কাঁটা-উঁচু হ'য়ে থাকার মতো লাগে না। অনেকক্ষণই সে স'রে থাকে; কাছে থাকলেও মন জেঁকে থাকে না। বেশ আল্‌গা-ভাসা মানুষ। বাণী যাবার সময় কণিকার চিবুকে হাত দিয়ে খুশি জানিয়ে গেলো। খুব সহজ লাগেনি সেটা কণিকার। পরক্ষণেই ভাবলো, বয়সে তো অনেক বড়ো; ধরলোই বা চিবুকটা তার।

বাণী চ'লে গেলে পুষ্প জীবনকে বললো, "শুনেছিলুম বাণী বালবিধবা। কলেজে উচ্চ-বাচ্য না হ'লে-ও কানাঘুসো চলতো। এতোদিনে তোমার কী মনে হয়?"

"আর তো খেয়াল করিনি। বোধহয় সত্য নয়।"

"আমার-ও তাই মনে হয়।"

"কেন?"

"বিধবা; তবে বালবিধবা বিশেষ নয়। একটু বয়সে বিধবা।"

পুষ্পর এই কথায় কণিকা বললো, "কেন? পেটটা বড়ো ব'লে? দূর্। তাতে কী? তিন ছেলের মা'র-ও ছোটো ভুঁড়ি হয়; আবার আমাদের সঙ্গে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়তো ভুষী ব'লে যে-একটা মেয়ে, তার তো তখন থেকেই পোয়াতির পেট।" ব'লে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে সেখান থেকে উঠে চ'লে গেলো।

কণিকার এই ধরণের বাৎ-চিৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত। এর পূর্বে কখনো সে এমন ক'রে বলে নি। জীবন একটু অপ্রস্তুত হ'লো। পুষ্প অবাক। পুষ্পকণা ভাবলো, "বিয়ে হ'লে অভিজ্ঞতায় কি এতো বদল হয়? একটি মাত্র অভিজ্ঞতায়?" পুষ্প জানে না অভিজ্ঞতা একটি হ'লেও কতোখানি হ'তে পারে। তা ছাড়া কে কা'কে কতোখানি জানে? দুই বোন হ'লেও? বরং দুই বোন হ'লেই জানে কম। অনেক ক্ষেত্রে। অন্ততঃ এ-ক্ষেত্রে।

বিকাল গড়িয়ে আসছে। কণিকা কুয়োতলায় গেলো গা ধুয়ে নিতে। কুয়োতলাটি ঘিরে দেওয়া; স্নানের ঘরের মতো নিভৃত। স্নানের, গা ধোয়ার জল ফেলার শব্দ পাচ্ছে পুষ্প ঘরে ব'সে। জীবনকৃষ্ণ আর সে। ব'সে ব'সে একথা-সেকথা হচ্ছে। এক সময় জীবন বললো, "এবার বিয়ে করো।"

"কাকে?"

"যাকে মন চায়।"

"তোমাকে মন চায় যদি বলি?"

"কী যা-তা বলছো? কণিকা শুনলে অবাক হবে। এখনো ভারি সরল।"

"ছেলে পেটে আসার পর-ও?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি সরল। কণি নয়।"

"কেন?"

"তুমি ওকে বোঝো নি। মেয়েদের বোঝো না।"

"বাণীকে বুঝি। গোড়া থেকেই বুঝেছিলুম।"

"ঘোড়ার ডিম বুঝেছিলে। আমাকে-ও বোঝো নি।"

"তোমাকে আবার বুঝতে যাবো কি জন্য?"

"এসব কথা থাক্।"

এর পর দুজনেই চুপ করলো। কিছুক্ষণ কণিকার স্নানের আওয়াজ আসছে না। এক সময় পুষ্পকণা কাছে গিয়ে বন্ধ দ্বারে মুখ রেখে বললো, "কণি, হলো? আমি-ও এইখানেই গা ধুয়ে নেবো।" কণিকা উত্তর করলো, "আর পাঁচ মিনিট।" উত্তর পেয়ে পুষ্প ঘরে ফিরতেই জীবনকৃষ্ণ বললো, "তোমার বোনের একটু দেরি হয়।"

"কিসে?"

"সবেতেই। স্নান করতে; গা ধুতে।"

"আর?"

"আর কী?"

"রাঁধতে-বাড়তে?"

"না, রান্না-বান্না করে তাড়াতাড়ি।"

পুষ্পকণার কথার মধ্যে কী একটা শ্লীলতা বহির্ভূত ইঙ্গিত ছিলো কি? পুষ্প বিবাহ করে নি। দেহে অশুচি নয় নিশ্চয়। তবে কিনা মানুষের মনের অশুচিতা তো কৈশোরাবধি। এক সময় জীবনকৃষ্ণ বললো,

"শোনো। তুমি এখন আমার শালি তো?"

"এখন মাত্র? শালি তো অনেক আগে থেকেই। আর তুমি শালা অর্থাৎ ভগিনীপতি।"

"শোনো-না, একটা কথা বলি।"

"অতো কাছে টানা কেন হে? বউ এসে পড়বে না তো?"

আসুক্। সামান্য কথা। তুচ্ছ ব্যাপার।"

পুষ্পকণা কাছে আসতেই জীবন ওর মুখে চাইলো। উদাসীন দৃষ্টি মুহূর্ত কয়েক পরেই রূঢ় হ'য়ে উঠলো। পুষ্পকণার সংশয় জাগলো। হঠাৎ জীবন পুষ্পকে সজোরে চুম্বন ক'রেই স'রে গেলো।

"ওটা কী হ'লো?"

"শালি যে।"

"আমরা না মনস্তত্ত্বে ওস্তাদ; শিক্ষাতত্ত্বের বিশারদ?"

"হ্যাঁ; এম. এ—ইন্—এডুকেশন। এক্স্‌পেরিমেণ্টাল সাইকলজি ঘেঁটেছি।"

"যা করলে করলে; এর বেশি ঘাঁটিয়ো না।"

"দেখি যদি পারি।"

"সে আবার কি?"

এমন সময় "দিদি, আমার হ'য়ে গেছে," ব'লে কণিকা দোর খুললো।

শ্রীরামপুরে চ'লে আসায় নরেন্দ্রের গৃহছাত্র অধ্যাপনা আর চলছে না। তা ছাড়া সম্প্রতি ম্যাট্রিক পরীক্ষা-ও হ'য়ে গিয়েছিলো। বংশীধর সময় পেলেই এখানে আসে। অনেক দিন সাইকেলে চেপে সকালবেলাতেই আসে। আজকাল সে মধ্যে মধ্যে আন্নাকালির পড়া ব'লে দেয়। আন্নাকালির পড়া ব'লে দেওয়ায় বংশীর খুবই আগ্রহ; অবশ্য, বেশি আগ্রহ আন্নার নিজের।

সেদিনটা শনিবার। সকাল আটটা বেজে গেছে। আন্নাকালি পড়া শেষ ক'রে গোপীকে নিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত। সুধু ঝোল-ভাত নয়; আজকাল সে অন্য রকম রান্না-ও পারে। কতক কমলা এসে এসে শিখিয়েছে; কতক রজ্জবের স্ত্রী রাবেয়া। কাল আন্না মুরগীর মাংস রান্না করেছিলো। নরেন্দ্র খেয়ে প্রশংসা করলেন মেয়েকে। মেয়ের খেয়াল নেই নরেন্দ্র নিরামিষাশী না হ'লে-ও মাংস ততো ভালোবাসেন না। আন্না বরাবরই মাংসের পক্ষপাতী। যখনই ইচ্ছা করেছে মাংস রান্নার, নরেন্দ্র এমন ক'রে সমর্থন করেছেন তার আগ্রহের, যাতে আন্নাকালি কোনোদিনই নরেন্দ্রের আমিষ-অনাসক্তি ধরতে পারে নি।

যখন রান্না শেষ হ'লো তখন প্রায় দশটা বাজে। নরেন্দ্র আজ আর কলকাতা যাবেন না। তাঁর বইখানি প্রকাশিত হ'য়েছে। দশখানি গ্রন্থ কাল এনেছেন। কা'কে-কা'কে ব্যক্তিগত উপহার দেবেন তার একটা হিসাব মনে-মনে ভাঁজছেন এমন সময় কমলা এসে হাজির। আজ তাদের ইস্কুলে ছুটি। ইস্কুলের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে।

কমলাকে দেখে আন্নাকালি খুশি হ'লে-ও মনে মনে ভাবনায় পড়লো। রান্না যে শেষ ক'রে ফেলেছে সে। এ-সময় যখন এসেছে, কমলা নিশ্চয়ই অভুক্ত। কী করবে ভাবছে এমন সময় কমলা বললে, "আনি, রাঁধবে তো?"

"হ'য়ে গেছে। আবার শুরু করবো।"

"নষ্ট হ'য়ে গেছে বুঝি? বেরালে খেয়ে গেছে?"

"না, না। তুমি খাবে যে? এদিকে আমাদের তো বেশি ক'রে রাঁধা

নেই? তিনজনের মতো হ'য়েছে। বাবার, আমার আর গোপীর।"

"আমি যে খেয়ে এসেছি।"

"এতো আগে?"

"কেন, যেদিন-যেদিন সকালে এখানে আসি, খেয়ে আসি না?"

"ওঃ, তা-ও তো বটে। আজ-ও বুঝি তা-ই করেছো? আজ কিন্তু ইস্কুল নেই তো?"

"না।"

"তবে কেন আরো সকাল-সকাল না খেয়ে এলে না? খুব দুষ্টু তুমি। আমার যেনো চারজনের রাঁধতে কষ্ট হয়?"

নরেন্দ্রবাবু একখানা বই কমলাকে তার নাম-ইত্যাদি লিখে উপহার দিলেন। কমলা ভক্তির সংগে দু'হাত পেতে নিলো। বইখানার ছাপা ও কাগজ ভালো হ'য়েছে দেখে খুশি হ'লো। নরেন্দ্র বললেন যে, প্রকাশক গল্প বা উপন্যাস না হ'লে-ও খুব যত্ন ক'রেই বইখানি প্রকাশ করেছেন। নীরস শিক্ষাতত্ত্বের বই ব'লে হেলা-ফেলা করেন নি।

এগারোটার পর বাবা ও আনি খাওয়ায় বসলো। কমলা ওদের বসার আয়োজন ক'রে খাদ্যাদি জালি থেকে নামিয়ে থালা-বাটিতে পরিবেশন করলো। আন্না খুশি হ'য়ে বাপের মুখে চেয়ে বললো, "বাবা, কমলাদি বেশ গুছিয়ে ভাত বাড়ছে, না?" নরেন্দ্র হাসলেন।

খাওয়া সেরে কমলা আর আন্না আবোল-তাবোল গল্প করতে থাকলো। কমলাদের ইস্কুল থেকে এবার তিরিশটি মেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে নাকি এতো ভালো পড়াশুনা করে যে সকলেই মনে করে সে একটা উচ্চস্থান পাবেই। এই কথা শুনে আন্না বললো, "জানো কমলাদি, বংশীদা বোধহয় স্কলারশিপ্ পাবে। বাবা বলছিলো।" কথাটা নরেন্দ্রের কাণে গেলো। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে জবাব দিলেন, "আমার তো খুবই বিশ্বাস।"

তারপর কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন নরেন্দ্র। কমলার কাছে আন্নাকালি বংশীধরের প্রশংসা ক'রে যাচ্ছে অনর্গল। এক সময় কমলা ব'লে উঠলো, "আচ্ছা আনি, বংশীর চেয়ে ভালো ছেলে-ও তো আছে?"

"তাতে আমার কী দরকার?"

"তুমি বংশীদাকে খুব ভালোবাসো, না?"

"বংশীদা-ও আমাকে খুব ভালোবাসে।"

"বংশী প্রায়ই আসে?"

"পরীক্ষার আগে মাঝে মাঝে আসতো। এখন তো আর পরীক্ষা নেই। এখন খুব ঘন ঘন আসে।"

"আর আন্না ঘন ঘন তাকে দেখে।"

"বারে, এ আবার কী কথা? আসলে দেখবো না? আমি কি কাণি? আনি হ'লে বুঝি কাণি হয়?"

"তুমি তো বেশ মিল করতে পারো? আচ্ছা আনি, বংশীকে তুমি কি-রকম ভালোবাসো?"

"দুর্। তা কি বলা যায় নাকি? তুমি তো বাবাকে ভালোবাসো: কি-রকম ভালোবাসো?"

অদ্ভুত কথা তো। কমলা বিমূঢ় হ'লো। নিরুত্তরতা ভালো দেখায় না ব'লে উত্তর দিলো, "তোমার বাবাকে সবাই ভালোবাসে।" এ-কথায় আন্না ঠিক উত্তরটি পেলো কিনা কমলা বুঝতে পারলো না।

বিকাল যখন চারটে, আনি যখন চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করছে কমলার সঙ্গে, তখন লাফাতে লাফাতে বংশীধর হাজির। সে তার বাবার এক বন্ধু মারফৎ খবর পেয়েছে। পরীক্ষার ফল তার খুব ভালো হ'য়েছে। খুব সম্ভব একটা বৃত্তি পেয়েছে সে।

কথাটা যেই বললো বংশী, অমনি আন্নাকালি ছুটে এসে বংশীকে জড়িয়ে ধ'রে তার হাত ধ'রে টানতে টানতে ঘরময় আনন্দ-উল্লাসের মত্ততা উথল ক'রে তুললো। বললো, "বাবা, বংশীদা'কে খাওয়াতে হবে। সন্দেশ চাই, মাংস চাই, আরো অনেক কিছু চাই। বংশীদা, কী খাওয়া হবে তার ফর্দ আমি ব'লে দেবো।" এর উত্তরে বংশী বললো, "খবরটা পাকা হ'য়ে আগে বের হোক্।" আন্নাকালি সে-কথায় কাণই দেয় না। সে বলে, "ঠিক আসবে খবর। আমি স্বপ্ন দেখি রোজ রোজ।"

রোজ রোজ না হ'লেও আন্নাকালি প্রায় চার-পাঁচ দিন এই রকম সাফল্যের

সংবাদ স্বপ্নে দেখেছে। নরেন্দ্রের মুখখানি আন্নাকালির উল্লাসে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। কমলা ভাবলো বিংশ শতাব্দীর মধ্যক্ষণে পনেরো বছরের বংশীধর আর বারো বছরের আন্নাকালি ছাত্রসমাজে ক'জন? কমলার খেয়াল হ'লো না এযুগে কমলার মতো বাণী হালদার-ও নয়, কণিকা-ও নয়, পুষ্পকণা-ও নয়। আর নরেন্দ্রের মতো জীবনকৃষ্ণ-ও নয়, এ-ও নয়, সে-ও নয়।

চা খাওয়ার সময় বংশী বললো, "মাস্টার মশাই, আন্না-ও চা খাবে তো?"

"আজকাল আন্না প্রায়ই চা খায়।"

"আমি-ও অভ্যাস ক'রে ফেলেছি।"

কথাটা শুনেই আন্নাকালি হাততালি দিয়ে উঠলো। সে কী জয়োল্লাস।

আন্না ও বংশী ঘরের মধ্যে চ'লে গেলো। আন্নাই বংশীকে টানতে টানতে খাওয়ার ফর্দ করতে নিয়ে গেলো। বারান্দায় কমলা নরেন্দ্রের বইখানি উল্টেপাল্টে দেখতে থাকলো। কমলা আগামী আগষ্ট মাসে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাবে। তার বাবা রাজি হ'য়েছেন যেতে দিতে। সে ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকখানি বই পেড়ে ফেলেছে। বইগুলি বিরাট কলেবরের গ্রন্থ নয়। বড়ো বড়ো প্রবন্ধ কয়েকটি গ্রথিত ক'রে এক একখানি গ্রন্থ। অবশ্য বুঝতে সামান্যই পেরেছে। কিন্তু কোথায় যেনো কমলার বুদ্ধি আশ্রয় পেয়েছে তাতে। শুনে নরেন্দ্র বুঝলেন কমলা গভীর বুদ্ধির মেয়ে।

নরেন্দ্র বললেন, "তুমি বিবেকানন্দের 'Inspired Talks' পড়েছো?"

"পড়েছি।"

"বাঃ।"

"আপনি শ্রীঅরবিন্দ পড়ুন। শিক্ষার বইখানি তো পড়েছেন, অন্যগুলি পড়ুন। আপনি ঐ মোটা বইখানি-ও বুঝবেন।"

"Life Divine?"

"হ্যাঁ। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে দিলীপ রায়ের তীর্থঙ্করের লেখা পড়লুম। স্তম্ভিত হলুম।"

"ওখানা আমি-ও পড়েছি। দিলীপবাবুর উপন্যাস সুখপাঠ্য, কিন্তু

উপন্যাস নয়। অন্য অনেক লেখাই বড়ো বাগ্‌বহুল। এই তীর্থঙ্কর বইখানি কিন্তু অপূর্ব সুন্দর। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে লেখাটি আকারে অন্যগুলির চেয়ে ছোটো, কিন্তু—"

"গভীর।"

"ঠিক বলেছো।"

কথাবার্তা যখন এইখানে ঠেকেছে তখন দুজনেই এককালে বারান্দায় তাকাতেই দেখলো আনি বংশীর হাত দুখানা দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে বলছে, "বংশীদা, আনি নেই।"

কমলা বাড়ি গেলো যখন, বংশী-ও সেই সংগে বিদায় নিলো। সন্ধ্যাব বেশ খানিকটা আগে আন্নাকে নিয়ে গেলো রুজবের বৌ এসে। নরেন্দ্র একা বারান্দায় ব'সে রইলেন।

এখন তাঁর আর আর্থিক দুর্ভাবনা নেই। প্রেসের মালিক তাঁকে দুশো টাকা দিচ্ছেন গত মাস থেকে। সম্প্রতি পত্রিকা-প্রকাশের তোড়জোড় নরেন্দ্র শেষ ক'রে ফেলেছেন। আগষ্ট মাসের স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। পত্রিকা তিন মাস চললেই বোঝা যাবে তার প্রগতি। তখন মালিক ভেবে রেখেছেন নরেন্দ্রকে আরো পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ার কথা। আর পত্রিকার কাজ যতো বাড়বে, প্রেসের অন্য কাজ ততো কমিয়ে দেবেন তাঁর ঘাড় থেকে। ইদানীং নরেন্দ্র প্রেসের সব কাজই শিখে নিয়েছিলেন। তার ফলে প্রেসের হিসাব, ছাপাখানা, প্রচারকার্য ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই তাঁর নজর দেওয়ার ক্ষমতা হ'য়েছে। ফলে নরেন্দ্রের মতো সচ্চরিত্রের তত্ত্বাবধানে সমস্ত কাজকর্ম অনলসতায় ক্ষিপ্র হ'য়ে উঠেছে।

নরেন্দ্র পত্রিকার কথা ভাবছেন আর মধ্যে মধ্যে ভাবনা ভেসে উঠছে বংশী-আন্নার। ওদের দুটি প্রাণীর যে-রকম মধুমালতীমঞ্জরীমোহন চিত্ত, তাতে তাঁর আনন্দ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু সংসার অর্থাৎ সমাজটা কি অতো শাদা ধব্‌ধবে? তা ছাড়া বংশী ষোলো বছরের যুবক হ'তে যাচ্ছে। আর আন্না যে 'বড়ো' হ'য়েছে।

গত ডিসেম্বরের শীতে আন্না গিয়েছিলো রুজবদের বাড়ি; তিন দিন ছিলো সেখানে। রুজব মেয়ের বিয়ে দিলো। তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যায় রুজব

এসে খবর দিলো নরেন্দ্রকে আন্নাকালির। নরেন্দ্র হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। রজ্জবের স্ত্রী আন্নাকে বয়ঃসন্ধিতে জননীর সাহায্য করেছে। এর পর নরেন্দ্র মন বুঝে আন্নাকে বুঝিয়ে দেবেন।

তা-ও কি হয় নাকি? এদেশে? ওদেশে খুব ভাবুক আদর্শবাদী যারা তারা-ও, মা শেখায় মেয়েকে আর বাবা সামলায় ছেলেকে। আর সে-রকম মা-বাপের সংখ্যাই বা কতো? কিন্তু ওদেশে-ও একা বাপের একটি মেয়ে কখনো কোনোকালে একার সংসার যাপন করেনি কি? এমনতরো বেখাপ্পা সংসারী দুনিয়ায় চিরকালই এক-আধজন থেকেছে, আছে, থাকবে। তবে হ্যাঁ, তাদের খবর তো কেউ জানে না। তাদের একের খবর তো অন্যে জানে না। যাক্ এসব কথা।

না, না। যাবেই বা কেন এ সব কথা? নরেন্দ্র যদি সাধারণের অর্থাৎ দশের অন্যতম না হন, তবে তাঁর সব খবর দিতে বাদ থাকবে কেন? আমি কি সুধু নরেন্দ্রের প্রেস আর বই এবং খাওয়া আর শোওয়ার খবরই দেবো? তাই কি এতোক্ষণ দিয়ে আসছি পাঠকের গ্রন্থ অধ্যয়নকালে?

আজ যখন নরেন্দ্র দেখলেন বারান্দায় আন্না বংশীর দুহাতে মুখখানি ঢেকে বলছে, "বংশীদা, আনি নেই।"—তখন থেকে নরেন্দ্র বুঝেছেন বংশীর মধ্যে 'নেই' হ'তে আন্নার কী সাধ! সে বংশীকে ভালোবাসে। তাকে দেখে; তার কাছে থাকতে চায়। যখন দূরে থাকে তখন অনেকবারই তাকে মনে রাখে। বংশীকে সে আদর্শপুরুষ ব'লে মনে করে। নরেন্দ্র ভাবলেন, এমনি ক'রে আরো দুটি বছর যদি কৈশোরের শুচিতায় ওদের কেটে যায়, তবে আন্নাকালির ভালোবাসা কি কচের প্রতি দেবযানীর ভালোবাসা হ'য়ে উঠতে পারে না? তখন কী হবে?

ভাবনায় বাধা পড়লো। রজ্জবদের বাড়ি থেকে আন্নাকালি ফিরে এলো। তার অল্প জ্বর হ'য়েছে।

নরেন্দ্র চিন্তিত হ'লেন। জ্বর হ'য়েছে মাত্র; তাতে চিন্তা কেন? জ্বর কি আন্নার আর কখনো হয় নি? তা নয়; তবে ভালোবাসার, দুর্বল মানুষী ভালোবাসার এই তো মুশ্কিলী ধরণ।

শ্রীরামপুরে এসে থেকেই আনির শয্যা আলাদা, আলাদা-র যুক্তি

নরেন্দ্রের আঁটাই ছিলো মনে মনে। মশারির মধ্যে ব'সে তাঁকে লিখতে হয় যে। আলো জ্বলে। অবশ্য এ-বাড়িতে বিজলী বাতি। নরেন্দ্র একটি টেবিলল্যাম্প্ মশারির মধ্যে বসিয়ে রাত্রে লেখা-পড়ার কাজ করেন। আজ কিন্তু আন্নাকালি বাবার কাছে শোবেই। আবদার ধরেছে। বাবার-ও সেই ইচ্ছা। আন্না সমর্থন পেয়ে খুব খুশি।

জ্বর সামান্যই। রাত্রে বাপের গলা জড়িয়ে শুয়ে আনি এক সময় বললো, "বাবা, রুজ্জব কাকার মেয়ের বর তো দেখেছো? দেখতে ভালো নয় তেমন। খুব খারাপ নয়। কেমন যেনো রোগা-রোগা।"

"তোর বুঝি মোটা বর চাই?"

"ধেৎ, আমি বিয়ে করবো না।"

"খুব ভালো দেখতে যদি হয়?"

"না।"

"আমি যদি তোর বিয়ে দিই, মনের মতো বর দেবো।"

"কে মনের মতো বর?"

"তুই যাকে মনের মতো মনে করবি।"

"অঃ।"

"কেমন?"

"হ্যাঁ।"

"তার কতো বয়স হবে?"

"আমার চেয়ে একটু বড়ো। হাস্নাদিদির বর অনেক বড়ো ওর চেয়ে। ভালো নয়।"

"তোর সঙ্গে যার বিয়ে হবে তার বয়স তোর চেয়ে তিন-চার বছরের বেশি হবে।"

"আচ্ছা। না আমি বিয়ে করবো না।"

"তাই ভালো।"

"বাবা, বংশীদা বলে বিয়ে করবে না।"

"তুই বুঝি জিজ্ঞাসা করেছিলি?"

"হ্যাঁ, আজ।"

"কখন রে?"

"সেই যে বারান্দায়। যখন তোমরা আমাদের দিকে চেয়ে দেখলে? সেই যে আমি বংশীদার হাতে মুখ ঢেকেছিলুম?"

"তখন?"

"হ্যাঁ গো।"

নরেন্দ্র চুপ করলেন। আন্না-ও। কখন আন্না ঘুমিয়ে পড়লো নরেন্দ্র বোঝেন নি। ঘুমন্ত এক সময় বিড়্ বিড়্ ক'রে বকতে থাকলো। কথাটা উদ্ধার করলেন নরেন্দ্র। আন্নাকালি বলছে, "বংশীদা, আমি-ও বিয়ে করবো না।"

সকালে ঘুম ভাঙতেই নরেন্দ্র মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে বুঝলেন জ্বর নেই। বাৎসল্যের এই ভীরুতা, সামান্য কারণে চিন্তিত হওয়ার ভীরুতা নরেন্দ্রকে কুণ্ঠিত করলো।

সকালে ঘুম ভেঙে আন্নাকালি ভাবতে থাকলো, কবে বংশী তার পরীক্ষার সুখবর আনবে। আজ রবিবার। আজ বংশীদা আসবে নিশ্চয়ই।

হ'লো-ও তাই। বিকালে বংশী এলো। নরেন্দ্র তখন বিবেকানন্দের 'Lectures from Colombo to Almora' পড়ছেন। অনেকবারই পড়েছেন। আবার পড়ছেন। বংশী এসেই নরেন্দ্রকে বললো, "ভালো খবর বেরিয়েছে মাস্টার মশাই। বৃত্তি পেয়েছি; বাবা পাকা খবর এনেছেন। পরে বৃত্তিধারীদের নাম বেরুবে।" পাশ থেকে শুনে ফেলে আনি হাততালি দিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে তাঁর বুকে মুখ রাখলো। গরম নিঃশ্বাস বইছে তার। ইশারায় নরেন্দ্র বংশীকে পাশে বসতে বললেন। তার মাথাটি বুকে ঠেকালেন। আন্না অনুভব করলো। সে মুখ ফিরিয়ে বংশীর দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেললো।

মাঝখানটায় ইস্কুলের কাজে জীবনকৃষ্ণ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিলেন। পুনরায় গা-ফিলতি তাঁকে পেয়ে বসলো। মানুষটা প্রকৃতিতে খুব বেশি তামসিক। একটা অনড় স্থূল পদার্থকে অর্থাৎ তাঁর দেহকে, কিছুটা-সচল বুদ্ধি খানিকটা নাড়াচাড়া দিয়ে চালু রাখে মাত্র।

নিজের পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। পড়াবার সময় যখন-যখন ব্ল্যাক্‌বোর্ড ব্যবহার করা দরকার, তখন-ও চেয়ার ছেড়ে উঠে সেটুকু কর্মঠতায় দেহকে সজাগ করতে পারছেন না। শিক্ষাতত্ত্বে বিশারদ হওয়ার ফলে ব্ল্যাক্‌ বোর্ডের সাহায্য যে শিক্ষাদানের অর্থাৎ পাঠদানের কতোখানি আনুকূল্য করে সে-খবর জীবনকৃষ্ণের অজানা নয়। তবুও আলস্যকে পরিহার করার কৌশল তো আর শিক্ষাপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক কলকাঠিতে নেই। কাজেই জীবনবাবুর আলস্য ইস্কুলের ক্ষতি করতে থাকলো।

দপ্তরের কাজে, হিসাব-নিকাশে এবং ইস্কুলের শিক্ষক-প্রধান হওয়ার জন্য যতোকিছু হাঙ্গামা—সর্ববিষয়েই তাঁর জাড্যভারাবনত মন কর্মবিমুখ হ'য়ে উঠলো উত্তরোত্তর। সম্পাদক সুধীরবাবু বুঝতে পারলেন। তাছাড়া কর্মচারী তাঁকে জানালেন-ও। কেননা, কর্মচারীকেই সমস্ত সামলাতে হচ্ছিলো। সুধীরবাবু সভাপতিকে সব জানালেন।

এদিকে পারিবারিক অস্বস্তি জীবনবাবুকে ছেড়ে কথা কইলো না। পেটের ছেলেটি নষ্ট হওয়ার পর থেকেই তাঁর স্ত্রী কণিকার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিলো না। বুঝি-বা একটা নাড়ির রোগই পাকিয়ে বসবে সে। জীবনকৃষ্ণ অতোশতো বোঝেন না। অতোখানি মনোযোগ দেবার মতো সাবধান মন নয় তাঁর। আবার কণিকা-ও নিজের দেহের সম্পর্কে বেশি বলতে ভালোবাসে না।

কিছুদিন যাবৎ ঠিকা-'ঝি'র কাজের মাত্রা বাড়াতে হয়েছে জীবনকৃষ্ণকে; মাইনে বেশি দিয়ে। কণিকা সামান্য পরিশ্রমে বড়োই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে। একটা সুবিধা হ'লো এই যে, পুষ্পকণা দীর্ঘ একটি ছুটি নিলো ইস্কুল থেকে। আর সে-ছুটি সে ভগিনী আর ভগিনীপতির পারিবারিক স্বস্তি-

বৃদ্ধিতে নিয়োগ করলো। অনলস কর্মব্যস্ততায় সে তাদের সংসার গোছাতে মন দিলো।

সাতদিন কেটে গেলো কণিকার সংসারে। রাঁধাবাড়ার ভারি কাজগুলি পুষ্পই করে, সাহায্য করে কণিকা। বেশি পরিমাণে সাহায্য করতে চাইলে দিদি বোনকে তিরস্কার করে। কণিকা চুপ ক'রে যায়। পুষ্পকণার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতাবোধ তাকে কুণ্ঠিত করে।

দিদি রান্না করে, ঘরদুয়ার পরিষ্কার রাখে, সাবান-কাচার হাঙ্গামা করে। যতোই সাহায্য করুক দাসীটা, ঝঞ্ঝাট তো পুষ্পকেই সইতে হয়? এই সব কর্মব্যস্ততায় পুষ্পের যেনো একটি সহজ স্বীকৃতি আছে, যেনো একটি মৃদুশীলা সুখ-সম্প্রীতি আছে। সেইখানেই কণিকার কুণ্ঠার কারণ। সেইখানেই কণিকার শঙ্কার বীজ; অস্বস্তির ভ্রূণ।

পুষ্প তো বেশ গুছিয়ে গৃহস্থালি করে। মা-দিদিমার মতোই সাগ্রহে কাজকর্ম চালিয়ে যায়। নাটকে-নভেলে যে-সব আধুনিকতার এতো বাড়াবাড়ি, পুষ্পকণাকে দেখে তো মনে হয় লেখকরা মিথ্যাবাদী। রবীন্দ্রনাথ সিসি-লিসি চরিত্র 'শেষের কবিতা'য় লিখলেন। কিন্তু তাঁর লাবণ্য-ও তো রীতিমতো আধুনিকা। প্রবীণতম বয়সে রবীন্দ্রনাথের লিখিত আধুনিকারা তো বেশ সহজ মেয়ে। অবশ্য, পুষ্পকণা রবীন্দ্রনাথের লাবণ্য-এলা-সরলা-ঊর্মিমালা-বাঁশরী গোষ্ঠীর বাইরে। পুষ্পকণা অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত এমন কি নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। এম. এ. পাশ ক'রে হঠাৎ এলা বা বাঁশরী হবে কি ক'রে?

পুষ্পকণা সাধারণ মেয়ে। অথচ সে বিয়ে করলো না কেন? কাকে-ও কি পছন্দ হ'লো না তার? ঘরের মধ্যে যে-সব অনাত্মীয় পুরুষ পারিবারিক নানাসূত্রে আসে-যায়, তাদের মধ্যে কেউ-ই কি তার মন টানলো না? কলেজে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে কোনো বয়সে-বড়ো বিদ্যার্থী? কোনো তরুণ বয়সের অধ্যাপক? জীবনকৃষ্ণকে সে সংগ্রহ ক'রে আনলো, তুলে দিলো বাপ-মার হাতে কণিকার সম্পত্তি করবার জন্য। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ তো কণিকার চেয়ে বয়সে বেশ বড়ো। পুষ্পের সঙ্গেই তো তার মানাতো বেশ।

ছিঃ, এসব কথা কণিকার ভাবতে নেই। দিদি তো কিছুমাত্র বাষ্প

ধূমায়িত করেনি এ-সংশয়ের? না, না; সংশয় নয়। বিনা সন্দেহে মনে এলো তার এ-চিন্তা। কেবল-যা, এক এক সময় দিদি কেমন যেনো চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে ভগিনীপতির দিকে চেয়ে থাকে। আর ইস্কুলসংক্রান্ত কাজে-কর্মে উভয়ের সহকর্মিতার অবসরে উভয়ের দেহ-নৈকট্য কেমন যেনো বড়ো বেশি কাছাকাছি মনে হয়। এক-একবার অতি সহজেই দিদি তার ভগিনীপতিকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকে। বলে, "শুনছো জামাইবাবু, ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসের ভিজিট্‌বুকের রিমার্কের জবাব যা দেওয়া গেছে, আমাদের সম্পাদক তাতে খুশি। হয়তো বা আমার মাইনেই বেড়ে যাবে।"

পুষ্পকণার ইস্কুলের সম্পাদক বয়সে জীবনকৃষ্ণের সমানই। সরকারী অর্থবিভাগে বড়ো কাজ করেন। সাধারণ বি. এস-সি ব'লে কর্তৃস্থানীয় হ'তে পারছেন না। তবে উপরের মানুষটির অবসর নেবার সময় এগিয়ে এসেছে ব'লে ভদ্রলোক নিজের উন্নতির আশা করেন।

সম্পাদক ফণিভূষণ ধর মহাশয় পুষ্পকণাকে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। সময়-সময় তাঁর আনুকূল্যের সংবাদে জীবনকৃষ্ণ ঠাট্টা-ও করেছেন। ঠাট্টার সময় কণিকা উপস্থিত থেকেছে যখন, তখন তার মুখ থেকে একথা-ও বেরিয়েছে, "ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন, মেয়েছেলে দুটি, না হ'লে দিদির ভীষ্মপণ ভাঙতো।"

"আমার ভীষ্মপণ হবে কেন?"

"তবে কোনো পুরুষকেই মনে ধরছে না কেন? এখন তো আর আমার জন্যে দায়িত্ব নেই?"

"তোর জন্যে আমার দায় পড়েছিলো আর কি?"

"তবে?"

"জামাইবাবু তোর জন্যে যে হেদিয়ে যাচ্ছিলেন। যে-টুকু সম্ভাবনা আমার মনে ছিলো, সেটুকু তুই-ই তো নষ্ট করলি।"

"বলো কি গো? তবে তো চিরটাকালই তোমার গরম নিঃশ্বেস পড়বে আমার গায়ে? তুমি বাপু একটা বিয়ে করো। না হ'লে আমার ভাবনা যাবে না।"

এই কথাটি ব'লেই উঠে চ'লে গিয়েছিলো কণিকা। কিছুক্ষণ জীবন

; পুষ্প কারো মুখে কোনো কথা এলো না। শেষে জীবনকৃষ্ণ বললো, চাল-টা তোমার ফস্‌কে গেলো।"

"যে আজ্ঞে।"

"আমার উপর রাগ করলে কি হবে?"

"রাগ মানে অনুরাগ।"

"আছে নাকি?"

"বুঝতে পারো না নাকি?"

"রামোঃ।"

এই পর্যন্ত কথোপকথন চললো। তখন এসে পড়লো কণিকা। বললো, ১ শুয়ে পড়ছে, শরীর খারাপ লাগছে। পুষ্প তখন তার কাছে গিয়ে বসতে াইলো। কণিকা নিষেধ করলো। বললো, "কিছু দরকার নেই, দিদি। ও মার অমন হয়। তাছাড়া জ্বরজ্বারি তো নয় যে মাথায় হাত বুলিয়ে দবে?" পুষ্প বললো, "জামাইবাবু, এই ছুটির মধ্যেই শীঘ্র কণাকে চিত্তরঞ্জন সিপাতালে দেখিয়ে আনো। ওর নাড়ির গন্ডগোল হ'য়েছে।" কথাটা শুনে ণিকা আর উত্তর করলো না। চ'লে গেলো।

এ-বাসায় দুখানা ঘর। একখানায় কণিকা-জীবন শয়ন করে; ন্যখানায় জীবনকৃষ্ণ পড়াশুনা করেন। এই পাঠকক্ষেই পুষ্পকণার য্যার ব্যবস্থা। দিনের বেলায় এখানে বৈঠকখানা, রাত্রিতে পুষ্পকণার য়ন।

তখন রাত্রি একটা। ওঘরে জীবনকৃষ্ণ ও কণিকা খুবই ঘুমুচ্ছে। ঘরে পুষ্পকণা অনেকক্ষণ নিদ্রার চেষ্টা ক'রে-ও সফল হয় নি। তার মন লছে কণিকা এখন সাবালিকা। সে অনেক তলিয়ে বুঝতে পারছে জীবনের লিগলি। স্পষ্ট কিছুই অভিযোগ সে করে না, স্পষ্ট কোনো অভিযোগের রণ-ও তার কাজে-কর্মে আনা যায় না। তবু-ও এতোখানি ক'রে ওদের ংসারে লিপ্ত থাকাই তো অপরাধ। যতোদিন কণিকাকে জীবনকৃষ্ণ বিবাহ া করেছে, ততোদিন জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে মেলামেশা অভিযোগের নয়; কিন্তু খন? অভিযোগের কিছু না-ই থাক্, এতোখানি মনোযোগই বা কেন পুষ্পকণার ওদের গার্হস্থ্যে? জীবনকৃষ্ণ আয় করেন যতোটুকু তাতে দাসী

রেখে সহজেই তাদের চ'লে যায়। খবরদারিই যদি করতে হয়, বাবা-মা রয়েছেন তো। তবে?

পুষ্পকণা অভিভাবিকা। কণিকার, জীবনের, মায়ের, বাপের। মা-বাপের সংসারে এবং কণিকার সংসারে তার যে সহজ আধিপত্য আছে তাতে পুষ্পকণা বেশ মজে'-রসে' আছে। তার স্বাদটি ছাড়তে বাধে। এই অধিকারের বোধটি যে অনেক ক্ষেত্রেই কামনার ছদ্মবেশ হ'তে পারে সে-মনস্তত্ত্ব কণিকাকে শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ. পড়বার সময় পড়তে হয় নি।

ঘুম তার কিছুতেই আসছিলো না। এক সময় দেখে এলো ওদের জানলায় চোখ পেতে। কণিকা ঘুমুচ্ছে, জীবন-ও। ঘরে এসে বিছানায় বসলো পুষ্প। মনে মনে স্থির করলো শীঘ্রই সে চ'লে যাবে। জামাইবাবুকে বিশেষ ক'রে ব'লে যাবে কণিকাকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে দেখাবার জন্য

ঢং ক'রে দূরে থানায় ঘণ্টা পড়লো। অনুকূল বাতাসে শব্দ ভেসে এলো। এক সময় পুষ্প আর ব'সে থাকলো না। জোর ক'রে দেহকে শায়িত করলো বিছানায়। পাশ ফিরলো।

আকাশ-পাতাল কী ভেবেছিলো কে জানে। হুঁস হ'লো যখন, তখন অবাক। জীবনকৃষ্ণ তার বিছানায়। পাশে ব'সে তার গায়ে হাত রাখছে।

"এখানে? এমন সময়? এমন ভাবে?"

"কণির ঘুম ভাঙবে না। অঘোরে ঘুমুচ্ছে।"

"তা, এখানে কেন?"

"কি জানি?"

"চলো, বাইরে বসবো।"

"চলো।"

দুজনে মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে বসলো। তারপর চাপা গলায় কথা বেশি কথা নয়; চুপ থাকাই বেশি। এক সময় জীবন পুষ্পকণার কণ্ঠ বাহু দ্বারা অলস বেষ্টনে নিলো। বললো, "তোমাকে বিয়ে না ক'রে ভুল করেছি।"

"যে আজ্ঞে।"

"কি করা যায় বলো? তুমিই যে উঠে-প'ড়ে লাগলে। কেন এম

করলে বলো তো?"

"তোমার মতো নির্বীর্য পুরুষকে আমার পছন্দ নয়।"

"বলো কি? আমি—"

"হ্যাঁ, তুমি তা-ই।"

জীবন ক্রুদ্ধ হ'লো। নীরব ক্রোধ। কিছুক্ষণ চুপ থেকেই ওর গলা থকে হাত নামিয়ে নিলো। উঠে গেলো সেখান থেকে। কিছু পরে-ও আর এলো না। তখন পুষ্প গিয়ে পিছন থেকে ওর কাঁধে হাত রাখলো' জীবন মুখ ফেরালো। পুষ্পকে রূঢ় দৃষ্টিতে দেখলো। হঠাৎ শক্ত দুটো মু খেলো ওর মুখে।

আকস্মিক একটা অবশতা পুষ্পকে পেয়ে বসলো। অত্যন্ত অসহায় বোধ করলো সে। যখন জীবনকৃষ্ণ তাকে শক্ত আলিঙ্গনে বেঁধেছে তখন যে কণিকা কিছুটা দূরে থেকে ওদের দেখেই আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো, পুষ্প বা জীবন তা জানলো না। বিছানায় স্বামীকে না দেখতে পেয়ে কণিকা এ-ঘরের দিকে আসছিলো। কিছুদূর থেকেই ওদের সে দেখলো। জীবন-কৃষ্ণের শক্ত আলিঙ্গন থেকে নিজেকে যখন পুষ্পকণা মুক্ত ক'রে নিলো তখন তার সর্বদেহে একটা বিজাতীয় আক্রোশ।

জীবন ঘরে চ'লে গেলো। পুষ্পকণা শুয়ে পড়লো। ফুলে-ফুলে কাঁদলো। নিজেকে শতবার ধিক্কার দিলো। পরিচিত ভালো-লাগা অনেকের অর্থাৎ অনেক পুরুষের মুখ মনে আনলো। না, কাকে-ও তার বিয়ে করতে মন চায় না। জীবনকৃষ্ণকে তার পছন্দ নয়। মন চায় না। কিন্তু দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতায়, অভিভাবকত্বের দীর্ঘ অধিকারে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এ-বন্ধন স্বস্তির নয়। একে ছাড়তে হবে।

পুষ্পকণা স্থির করলো সে পরশুই চ'লে যাবে এখান থেকে। কিন্তু কালেই কণিকা তাকে বললো, "আর নয়। তুমি আজই চ'লে যাও।"

"মানে?"

"মানে, মনে-মনে বুঝে দেখো। কেন ঘাঁটাও?"

পুষ্পকণা ঘাঁটালো না। চ'লে গেলো দুপুরেই। কেউ কাকে কিছু কারণ বললো না। একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করলো না। কিন্তু জীবন

কণিকার মুখে চাইলো, কণিকা জীবনের মুখে চাইলো। কখন চাইলো? যখন পুষ্প রিক্সায় উঠে বাসস্ট্যান্ডের জন্য যাত্রা শুরু করলো।

বিকালে কণিকার খুব জ্বর হ'লো। জীবন বিশেষজ্ঞ দিয়ে চিকিৎসা করাবার কথা বলতেই কণিকা বললো, "কেন? দিদি হুকুম দিয়ে গেছে বুঝি?"

"তা কেন? আমার বিবেচনা নেই?"

"আছে বৈ কি।"

"মানে?"

"মানে আবার কী? বাজে-বাজে বকবে না আর। যাও।"

জীবনটা কি বোকা! ওটা শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ. নয়। দীর্ঘকাল নারীসংগ করলেও ওরা জীবনটাকে বুঝবে না: ন্যাকাবোকাই থেকে যাবে।

সময় হু-হু ক'রে চ'লে না গেলে-ও যা-হোক ক'রে কেটে যাচ্ছেই। জীবনকৃষ্ণ আবার আলস্য ঝেড়ে ফেলে ইস্কুলের কাজে লেগেছেন। কণিকা গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে! বাপ-মা এসে তাকে নিয়ে গেলেন। পুষ্পকণা দূরে-দূরে থেকে তদারক করতে লাগলো। মধ্যে মধ্যে ছুটি নিতে থাকলো বোনের চিকিৎসাদির জন্য। ওর ইস্কুল-পরিচালনায় অসুবিধা নেই তাতে। ফণীবাবু অনুকূল: সহকারী প্রধানা শিক্ষিকাটি ততো কাজের লোক না হ'লেই বা।

কমলা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাওয়া ঠিক ক'রে ফেললো। শ্রীঅরবিন্দ যখন জীবিত ছিলেন তখনো যেমন অনেকে তাঁর আশ্রমে তাঁকে দর্শন করতে যেতো, তেমনি আজকাল-ও তাঁর অবর্তমানে-ও অনেকেই সমানে যাচ্ছে-আসছে তাঁর আশ্রমে। দেশের বহুজনেই এই আশ্রম বা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে অনবহিত হ'লে-ও যে-কতিপয় দেশ-বিদেশের মানুষ তাঁর সম্বন্ধে জানে তাদের আগ্রহ গভীর ও আন্তরিক। কমলা আরো অনেকের মতো আশ্রমিকা হ'য়ে পণ্ডিচেরিতে বসবাস করতে যাবে না বটে, কিন্তু নরেন্দ্রের মনে খট্‌কা লেগেছে। কি জানি কমলা হয়তো আর ফিরবে না। অবশ্য কমলাকে সে-বিষয়ে তিনি কোনো উচ্চবাচ্যই করেন নি। পঞ্চাশোত্তীর্ণ অনূঢ় নরেন্দ্র যুবতী কমলার এই আধ্যাত্মিক আকূতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করলেন অন্তরে। কমলার এই আধ্যাত্মিক টানটুকু তাঁর মনকেও তন্মুখী করলো। ইদানীং তিনি শ্রীঅরবিন্দের Human Cycle নামক গ্রন্থখানি প'ড়ে ফেলেছেন। মনুষ্যগোষ্ঠী ও সমষ্টি তার অন্তর-সত্তায় কোন্ নিগূঢ় লক্ষ্যাভিযানে ধীরপদক্ষেপে ও ত্বরিত বিবর্তনে স'রে—স'রে চলেছে, সেই সমাজ-মনস্তত্ত্বের অন্তর্গূঢ় রহস্যটির উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দের গভীর-গম্ভীর লেখনীমুখে বিকীর্ণ হ'য়েছে। বইখানি প'ড়ে নরেন্দ্র ভিতরে ভিতরে মনের গহনে প্রবেশ ক'রে চলেছিলেন।

কমলার যেতে এখনো বিলম্ব আছে। নরেন্দ্রের বাসায় সে নিয়মিতই আসে। আন্নাকালির সঙ্গে তার ভগিনীত্ব ও সখিত্ব সমানেই চলেছে!

নরেন্দ্রের প্রতি তার শ্রদ্ধা সমানই রয়েছে। বংশী ও আন্নার সহজ স্নেহ কমলাকে সমানে মুগ্ধ ক'রে রেখেছে।

বংশীধর বৃত্তি পেলো। প্রেসিডেন্সি কলেজে যেতে বললেন তার বাবা। বংশী এক মিশনরী কলেজে গেলো। নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বংশীকে সমর্থনই করেছেন।

বংশী কবিতা লেখা শুরু করেছে কিছুদিন থেকে। নরেন্দ্র দেখলেন বয়ঃসন্ধিসুলভ কিশোর-চপল নয় তার কবিতা। আধুনিক 'চৌরাস্তা' আর 'অপ্রমিতা সেন' নামের বাস্তবী কবিতা নয় তার। প্রকৃতির রূপবর্ণনার মামুলী কবিতা-ও নয়। বেশ একটি অন্তর-গভীর ভাবাবেগে লেখা বংশীর কবিতাগুলি। কয়েকটি কবিতা গুণীজনের সম্মুখে ফেলা যায়। নরেন্দ্র তাঁর 'বর্তমান ভারত' পত্রিকায় দুটি কবিতা ছাপলেন।

আন্নাকালি ক্রমে ক্রমে প্রবেশিকার জন্য পাঠ্যক্রম শুরু করেছে। বাবা তাকে নিয়মিত পাঠ দিচ্ছেন। শৈশব ছেড়ে কৈশোরে পা দিয়ে-ও আন্নার পাঠাভ্যাসে শৈথিল্য এলো না। দেহের পরিবর্তনে তার মনের ক্রমোন্নতিকে ধাপে নামায় নি। আন্নাকালিকে কন্যারূপে পেয়ে নরেন্দ্র অহংকৃত।

আজ দু-সপ্তাহ যাবৎ বংশীর দেখা নেই। গতকাল এক পত্র এলো নরেন্দ্রের নামে। বংশীর পত্র। লিখেছে যে তার জ্বর হ'য়েছে। কিছুতেই জ্বর ছাড়ছে না। নরেন্দ্র যেনো চিন্তিত না হন। আন্নাকে যেনো ভাবতে মানা করেন।

বংশীদার রোগের খবর পেয়ে আন্না মুষড়ে গেলো। বাবা একদিন বংশীর বাড়ি গিয়ে তাকে দেখে এলেন। অসুখটা গোলমেলে। ডাক্তার সন্দেহ করছেন জ্বরটা বাঁকা পথ ধরতে পারে। নরেন্দ্র চিন্তিত হলেন। আন্নাকে এসে বললেন, "একাজ্বরী শুয়ে রয়েছে বংশী। সারতে একটু সময় নেবে।"

আন্নাকালি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, "আমার কথা বংশীদা কী বললো?" নরেন্দ্র বললেন, "তোকে ভাবতে বারণ করেছে।" আনি শুনে বললো, "বাবা, আমি একদিন দেখতে যাবো।" নরেন্দ্র বললেন, "এবার যেদিন যাবো, তোকে নিয়ে যাবো।"

"কবে?"

"সোমবার।"

"সে যে অনেক দেরি।"

"নারে পাগলি, আজ তো বুধবার।"

আন্না আর কথা কয় নি। কিন্তু সে যে আনমনা হ'য়েছে নরেন্দ্র তা দেখতে পাচ্ছেন। নরেন্দ্র চিন্তিত হ'লেন। দুটি কিশোর চিত্তের এই ব্যাকুল ও গভীর স্নেহ কোথায় গিয়ে পরিণত হবে কে জানে?

সন্ধ্যার পূর্বেই সেদিন নরেন্দ্র কলকাতা থেকে ফিরলেন। তাঁর পত্রিকা লোকগ্রাহ্য হ'য়েছে। জাতীয় বেদনার যে-সুর পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে নরেন্দ্র লিখেছেন, তাতে জাতির বর্তমান কর্ণধারদের মন সায় না দিলে-ও সাধারণ জন সাড়া দিয়েছে। দেশের বর্তমান দুর্দশায় নরেন্দ্র তীব্র ভাষায় সস্তার সমালোচনা করেন নি। অথচ সরকারী ইস্তাহারের আর ক্রিয়াকলাপ বিস্তারের সমর্থন-ও শতমুখে করেন নি। তিনি জাগ্রত নব্য ভারতের গুরু-স্থানীয় মনীষীদের চিন্তাকে আত্মসাৎ ক'রে বিকিরণ করেছেন তাঁর লেখায়। রামমোহনের কথা তুলেছেন। বিবেকানন্দের কথা ব'লেছেন। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমকে আলোচনা ক'রেছেন। তার ফলে জাতির জনসত্তার কোন্ এক নিভৃত গুহাতে সাড়া তুলেছেন। নরেন্দ্র সাধারণের সমর্থন পেয়েছেন।

সোমবার আন্নাকে নিয়ে বংশীকে দেখে এলেন। বংশীধর জ্বরমুক্তি পেয়েছে। ডাক্তার বলেছেন আর ভয় নেই। আন্নাকালির মিষ্টি মুখখানি মাধুর্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। ফেরার পথে সারাক্ষণ সে বাবাকে নানান্ প্রশ্নে ব্যস্ত করলো। নরেন্দ্র যথাসাধ্য উত্তর দিয়ে চললেন। এক সময় আন্না বললো, "বাবা, বংশীদা কবে ঝোল-ভাত খাবে?"

"তার এখনো দেরি আছে মা। তবে বেশি দেরি নেই। বোধহয় এক সপ্তাহ।"

"বাবা, বংশীদার পড়ায় ক্ষতি হবে কি?"

"ভালো ছেলে যারা, তারা ক্ষতি পুরিয়ে নিতে পারে।"

"বংশীদাকে বেশি খাটতে বারণ কোরো তুমি।"

"খাটে কোথায়?"

"বেশি রাত জেগে পড়ে হয় তো।"

"আমি জানি বংশী রাত্রে দেড় ঘণ্টার বেশি পড়ে না।"

"বাবা, বংশীদা ইণ্টারমিডিয়েটে-ও বৃত্তি পাবে তো?"

"আশা করি।"

"খুব ভালো হবে তা হ'লে।"

বাড়ি ফিরে এসে আজ সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লো আন্নাকালি। নরেন্দ্র এক সময় তার পড়ার টেবিলে খাতাপত্র নাড়াচাড়া ক'রে চমকিত হলেন একখানি খাতা দেখে। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে, "আনির খাতা।" নরেন্দ্র কুতূহলী চিত্তে পড়তে থাকলেন।

"আনির খাতা" ডায়েরি। বেশি পৃষ্ঠায় ভারাক্রান্ত নয়। মাত্র এগারোখানি পাতা পার হ'য়ে বারোর পাতায় অসমাপ্ত। দু-পাতা, তিনপাতা--এইরূপে অধ্যায় ভাগকরা তার লেখা। তৃতীয় স্তবকে লেখা আছে, "বংশীদা কেন অসুখে পড়বে? বংশীদার শরীর যেনো খারাপ না হয়। মা কালী যেনো তাকে সর্বদা সুস্থ রাখেন। বংশীদা-কে বড়ো হ'তে হবে। বংশীদা এম. এ. পাশ করবে। নাম করবে। অধ্যাপক হবে। আমি-ও কলেজে পড়বো। বি. এ. পাশ করবো। আর পড়বো না। বাবা বললে-ও নয়; বংশীদা বললে-ও নয়। বংশীদাকে ডিঙিয়ে গেলে ভালো লাগবে না। অবশ্য এম. এ. পাশ করলে-ও আমি তো বৃত্তি পাবো না। তবু-ও। আমি বি. এ. পর্যন্ত পড়বো। আর নয়।

বংশীদা সেদিন আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরলো। বললো, "আনি, তোমার মায়ের কথা মনে পড়ে কি?" আমি কষ্ট-ও পেলুম, আনন্দ-ও পেলুম। বংশীদা জানে আমি মুসলমানী। তবু-ও আমাকে কতো ভালোবাসে। বাবা যদি আমাকে মুসলমান ব'লে ঘেন্না করতো? কোথায় থাকতুম তাহ'লে? তাহ'লে কি বংশীদা'কে জীবনে দেখতে পেতুম? হিন্দু-মুসলমান এসব আমার মন মানে না। আমি বাবার মেয়ে। আর বংশীদা'কে ভালোবাসি। আমি একদিন বংশীদার কোলে মাথা রেখে খুব ঘুমুবো। যেদিন সকালে বংশীদা আসবে, দুপুরে আটকে রাখবো। খাওয়াবো। দুপুরে থাকবে

বংশীদা। ঘুমুবো সেদিন।......আর নয়, ঘুম আসছে। যাই, আজ বাবাকে বলি, বাবার কাছে শোবো।"

ডায়েরি পড়লেন নরেন্দ্র। খুব আনন্দ হ'লো। মশারির মধ্যে আন্নাকালি তখন গভীর নিদ্রিত। নরেন্দ্র তার কাছে বিছানায় গিয়ে বসলেন। তাকে দেখলেন। ধব ধবে ফর্সা রঙের দ্বাদশী কন্যা আন্না। রঙীন সাড়ি-খানি বাহুসংলগ্ন হ'য়ে জড়ো করা। মুখখানি মৃদু হাসিতে তৃতীয়ার ক্ষীণ শশীশোভায় কোমল-মধুর। এক সময় আন্নার কপালে চুমু খেলেন একটি, অতি সন্তর্পণে। আন্না চোখ মেললো। বললো, "বাবা?"

"হ্যাঁরে।"

"আনিকে ভালোবাসছো?"

"হ্যাঁ মা।"

"বাবা, তুমি আনিটাকে খুব ভালোবাসো?"

"বড্ড বেশি।"

"আনিটা দুষ্টু। তোমাকে বেশি ভালোবাসে না।"

"কে বললে?"

"বংশীদা একদিন বলেছিলো।"

"কেন বললে একথা?"

"সে বললে, তোমার বাবা খুব বড়ো মানুষ। তুমি যতোই ভালোবাসো, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। বাবা, বংশীদা তোমাকে ওর বাবা-মা'র চেয়ে-ও ভালোবাসে।"

"বলিস কিরে?"

"হ্যাঁ গো। সত্যি কথা।"

বংশী শীগ্‌গিরই সম্পূর্ণ সেরে উঠবে। তারপর তার শরীরের ওপর খুব যত্ন দিতে হবে।"

"তুমি ওকে সাবধানে থাকতে বোলো। বাবা, আজ তোমার কাছে গিয়ে শোবো।"

"এসো।"

পিতাপুত্রী অঘোরে নিদ্রিত। বংশীধর তার বাড়িতে অঘোরে নিদ্রিত।

বিধাতার লিখন নরেন্দ্র পড়তে পারছেন না। কেই বা পারে। মুসলমানী আমিনা হিন্দুব্রাহ্মণ নরেন্দ্রের পালিতা কন্যা। পরকীয়া প্রেম বৈষ্ণব সাহিত্যে অমর হ'য়ে আছে। পরের মেয়েকে আত্মজার বাৎসল্যদান নরেন্দ্রনাথের জীবনে অক্ষয় রেখাপাতে উজ্জ্বল হ'য়ে রইলো।

এক সময় বংশীকে স্বপ্ন দেখে নরেন্দ্রনাথ জেগে উঠলেন। দেখলেন পাশে শুয়ে মেয়ে ঘুমুচ্ছে। বেশবাস শিথিল। এই নিষ্পাপ কুমারীটিকে কেমন ক'রে শুচিতার সোপানে সোপানে উত্তীর্ণ ক'রে যৌবনের মন্দিরে নির্বিঘ্নে পেঁছে দেবেন, নরেন্দ্র তাই ভাবতে লাগলেন।

[১৭]

নরেন্দ্র পরে শ‍ুনলেন যে, কমলার সেই ব্রিলিয়্যাণ্ট্ অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বরাবরের জন্য চ'লে গেছেন। কমলা-ও যাবে আশ্রম-দর্শনে। অধ্যাপক একেবারেই চ'লে গেছেন, আর সংসারে ফিরবেন না। সংসার বলতে মা ও ভাইরা। বিবাহ তিনি করেন নি। অবশ্য অনেক বিবাহিত প‍ুর‍ুষ এবং বহ‍ু বিবাহিতা রমণী-ও সংসার ফেলে পণ্ডিচেরিতে চ'লে গেছেন ব'লে কমলা শ‍ুনেছে। স্বামী ও স্ত্রী এক সঙ্গে গেছেন এমন কথা-ও শ‍ুনেছে সে।

সেদিনটি রবিবার। বৃন্দাবন ভেবেছিলেন কন্যা কমলা সকালেই চা পান শেষ ক'রে শ্রীরামপ‍ুরে নরেন্দ্রের কাছে চ'লে যাবে। যখন দেখলেন আটটা বেজে গেলো অথচ কমলা একমনে বই প'ড়ে যাচ্ছে ব'সে ব'সে, তখন কুত‍ূহলী হ'য়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"কমলা, আজ শ্রীরামপ‍ুর যাবি না?"

"না বাবা; বইখানা আজই শেষ করবো। খ‍ুব ভালো লাগছে।"

"কী বই রে?"

"শ্রীঅরবিন্দের Renaissance in India"

"আশ্রমে যেতে এখনো দেরি আছে, না রে?"

"আছে। আমি সাত তারিখে রওনা হ'তে চাই।"

"ওদিনে সহযাত্রী পাবি তো?"

"পাবো। তিনজন যাবেন ঐদিনে। একটি মহিলা আছেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী যাচ্ছেন। তৃতীয়জনটি তাঁর দেওর।"

"এসব খবর নিয়েছিস ব‍ুঝি কলকাতায় গিয়ে?"

"হ্যাঁ। আমি এখানে-ও খবর নিয়েছি, তাছাড়া আশ্রম থেকে অধ্যাপক অর্ধেন্দ‍ুবাব‍ুকে-ও চিঠি লিখে উত্তরে জেনেছি। তিনি আমার থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

"কতোদিন থাকবি?"

"ইস্কুলে একমাসের ছ‍ুটি নিচ্ছি।"

এর পর বৃন্দাবন চ'লে গেলেন। বিপত্নীক বৃন্দাবন ভাবলেন কমলার মা থাকলে বোধহয় মেয়েকে বাধা পেতে হোতো। বৃন্দাবন বাধা দিতে পারেন না। তবে ভয় হয় যদিবা কমলা আর না ফেরে। আবার ভাবেন, না তা হবে না। খবরের কাগজখানা পড়তে পড়তে মনটা খবরের লাইনগুলোর ফাঁকে সাত-পাঁচ ভাবতে থাকে। ওদিকে কমলা বই পড়তে পড়তে বেলা ন'টা-ও পার হ'য়ে যায়।

একটা অধ্যায় শেষ ক'রে কমলা ভাবলো বাবাকে এক পেয়ালা চা ক'রে দেবে। রবিবার বা বিশেষ কারণে বাড়িতে থাকেন যেদিন, সেদিন বৃন্দাবন ন'টা নাগাৎ দ্বিতীয় দফায় চা পান করেন। কমলা-ও বাদ যায় না। কাজেই পড়া শেষ ক'রে কমলা চা-য়ে মনোনিবেশ করলো। চা করতে করতে ভাবতে থাকলো বইখানির সেই স্থানটা, যেখানে শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় নব্য চিত্রকলাকে ভারত-আত্মার অমোঘ প্রকাশ বলেছেন। বাঙলা সাহিত্যের মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মর্মকথাগুলি শ্রীঅরবিন্দ যে-ভাবে ও যে-রূপে ব'লেছেন, দেশের ক'জন তার খবর রাখে? দেশটা ঊনবিংশ শতকে মহামনীষীর ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিলো। বিংশ শতকের প্রায় পনেরোটা বৎসর জাতীয়তার অভিনব অভিযানে অপূর্ব এক চিত্তচমৎকারী জাগরণ সম্ভব ক'রেছিলো। তারপর যতোই অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘ'টে থাকুক, জাতীয়তায় গভীরতা কমছে। হয়তো গভীরতা আর ব্যাপ্তি এমনি ক'রেই এ-তাল ও-তাল ক'রে ছন্দ বজায় রাখে।

যখন বেলা দশটা, বৃন্দাবন যখন তাঁর দুজন বন্ধুর সঙ্গে রাষ্ট্র-নীতি আলোচনা করছেন, তখন বংশীধর হঠাৎ কমলার বাড়ি এলো। বংশী এর পূর্বে একবার মাত্র এখানে এসেছিলো। শ্রীরামপুরে কমলার সঙ্গে অনেকবার দেখা হওয়ার পর বংশী কমলাকে ভালোবাসাতে আরম্ভ করেছে।

বংশীর শরীরটা অনেকটা সেরেছে। শীর্ণতা রয়েছে বটে দেহে, তবে স্বাস্থ্য যে ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে, তা সুস্পষ্ট। কমলাকে বংশীধর বললো, "কমলাদি, আজ শ্রীরামপুর যান নি? আমি ভেবেছিলুম হয়তো দেখা পাবো না।"

"আজ আর যাইনি ভাই। কাল ইস্কুলে যাওয়ার আগে ওঁদের বাড়ি হ'য়ে গিয়েছিলুম।"

"আনি ভালো আছে? মাস্টার মশাই?"

"আনি, মাস্টার মশাই দুজনেই ভালো আছে। আনি তোমাকে দেখবার জন্য ছটফটাচ্ছে।"

"আপনি বলবেন, পারলেই যাবো।"

"না, না; এখন নয়। আমি তাকে খবর দেবো তোমার। এই রোগা শরীর নিয়ে তোমাকে যেতে হবে না।"

"আপনি কবে মাদ্রাজ যাচ্ছেন?"

"মাদ্রাজ ঠিক নয়, পণ্ডিচেরি যাচ্ছি। এখনো দিন-দশেক দেরি রয়েছে।"

"বেশ, বেড়িয়ে আসুন। ফিরে এলে গল্প শুনবো।"

ব'সে ব'সে বংশী কমলার সঙ্গে অনেক কথাই বললো। কলেজ যেতে তার এখনো দেরি। পড়াশুনা বিশেষ করছে না। মাস্টার মশাই এখন এই দুর্বল শরীরে মাথা ঘামাতে বারণ করেছেন।

এক সময় কমলা বললো, "বংশী, নরেন্দ্রবাবু যে আনিকে মানুষ করছেন এতে তোমার কী মনে হয়?"

"কেন কমলাদি? ভালোই মনে হয়। খুব ভালো লাগে তাতে। কেন বলছেন একথা?"

"আনি তো আসলে আন্নাকালি নয়? ও তো আমিনা।"

"মাস্টার মশাই ওকে মুসলমানী জেনেই বুকে তুলে নিয়েছেন।"

"মাস্টার মশাই-এর বুক দশ হাত চওড়া। ছোটো মনের কোনো পরিচয় তাঁর মধ্যে নেই।"

"আপনি তাঁকে ভালোবাসেন। আমি-ও খুব ভালোবাসি।"

"আনিকে তুমি কি-রকম ভালোবাসো? সে তো তোমার কথায় শতমুখ।"

"আমি পড়াশুনায় ভালো ব'লে তার খুব গর্ব।"

"কেন বলো তো?"

"আনি সত্যিই আমাকে ভালোবাসে। আমার ছোটো বোন মুকুল-ও

আমাকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু আনির ভালোবাসা আলাদা। খুব বেশি। ওর কথা ভাবলে আমার এক এক সময় কষ্ট লাগে।"

"কেন? কষ্ঠ কেন? কিসের কষ্ট? আনি তো বেশ আদরে আছে।"

"তা নয়। ওর মা-কে আর ভাইকে যেভাবে মেরে ফেলা হ'য়েছে, সে কি আম্মা ভুলেছে?"

"মুসলমানেরা ওর চেয়ে ঢের বেশি অত্যাচার করেছে।"

"জানি। ঢের ঢের বেশি। সেকথা বলছি না। দেশের কথা ভাবছি না। আম্মার কথা ভাবছি। আমি আম্মাকে আপনার ক'রে নিজের ব'লে ভাবতে চাই।"

"ভাবতে পারো না?"

"পারি। তাই কষ্ট পাই। আসলে আনি তো মুসলমান সমাজের?"

"কি জানি? ভবিষ্যতে ও কোন্ সমাজে বিয়ে করবে?"

"আনি বলেছে বিয়ে করবে না।"

"তুমি-ও তো করবে না?"

"না। কিন্তু একথা কে বললে আপনাকে?"

"মাস্টার মশাই বলেছেন। আনি তাঁকে বলেছে।"

এর পর কমলা দ্বিধায় পড়লো। আনির ডায়েরির কথা সে জানে। নরেন্দ্র তাকে বলেছেন। এমন কি, দেখিয়েছেন-ও। দ্বিধা সরিয়ে কমলা ব'লেই ফেললো। সকল কথা শুনে বংশীর চোখ ছল্ ছল্ করলো। আশ্চর্য অনুরাগ। তবে যে কাম-জীবন সম্পর্কে পুঁথিপত্রে লেখে, বয়ঃসন্ধিতে বা প্রারম্ভিক যৌবনে ছেলেরা নানান্ স্থলে ইন্দ্রিয়বিকারে পীড়িত হয়। তখন সূক্ষ্ম অনুরাগাদি তাদের স্নায়ুতন্ত্রীতে সুর তোলে না। তবে কি বংশীধর ব্যতিক্রম? অসাধারণ? হ'তে পারে। তাছাড়া নরেন্দ্র তাঁর প্রভাবে ও শিক্ষায় বংশীকে পালিত করেছেন।

কমলা আজ যুবতী। প্রথম যৌবনের কথা তার কিছু কিছু মনে পড়ে বৈ কি। কলেজের কয়েকজন মেয়ে খুবই কুৎসিত আলোচনা করতো অবসর সময়ে। মাতৃত্ব নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা, রমণীত্ব নিয়ে বিশ্রী ইয়ার্কি। একবার দুদিন কলেজ কামাই হওয়ায় তার সহপাঠিনী অনুভা অনুপস্থিতির কারণ

জানতে চাইলো। কমলা যখন বললো, "বিশেষ কিছু হয় নি। এমনি একটু শরীর খারাপ।"—তখন অনুভা ব্যাপার অনুমান ক'রে যা-তা বললো। বিশ্রী ইয়ার্কি। কমলা সুস্থ শরীরের মেয়ে। দেহঘটিত, রমণী-দেহঘটিত অস্বাস্থ্য তার নয়। তবে দু-একবার কিছু পীড়িত-ভাব অনেককেই ভোগ করতে হয়। কমলা ভাবে দেহ, দেহ। তার নানা ধর্ম আছে। সেগুলি তো আকস্মিক নয়। চিরাচরিত এই দেহধর্ম নিয়ে এতো হাসাহাসি, এতো টেপাটেপি, এতো টিপ্পনী-মস্করা যেনো তার মার্জিত চিত্তকে বিরক্ত করে। কমলা ভাবে তার মন যেমন সহজে দেহকে স্বীকার করেছিলো, বংশীধর-ও বোধহয় তাই। ছেলেটিকে তার সমজাতীয়, সমগোত্রীয় মনে হয়।

কেবল বোঝা যায় না নরেন্দ্রকে। খুব ভালো লোক, মহৎ মানুষ, উদার পুরুষ হ'লে-ও। মানুষটি ছলনার ধার দিয়ে যান না, অথচ পঞ্চাশোত্তীর্ণ এই প্রৌঢ়ের জীবনের একটি গহন আছে তো? কমলার মনে এক-আধবার একথা আসে। বেশিবার নয়। কারণ, গহনতার, জৈব জীবনের জটিল গহনতার ব্যাপারে কমলার মন নেই। অনেক মেয়ে, অনেক পুরুষ জীবনের অন্ধকার রাজ্যে মননশীল। কমলার মন ঐ অনাবিষ্কৃত চিত্তক্ষেত্রটিকে অনায়াসে পাশে রেখে চলতে পারছে।

বংশী যখন উঠলো, কমলা বললো, "বংশী, তোমাকে সেখান থেকে চিঠি লিখবো।"

"আনিকে লিখবেন না?"

"তোমার চিঠির মধ্যে লিখবো।"

"কার ঠিকানায় দেবেন?"

"বলো।"

"আনির ঠিকানায় দেবেন। মাস্টার মশাইকে-ও তো লিখবেন? খামের উপরে আনির নাম লিখে আমার নাম লিখবেন। মাস্টার মশাই-এর আভভাবকত্বে।"

"বেশ ঘোরালো ব্যাপার তো?"

"ঘোরালো কিচ্ছু নয়। আনি খুশি হবে এতে। খুব খুশি হবে।"

"তাকে খুশি করতে চাও?"

"চাই।"

"তবে তাই করবো। বাড়ি যাবে এবার? আচ্ছা। শরীরকে যত্নে রেখো। পড়াশুনা এখন কোরো না।"

"না।"

বংশী চ'লে গেলো। কমলা বাপের কাছে গেলো একবার। পরিচর্যার কোনো কারণ যদি ঘ'টে থাকে তাই জানতে। বৃন্দাবনচন্দ্র তখন ইস্কুলের সম্পাদক সুধীরবাবুর সংগে কথা বলছেন। ঐ লোকটিকে কমলা সহ্য করতে পারে না। অথচ সাধারণতঃ কোনো মানুষের উপর অতোখানি বিরক্ত হবার মন-মেজাজ কমলার নয়।

কমলা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে চ'লে গেছে আজ চার দিন। পৌঁছে সে গেছে। তবে পৌঁছানো সংবাদ আসতে দেরি আছে কয়েকদিন। ঠাকুর-চাকরের পরিচর্যায় অনুষ্ঠানের ত্রুটি না হ'লে-ও বৃন্দাবনের মনে বেশ একখানা ফাঁকা আকাশ উদাস হ'য়ে ছড়িয়ে রয়েছে। ইস্কুলের ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি মনোযোগ করেছেন। তাতে সময় কেটে যাচ্ছে খানিকটা। সুধীরবাবু মধ্যে মধ্যে আসছেন। জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি মহা মুশ্‌কিলে পড়েছেন।

জীবনকৃষ্ণের ডিগ্রির অভাব নেই। মানুষটি ঠাণ্ডা প্রকৃতির। আলস্য-মন্থর শীতলতা। কাজের বিঘ্ন। কিন্তু স্পষ্ট কোনো অভিযোগকে তীব্র ক'রে তুলবার কারণ কৈ? ইস্কুলের কর্মচারী দক্ষতার সঙ্গে খাতাপত্র রাখেন; সহকারী প্রধান শিক্ষক নিজের তাগিদে ইস্কুল-পরিচালনা করেন ভালোভাবেই; ছেলেরা নিয়মিতভাবেই লেখাপড়া ক'রে যায়: পরিদর্শক ডিগ্রিধারী প্রধান শিক্ষকের ভুল-ত্রুটি দেখে-ও দেখেন না। —অথচ ইস্কুলটি কেমন যেনো মরা ইঁদুরের মতো ঢ্যাপ্‌ হ'য়ে প'ড়ে আছে। প্রাণ নেই। নরেন্দ্রকে মনে পড়ে সম্পাদক সুধীরবাবুর। কী অসাধারণ কর্মঠ আর মনস্ক মানুষ। বিদ্যাবত্তা-ও প্রচুর। সম্পূর্ণ দক্ষ ও অনলস। কিন্তু বড়ো দর্পী। তেজী। এক বগ্‌গা। —তা হ'লেও বর্তমান দুর্দশায় তাঁর মতো দম্ভী লোককে-ও সুধীর-বাবু সইতে রাজি আছেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ প্রতিকূল। এবং নরেন্দ্র বাবুই বা সম্মত হবেন কেন?

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সম্পাদক জীবনকৃষ্ণের বাসায় এসে পড়লেন। জীবনকৃষ্ণ এখন বাসায় একা। স্ত্রী পিত্রালয়ে। একটি বালক ভৃত্য তাঁর কাজ ক'রে দেয়।

চা পান করতে করতে জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে নানা অভিযোগ তো নয়ই, এমন কি উষ্মা-ও প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন এক সময়, "আচ্ছা জীবনবাবু, প্রথম শ্রেণীর ইস্কুলেও শেষ পর্যন্ত আপনি কতোই বা পাবেন হেড্‌ মাস্টারিতে? এখন তো মাত্র আড়াই শো পাচ্ছেন। আগেকার দিন

হ'লে আড়াই শো-তে না হয় হাতি কেনা যেতো—না, না; এটা কথার কথা বলছি। কিন্তু এখন তো তিনশো টাকাতে-ও তিনজনের সংসারে তল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া সংসার তো আর দুয়ে বা তিনে আটক পায় না। সংসারের বাড়্ বাড়ন্ত তো হয়।"

জীবনকৃষ্ণ বুঝলেন ব্যাপারটা। তিনি নিজে বুঝতেন যে তিনি অদক্ষ। ইস্কুলের কাজ তাঁর-ধাতের মানুষের জন্য নয়। সুবিধে-সুযোগ হ'লে, বেশি মাইনের কোনো চাকরি পেলে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন। সম্পাদকের নরম কথাবার্তায় যে-অভিযোগটি প্রচ্ছন্ন, জীবনকৃষ্ণ সেই অব্যক্ত অভিযোগটি বুঝে নিলেন। তিনি সুধু এইটুকু উত্তর করলেন, "আমিও তাই ভাবছি। সোস্যাল এডুকেশনের ব্যাপারে একটা চাকরির চেষ্টা করছি। এখন আপনাকে বলতে ইচ্ছে ছিলো না। তবে আর কাকে-ও জানাবেন না আপনি।" "আরে রামো" ব'লে সুধীরবাবু অত্যন্ত স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়লেন। জিজ্ঞাসায় জানলেন কাজটি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে তিন মাস না কাটলে তাঁর চান্স্ আসবে না। তাঁর নাম সপ্তমস্থানে। মাত্র প্রথম দু'জন কাজ পেয়েছেন। অবশ্য বিশ্বস্তসূত্রে জীবনকৃষ্ণ জেনেছেন যে, তাঁর ভাগ্যে চাকরিটা জুটবেই।

সুধীরবাবু যখন চ'লে গেলেন তখন বেলা পাঁচটা। ভৃত্য উনুনে আগুন ধরিয়েছে। এমন সময় বাণী হালদার এসে উপস্থিত হ'লো। বাড়িতে যে কণিকা নেই, জীবনকৃষ্ণ একা; সেকথা বাণী শুনলো। একটু অপ্রস্তুত হ'লো মনে মনে। একবার ভাবলো বেশিক্ষণ থাকবে না। কিন্তু স্পষ্টতঃ কোনো সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে সাব্যস্ত হ'লো না।

নাই বা থাকলো গৃহিণী। জীবনকৃষ্ণ প'য়ত্রিশ বৎসরে যেতে আর কতোদিন? বাণীই কি কিশোরী বালিকা? ওরা দু'জনেই কি এম. এ. পাশকরা এ যুগের পুরুষ ও নারী নয়? তবে কিনা, এ-যুগ ব'লে সর্বক্ষেত্রেই একযুগ নামের কোনো কাল নেই। আধুনিক ব'লে কথাটা অস্পষ্ট। এযুগে অতি বড়ো আধুনিক শহরে, অতি বেশি আধুনিক পল্লীর অতিশয় বেশি আধুনিক গৃহস্থের পাশাপাশি থাকে গাঢ়গূঢ় সেকেলিয়ানা। অবশ্য জীবনকৃষ্ণ বা বাণী হালদার কেউই সেকেলিয়ানায় পা ফেলে না। যাই হোক, দেখতে

দেখতে বাণী ও জীবনের আলাপ-সংলাপ আধঘণ্টা অতিক্রম করলো। চা এলো। চা খাওয়া শেষ ক'রে-ও কথা চললো।

বাণী ইস্কুল করছে মন্দ নয়। সম্পাদক ইত্যাদি ওখানে ততোটা তল্লাস করেন না ক্রিয়াকর্মে। এক সময় বাণী বললো, একটা চাকরি পেলে মাস্টারি সে ছেড়ে দেবে। ইন্‌স্‌পেক্ট্রেসের চাকরি বেশ সুখের। ওতে পয়সা আছে, অথচ দায়িত্ব নেই। কেবল ইস্কুলে-ইস্কুলে ভারিক্কি চালে খানিকটা তম্বী ক'রেই কাজ চ'লে যায়। অবশ্য চোখ মুদে থাকার ফলে অনেক ইস্কুলের যে ক্ষতি হয়, আর কয়েকটি ইস্কুল যে অন্যায় সুযোগ নিয়ে অসংগত সুবিধে ক'রে নেয়—সে খবর বাণী হয়তো জানে না। যে-ইস্কুলের নূতন বাড়ি করাব টাকা মঞ্জুর হ'য়ে থাকে, তার দশখানা পরের দরখাস্ত আগে টাকা পেয়ে যায়, চিরাচরিত কৌশলে। সে-কৌশল কর্মচারীরা আদিমকাল থেকে অনুশীলন ক'রে আসছে। কেবল এই যুগে অন্ততঃ এদেশে, এই নূতন স্বাধীনতা-পাওয়া দ্বিখণ্ডিত ভারতে সেই অপকৌশলটা দপ্তরে দপ্তরে পরিব্যাপ্ত জালে জটিল।

বাণী এক সময় পুষ্পকণার কথা তুললো। পুষ্প নিজে বিয়ে করলো না কেন? তার তো বাণীর মতো ভাইবোন দেখতে হ্যাঁপাজং ছিলো না? তার তো বাবা ছিলো। তিনি তো দুঃস্থ নয়, উদ্বাস্তু হ'লে-ও। তবে? তা ছাড়া পুষ্পকে তো বাণীর মতো দেখতে খারাপ নয়? বাণী যে দেখতে ভালো নয় সেকথা জীবনকে সে মাঝে মাঝে বলতো। আগে বলতো; এখনও বলছে। কারণ? কারণ বিশেষ কিছু নয়। একটা দরদ তো জাগানো চাই। অনুরাগ যদি না-ও পাওয়া যায়, একটুখানি দরদ-ও পাবে না কি? তবে মেয়েরা বাঁচে কিসে? আর দরদ ইত্যাদি ছাড়া মাত্র মেলামেশা করা এদেশে তো এখনো সম্ভব হয় নি। এতো শীঘ্র কি সম্ভব? এখনো যে মেয়েদের হাতে শিকলের দড়ি না থাকলেও দাগ আছে। বহুকালের শৃংখল একালে মোচন করা হ'লেও তার দাগ এতো অল্পকালের মধ্যে যায় কি ক'রে? বাণী দরদ চায়।

বাণী চায় দরদ। জীবনকৃষ্ণের কাছে। অন্য পুরুষের কাছে-ও। কিন্তু অনেক পুরুষই যে তার উপর বীতরাগ। কেবল জীবনকৃষ্ণ বরাবরই

তার প্রতি বিরাগী নয়। যদিও বিশেষ অনুরাগ তার নেই। এম. এড্. পড়বার সময় বেশি আমল দিলো না বটে; কিন্তু সে তো লোকলজ্জায়। অন্ততঃ বাণী তাই ভাবলো। তা ছাড়া পুষ্প এসে পড়লো যে। দুটো মেয়েতে একসঙ্গে একজন পুরুষের সঙ্গে মিশবে, তা কি হয়? তা সে মেলামেশা যতোই নিরামিষ হোক্।

রান্নাঘরের শ্রী আর তেমন নেই। সেই অনুযোগে ও অজুহাতে বাণী একটু হাত লাগালো জীবনের রান্নাঘর ভাঁড়ারের পারিপাট্যবিধানে। যদি-ও এসব ব্যাপারে অর্থাৎ এই সব মেয়েলি ব্যাপারে মেয়েমানুষ হ'য়েও, ভাইবোন মানুষ ক'রেও বাণী পোক্ত নয় তেমন। ওটা তার তেমন আসে না। আমি জানি অনেক সেকেলে দিদিমা চিরজীবনই অগোছালো থেকে যান। বাণী তাদেরই একজন।

যখন সন্ধ্যা আসন্ন, তখন হঠাৎ পুষ্প এসে হাজির। বাণীকে জীবন বলেছিলো, পুষ্প আজকাল আর আসে না। সময় পায় না। কণা ভুগছে; তাকে দেখতে হয়। তা ছাড়া ইস্কুল আছে।

"কণাকে হাঁসপাতালে দেন না কেন? ওসব রোগে হাঁসপাতালই ভালো। কতো সরঞ্জাম আছে সেখানে।"

"না, তার দরকার নেই। বাপ-মা, বোন ইত্যাদির তদারকে আছে; ডাক্তার দেখছে। ব্যস্। আমি ওসব নিয়ে তেমন মাথা ঘাটাতে চাই না।"

"সে কি? আপনার স্ত্রী নয়?"

"নিশ্চয়। তদারক তো হ'চ্ছে। খবর তো নিই।"

এসব কথাবার্তা আগেই শেষ হ'য়ে গেছে। পুষ্পকণা এসে শিষ্টতা রেখে বাণীর সঙ্গে দু'এক কথা ব'লেই কণিকার খবর দিলো। কণিকাকে হাঁসপাতালে সরাতে হবে। চিকিৎসক বলেছেন। রোগ জটিলতার পথ নিয়েছে। পুষ্পকণা এক সপ্তাহ ইস্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে। ইতিমধ্যে কণাকে হাঁসপাতালে দেওয়া হবে।

কণিকার রোগের খবর শুনে বাণী দরদ জানালো। তারপর তার উঠতে দেরি হ'লো না। যাবার সময় পুষ্পর হাত ধ'রে সৌহার্দ্য জাহির করলো।

পুষ্প অমনোযোগিতায় সহাস্য বিদায় দিলো বাণীকে। এক সময় পুষ্প জীবনকে জিজ্ঞাসা করলো, "বাণী কি প্রায়ই আসে নাকি?"

"তাতে কি তোমার অমত?"

"আমার মতামত মানে? আমি কে?"

"মতামত নয়? তবে কি সুধু জিজ্ঞাসাবাদ?"

"তুমি এমন ক'রে কথা বলতে না তো আগে?"

"আগেটা পরে নয়।"

"অর্থাৎ তুমি বদলেছো?"

"নিশ্চয়। সময় যায় নদীর ঢেউ।"

"জানি। রাখিতে তারে পারে না কেউ। আমার-ও বয়স বাড়ছে।"

"দুঃখের কথা।"

"সত্যি। বিয়ে একটা করলে হোতো।"

"এখনো করার সময় কি নিতান্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে?"

"চেষ্টা করতে হবে। কি-ক'রে বর যোগাড় করি বলো তো জামাইবাবু?"

"ছোটো-বড়ো অনেক রাস্তার কথাই তো লোকে বলে।"

"লোকে যা বলে তাতে সব সময় ফলে না।"

এ-ধরনের কথা কাটা-কাটি মনস্তত্ত্বের কোন্ পর্যায়ে পড়ে সেটা আর মনস্তত্ত্ব-পড়া দুই এম. এ.-ইন্-এডুকেশনের খেয়ালে নেই। ওরা আদৌ বুঝতে পারছে না, গোপন একটা গুহা থেকে ঘোলাটে একটা কামনার ঘূর্ণী পাক খেতে খেতে ওদের ছুঁয়ে-ছিট্‌কে চলেছে। নির্ঝর এখনো এমন স্থূলতা সঞ্চয় করে নি যাতে তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে ওদের দুজনকে। কেবল যা সেদিন একটা জোর ধাক্কায় কাৎ ক'রে ফেলেছিলো আর কি। জীবনকৃষ্ণ তামসিক বেশি। তার বেহুঁস হ'তে দেরি হ'তো না। কিন্তু পুষ্পকণা একে মেয়ে, তাতে হুঁসিয়ার। হুঁসিয়ার না হ'লে আর বোনের জন্য পাত্র সংগ্রহ ক'রে বাপ-মা'কে ভাবনা থেকে মুক্তি দেয়? কিন্তু হুঁসের-ও একটা পরিধি আছে। তার বাইরে বেসামাল হওয়া অসম্ভব নয়। সমুদ্রের ধারে বালিতে ব'সে ব'সে গল্প করলে, এযাবৎ যতোদূর জলোচ্ছ্বাস আসছে তাকে অতিক্রম ক'রে হঠাৎ পরবর্তী ঢেউটা কাপড় ভিজিয়ে দিতে পারে।

হ'লো-ও তাই। পুষ্পকণা আলস্যভরে জীবনের পড়ার ঘরে শুয়ে আছে। ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। জীবনের বালক-ভৃত্য বাসায় চ'লে গেছে। নিকটেই তার কাকার বাসায় সে থাকে। কাকা স্থানীয় চটকলে কাজ করে।

জীবন ব'সে গল্প করছে। তার সম্ভাব্য চাকরির কথা। ইস্কুলের কথা-ও। আটটার আগে পুষ্প যেতে পাবে না—এই সর্তটুকু পুষ্পকণা স্বীকার করেছে। এক সময় জীবনকৃষ্ণের একটি আবদারে পুষ্প রাজি হ'লো। কেন রাজি হ'লো? না হ'লেই ভালো ছিলো। জীবন পুষ্পকে একটি চুম্বনে স্বীকৃত করলো। কথা হ'লো, এর পর থেকে আর কখনো তারা ঘনিষ্ঠতা চর্চা করবে না। কিন্তু প্রবৃত্তিবশতাকে কতোটুকু আমল দিলে কতোখানি আসল আদায় করে সে, সে-খবর এই দুটি প্রাণীর হয় জানা ছিলো না, নয় তো স্মরণ ছিলো না।

একটি চুম্বন যখন তৃতীয় দীর্ঘ ও কর্কশ চুম্বনে বেপরোয়া হ'য়ে উঠলো তখন পুষ্পকণা আর জোর রাখতে পারলো না। অবশ নারীদেহ তখন অসহায়তার সোপান বেয়ে অতলে প'ড়ে যেতে পারতো। কিন্তু যতো আকস্মিক মানুষ তলিয়ে যায়, ততো অপ্রত্যাশিতই সে সামলে ওঠে। অন্ততঃ এক্ষেত্রে তাই হ'লো। শিথিল বেশবাস সামলে নিয়ে জোর ধাক্কায় আক্রমণ-উদ্যোগী পুরুষকে সরিয়ে দিয়ে রমণী যখন বসলো সোজা হ'য়ে তখন তার চোখে ক্রোধের আগুণ, বুকে কামনার কান্না। জীবন চোখের আগুণটাই দেখলো, বুকের কান্নাটা অনুভব করতে তার মনস্কতা ছিলো না।

আটটা বেজে যখন সতেরো মিনিট তখন পুষ্প বিদায় নেবার সময় জীবনকে বললো, "কাল একবার যেয়ো। পরশু বোধহয় কণা যাবে হাঁস-পাতালে। তোমাতে-আমাতে আর যেনো দেখা না হয়। অর্থাৎ এমনিতরো নিভৃতে। নিজেকে বিশ্বাস করি না।"

"তোমার মতো ঠান্ডা মেয়েমানুষকে ওরা কী বলে জানো?"

"তাই নাকি? তোমার মতো কাপুরুষকে কী বলে?"

এর পর পুষ্প আর দাঁড়ালো না।

স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা নিয়ে গল্প অনেক আছে দুনিয়ায়। ভালো-

বাসার মধ্যে হৃদয়বৃত্তির একটা খেলা থাকে। আসক্তির আটা যতোখানিই থাক্ তাতে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার তাতে আপত্তি থাকে না। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ ও পুষ্পকণার এই গহ্বরমুখী রসাতলগতিকে অনেকেই ধিক্কার দেবে হয় তো। কারণ এতে একটি কপট আবরণ নেই। নেই ব'লেই আমি সে-আবরণ দিতে পারলুম না ওদের আজকের বা সেদিনের কথা বলতে গিয়ে। অবশ্য অতি-আধুনিক যেসব লেখক অতিস্থূলের পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে কেউ যদি বলেন, রসাতলের দ্বিতীয় ধাপেই অপরাধীদের থামালেন কেন, আমার জবাব এই যে, এইটাই সত্য ঘটেছিলো। আজ রাত্রির প্রথম প্রহরে ওরা যদি কাম-লালসার মধ্যরাত্রি ঘটিয়ে তুলতো, আমি ঠিক-ঠিক লিখতে পারতুম।

সে-রাত্রে জীবন ঘুমিয়েছিলো। পুষ্পকণার রাত্রি ছিলো বিনিদ্র।

[১৯]

কমলা আশ্রম থেকে নরেন্দ্রকে পত্র দিয়েছে। অনেক শ্রদ্ধাভক্তির কথা অনুচ্ছ্বসিত শান্ত আবেগে লিখেছে সে। নরেন্দ্র সযত্নে পত্রখানি তুলে রাখলেন। আন্নাকালিকে চিঠিখানি পড়তে দিলেন। আনি সব কথা বুঝলো না। তবু কমলার স্পর্শ চিঠিখানির ছত্রে-ছত্রে তাকে স্নেহার্দ্র ক'রে দিলো। এক সময় বললো, "বাবা, শ্রীঅরবিন্দ কি সাধু?" নরেন্দ্র উত্তরে যথাসম্ভব আনির মনের মতো ক'রে বললেন।

নরেন্দ্রের শিক্ষাসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় গ্রন্থখানি লেখা সমাপ্তির পথে। প্রকাশক বর্তমান ভারতী প্রেস। পণ্য হিসাবে লাভবান্ হবে এমন বই প্রেসের মালিক অবশ্যই তিনখানা ছাপাবেন শীঘ্রই। নরেন্দ্রের বইখানিতে লোকসান হয়তো শেষ পর্যন্ত হবে না। কিন্তু নরেন্দ্রের গুণশালীতাকে মালিক সত্যই চিনেছেন। তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতে তাঁর মন আর মনিব্যাগ কৃপণ হ'তে পারছে না।

শিক্ষাগুরুদের সম্পর্কে লেখা বইখানা শিক্ষাবিভাগের কতিপয় ধুরন্ধর সরকারী কর্মচারী তারিফ্ করেছেন। দিল্লী থেকে হরেন্দ্র সেন প্রশংসা ক'রে পত্র দিয়েছেন বইখানি উপহার পেয়ে। লক্ষ্ণৌ-এর এক বাঙালী অধ্যাপক গ্রন্থখানিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার আগ্রহ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। মনোমোহন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। অক্সফোর্ডে থেকে লেখাপড়া শিখেছেন। শিক্ষাতত্ত্বে তিনি কিছুটা বিশারদ।

"বর্তমান ভারত" পত্রিকা ইতিমধ্যে পাঁচশো গ্রাহক পেয়েছে। নরেন্দ্রনাথ এখন সাড়ে তিনশত টাকা দক্ষিণা পাচ্ছেন। প্রেসের কাজে একটি যুবক সহকারী তাঁর ভার লাঘব করছে দক্ষতার সংগে। প্রেসের কাজে প্রত্যহ একঘণ্টা সময় দিলেই চলছে। পত্রিকার জন্যই নরেন্দ্র ব্যস্ত। তা ছাড়া নিজের লেখা। অবশ্য নিজের লেখা ঘরে ব'সেই লেখেন তিনি। চাকরিস্থানে সে-ব্যস্ততাতে তাঁর মন সায় দেয় না।

নরেন্দ্র কমলাকে একটি উত্তর দিলেন চিঠির। সংগে একখণ্ড লিপি

গেলো আম্রাকালির। আম্রাকালি লিখলো, "আশ্রম কি-রকম জায়গা আমি জানি না। বাবা যদি কখনো সেখানে যায়, আমিও সংগে যাবো। গিয়ে দেখে আসবো। বংশীদাকে-ও যেতে বলবো। বংশীদা এখন বেশ ভালো আছে। কিন্তু তার শরীর সারছে না কেন কমলাদি? এখনো যে বড় কাহিল। বাবা বলে, সময় লাগবে"—ইত্যাদি বংশীধ্বনিতে আম্রার চিঠি রণিত।

সেদিন রবিবারের সকালে নরেন্দ্র ব'সে ব'সে একখানি শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ পড়ছিলেন। বইখানির নাম 'Our Education.' গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এক সাধু। এমন সময় বংশীধর এসে হাজির। সে তার বাবার গাড়ি ক'রে এসেছে। কাজেই পথের কষ্ট পেয়ে শরীরে ধকল পড়ার জন্য মাস্টার মশাই তিরস্কার করতে পারবেন না। তাই আনন্দে সে গাড়ি থেকে নেমেই ডাকলো, "মাস্টার মশাই।" ডাক শুনে আম্রা-ও বাপের সংগে বাইরে এসেছিলো। চেনা ডাক, অথচ বংশী যে এখনই এতোটা পথ বেয়ে আসবে সেটি নরেন্দ্র ভাবতে পারেন নি। আম্রারও অপ্রত্যাশিত।

বংশী রোগমুক্তির পর থেকে চা আর খায় না। কাজেই নরেন্দ্র ছুটির দিনের বরাদ্দ দ্বিতীয় পেয়ালা চা নিজের জন্যই আনতে বললেন। ইতিমধ্যেই গোপী চা তৈরি ক'রে ফেলেছিলো। তখনই বলতে না বলতেই চা পেয়ে আম্রা বললো, "গোপী বেশ কাজ শিখেছে বাবা। আমাকে অনেক কাজ থেকে ছুটি দিয়েছে। গোপী বাংলা কথাবার্তা ভালোই শিখেছে। বুঝতে তো পারেই; সম্প্রতি বলতে-ও পারে ভালো।" গোপী বললো, "আম্রাদিদিকে খুব কম কাজ দেবো। আমি সব করবো। আম্রাদিদি কেবল বাবার বিছানা করবে আর পড়ালেখা করবে।"

নরেন্দ্র আর আম্রার বরাত ভালো। অতি ছোটো জাতের এই ভিন্ন প্রদেশীয় কিশোর ছেলেটি প্রকৃতই সৎ-প্রকৃতির মানুষ। নরেন্দ্র-আম্রা যে-রকম ধাতের, তাতে প্রকৃতিতে-নীচ একটি মানুষ তাঁদের পরিবেশে খাপ খাবে না; চাকর হ'লে-ও। নরেন্দ্রের সে-মানুষকে সহ্য হবে না। আম্রা অস্বস্তি পাবে।

বহু পুরাতন হিন্দুজাতি। তার মধ্যে অদল-বদল, ওলট্-পালট্ হ'বে

গেছে বিস্তর। অনেক উচ্চশ্রেণীর মানুষ নীচ, বহু নিম্নশ্রেণীর মানুষ সৎ। একটা এলাহি কায়দার শিক্ষা বহুজনের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়ার পাশ্চাত্ত্য নীতি ও রীতি ভারতে ছিলো না; কিন্তু সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে নিশ্চিত একটি তরল স্রাবে দেশের সমগ্র মাটিতে অনুস্যূত ক'রে দেবার কোনো একটি নিগূঢ় কৌশল ভারতের ঐতিহ্য। তাই নীচ জাতির মানুষ-ও কথকতা শুনতো, রামলীলা দেখতো। সে অনেক কথা। তবে নরেন্দ্র এইটুকু জানেন, গোপীর জাতে ভালো লোক থাকে। গোপী তা প্রমাণ করেছে।

এক সময় আন্নাকালি রেকাবিতে ক'রে চার টুক্‌রো শাঁকালু এনে বংশীর সামনে ধরলো। বললো, "বাবা আমার জন্য ফল আনেন। তাই ছিলো। তুমি তো আর অন্য কিছু এখন খাবে না। এইটুকু খাও। ছিব্‌ড়ে ফেলে দিয়ো। না বাবা?" একথায় নরেন্দ্র পুলকিত হ'লেন। বংশী প্রসন্ন প্রীতিতে ঝির্ ঝির্ ক'রে হৃদ্‌কম্পিত হ'তে থাকলো। আর ভাগ্যবিধাতা বংশী আর আনির ভাগ্যে কী লিখতে লাগলেন নরেন্দ্র-ও জানেন না, অন্যেও জানে না। নরেন্দ্র ভাবলেন, এতো মধুর যে বস্তু, তাকে কটুতা বা তিক্ততা বা তীব্রতা বাঁচিয়ে কোথায় পরিণতি দেবেন তিনি? কোথাও নয়। যা হবার তাই হবে।

কলেজে যেতে বংশীকে এখনো চিকিৎসক নিষেধ করছেন। কলেজের পড়া একটু একটু পড়বে কিনা নরেন্দ্রকে সে জিজ্ঞাসা করলো। নরেন্দ্র বললেন, "দুবেলা নয়, একবেলা ঘণ্টাখানেক পড়া চলে। তবে দুরূহ পাঠ বাদ দিয়ে।" বংশী তাতেই সম্মত হ'লো।

ড্রাইভার ভেঁপু দিলো। বংশী চেঁচিয়ে বললো, "নীলুদা, যাচ্ছি।" ব'লেই মাস্টার মশাইকে বললো, "বাবা আজ একবার কোন্ বিলিতী কোম্পানীর বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। তারা অনেক টাকার পাট নেয়। বাবা কলকাতা যাবেন দুপুরে। তাই এখনই ফিরতে হবে।" শুনে নরেন্দ্র তাকে বিদায় দিতে উৎসুক হ'লেন।

যাবার সময় বংশীধর বললো, "মাস্টার মশাই, কমলাদির আর কোনো চিঠি পেলে বলবেন আমাকে।" এ-কথায় নরেন্দ্র সন্তুষ্ট হ'লেন। আন্না-ও খুশি হ'লো। সম্পূর্ণ বিভিন্ন কয়েকটি পরিবারের সম্পূর্ণ অসম বয়স আর

অসম মনের কয়েকটি মানুষের মধ্যে যে আন্তরিক একটি পরিবার গ'ড়ে উঠছে অন্তররাজ্যে, তার ইতিহাস তারাই সুধু রাখে। আর কেউ রাখে না, রাখবার দরকারই বা কি।

নরেন্দ্রের 'বর্তমান ভারত' পত্রিকা চলছে ভালো; আর বর্তমান ভারতী প্রেসের মালিক ভুবনমোহন চৌধুরি কাগজের এবং অন্য কি-সব ব্যবসায়ে কিছুকাল হ'তে প্রচুর লাভবান হচ্ছেন। সম্প্রতি আকস্মিক একটি উপহার তিনি নরেন্দ্রের কন্যাকে দিলেন। তাতে নরেন্দ্র ও আন্না বিস্মিত হ'লো। উপহার আর কিছু নয়; আন্নার হাতে একটি ছোট্ট ঘড়ি। ঘড়ি পেয়ে আন্নার খুশি আর ধরে না। ভুবনবাবু তার খুশি দেখে সার্থক হ'লেন।

নরেন্দ্রের দ্বিতীয় বইখানা শেষ হবে এক সপ্তাহের মধ্যে। দিল্লী থেকে হরেন্দ্র সেন পূর্বপ্রকাশিত বই আরো দুখানি চেয়ে পাঠালেন। লিখেছেন ভি. পি-তে পাঠাতে। তিনি শিক্ষাতাত্ত্বিক তাঁর দুবন্ধুকে পড়তে দেবেন। পত্রে লিখেছেন, দিল্লীর কাজ ছেড়ে তিনি একটি নূতন পরিকল্পনা নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। তখন নরেন্দ্রকে তাঁর চাই। পরামর্শ দরকার। দেশের শিক্ষার বর্তমান দুর্দশায় তিনি নূতন একটি বিদ্যালয় পত্তন করতে চান। মূলধন পাবার সম্ভাবনা হ'য়েছে। কাজ আরম্ভ করতে বোধ হয় দেরি হবে না।

আন্নাকালি আজ রাত্রে যখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কমলাকে স্বপ্ন দেখছে, তখন নরেন্দ্র বর্তমান ভারতের জন্য সম্পাদকীয় লিখে শেষ ক'রে বর্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্যের সম্পর্কে একটা সমালোচনা লিখতে শুরু করবেন কিনা ভাবছিলেন। মিশনারী এক কলেজের রীতিমতো বাঙ্‌লা-জানা এক বেল্‌জিয়ান অধ্যাপক চল্‌তি বাঙ্‌লা সাহিত্যে গভীর জীবনদর্শন নেই ব'লে প্রাজ্ঞ এক অভিযোগ করেছেন। সে-অভিযোগে উষ্মা নেই; অসম্মতি আছে। বিশ্ববিদ্যালয় রকমারি পারিতোষিক দিয়েছেন যেসব গ্রন্থকারকে, তাদের গ্রন্থগুলির-ও সাহেব সমালোচনা করেছেন। নরেন্দ্রনাথ ফাদার ব্রিয়োঁর লেখায় তারিফ্‌ ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখবেন তাঁর কাগজে।

লেখাটা মাথার মধ্যে ঘন হ'য়ে উঠতে দেরি হবে। কাজেই আজ থাক্‌। নরেন্দ্রনাথ উঠলেন। বিছানায় যাবার আগে দরজা ইত্যাদি তদারক ক'রে

কন্যার নিকট মশারির গায়ে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। হঠাৎ এক সময় আন্না ফুঁপিয়ে উঠলো। মেয়েকে ডাকবেন কিনা, জাগিয়ে তুলবেন কিনা ভাবতে লাগলেন কিছুক্ষণ। না। জাগাবেন না। আন্না আবার অঘোরে ঘুমুচ্ছে। থাক্। কাল না হয় প্রশ্ন ক'রে দেখবেন কী স্বপ্নের ঘোরে তার ঠোঁট ফুলছিলো ঘুমের মধ্যে।

বিছানায় শুয়ে কমলার কথা ভাবতে থাকলেন। কমলার কথা। নিজের জীবনের কথা। বর্তমান ও অতীত। অতীতটা কী বিচিত্র। প্রথম যৌবনে কলেজ ছেড়ে যখন কোচিং ক্লাস ক'রে ওঁর আর বন্ধুদের খাওয়া-পরা চলছিলো, তখন তিনমাসকাল টাকার অত্যন্ত টানাটানির জন্য কলকাতার রাস্তায় মোড়ে দাঁড়িয়ে সংবাদপত্র ফেরি করেছেন তাঁরা। তারপর সুমথ ঘোষ তাঁদের ইস্কুলে নিলো। ইস্কুল যা দক্ষিণা দিতো, তাতে একবেলার বেশি আহার জোটানো সম্ভব ছিলো না। অবশ্য ইস্কুলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাটা যৎকিঞ্চিৎ বেড়েছিলো বৈ কি।

চিন্তামগ্ন নরেন্দ্র হঠাৎ টের পেলেন আন্না তাঁর মশারি তুলে বিছানায় আসছে।

"কী হ'লো মা? এখানে শুবি?"

"হ্যাঁ। তোমার জন্যে মন কেমন করছে।"

"আয়। পাশে থেকে মন কেমন?"

"হ্যাঁ। বাবা, আমি কবে ম্যাট্রিক দেবো?"

"কেন, আসছে বছর?"

"পারবো?"

"খুব পারবি।"

"পাশ হবো?"

"নিশ্চয়।"

"ফার্স্ট ডিভিসনে?"

"হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।"

এর পর ওসব কথা হোলো না। পাশে শুয়ে আনি কেবল একবার বললো, "বাবা, কমলাদির আবার চিঠি কবে আসবে?" নরেন্দ্র উত্তরে যখন

বললেন, "শীঘ্রই আসবে," আনি তখন বললো, "বাবা, চিঠি এলে বংশীদা'কে দেখিয়ো।" নরেন্দ্র বললেন, "দেখাবো।"

আন্না ঘুমিয়ে পড়লো। নরেন্দ্রের যখন ঘুম ঘনিয়ে এলো তখন ঘড়িতে একটা বাজলো। গভীর রাত্রির স্তব্ধতায় নরেন্দ্র মনশ্চক্ষে শ্রীঅরবিন্দকে দেখলেন। জীবিত থাকতে তাঁকে দর্শন করা নরেন্দ্রের সুযোগ হয় নি। শেষ বয়সের চেহারা ছবিতে যা পেয়েছেন তাই যা দেখেছেন। চেহারার মধ্যে একটা বিরাটত্ব সহজেই নজরে পড়ে। কমলা ফিরে এলে তার কাছে সব শুনবেন নরেন্দ্র। তারপর একবার যাবেন পণ্ডিচেরিতে। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ জীবিত নেই। কিন্তু আশ্রমখানি তিনি থাকতে-ও যেমন ছিলো এখনো তাই আছে। এই ধরণের কথা তিনি কারো কারো মুখে যেমন শুনেছিলেন, তেমনি কমলার চিঠিতে-ও জেনেছেন।

নরেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়লেন। ডান হাতখানি আন্নাকালির গায়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আগষ্ট মাস কেটে যেতে আর বেশি দেরি নেই। কমলার-ও আশ্রম থেকে ফিরবার সময় হ'য়ে এলো। কমলার বাবা ভেবেছিলেন মেয়ে বুঝি বাপকে ছেড়ে আশ্রমিকাই হ'য়ে পড়বে। কিন্তু যখন জানলেন কমলা এই মাসেই ফিরছে, তখন তাঁর আহ্লাদ হ'লো অত্যন্ত। তা ছাড়া তাঁর আরো আহ্লাদের কারণ ঘটলো। এযাবৎ তাঁর ছেলে, একমাত্র ছেলে, বাপের কাছে না থেকে স্বতন্ত্র বাড়ি ক'রে বাস করছিলো। ছেলে, বউ আর তাদের দুটি শিশুসন্তান। বৃন্দাবনচন্দ্রের মতো সৎ লোকের পুত্রের সঙ্গে এ-হেন বিচ্ছেদের কারণ কেউ বুঝে উঠতে পারতো না। কিন্তু বৃন্দাবন মনে মনে জানতেন কারণটি।

কলকাতায় বৃন্দাবনচন্দ্রের এক য়্যাটর্নি বন্ধু ছিলেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁরা। বন্ধুটি দশ বৎসর পূর্বে মারা যান। তাঁর বিধবা স্ত্রী সংসারে একা রইলেন। একটি মাত্র মেয়ে; তার বিবাহ দিয়েছিলেন ভালো ঘরে আর ভালো বরে। ঠাকুর, চাকর আর দাসী নিয়ে হেমাঙ্গিনী একাই রইলেন বাড়িতে। বৃন্দাবনচন্দ্র যথাপূর্ব তাঁর বাড়ি যেতে লাগলেন। বরং খবরাখবর নেবার জন্য বেশি যেতে থাকলেন।

বরাবরই বৃন্দাবনের বন্ধু-প্রীতিকে প্রতিবেশী অনেকে ভালো নজরে দেখতো না। তাদের ধারণা প্রীতিটা বন্ধুর চেয়ে বন্ধুপত্নীর প্রতিই বেশি। বৃন্দাবনের ছেলে অনঙ্গমোহন এ-কানাঘুসায় কাণ দেয় নি এযাবৎ। কিন্তু বন্ধুর মৃত্যুর পর যখন বাপ সে-বাড়িতে যাওয়া বাড়িয়েই চললেন তখন অনঙ্গ অবহিত হ'লো।

অনঙ্গর স্বভাবে একটি শুচিবাতিক ভাব বরাবরই ছিলো। যৌবনে সেই বাতিক তাকে অনেক বদ্ সঙ্গীর প্রভাব কাটিয়ে ভালো ছেলে থাকতে সাহায্য ক'রেছিলো বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে শুচিতার বাতিক সহজমনকে একটু কৃত্রিম বা সংকীর্ণ ক'রে যে ফেলেনি তা কেমন ক'রে বলা যায়। তাই সে বাপের এই বন্ধু-পত্নীসৌহার্দ্দ্যকে ভালোভাবে দেখলো না। কোনো রকম কলহ

না ক'রেই সুধুমাত্র কলকাতাবাসের প্রতি আগ্রহবিলাসের যুক্তিতেই স্বতন্ত্র বাস করার ব্যবস্থা করলো। এখন বৃন্দাবনের বন্ধুর স্ত্রীটি মারা গেছেন। এবং অনঙ্গমোহন-ও বাবাকে জানিয়েছে যে, কলকাতার হৈ চৈ-এর মধ্যে তার স্ত্রীর আর ভালো লাগছে না। তা ছাড়া ছেলেদের শরীর ভালো থাকছে না আজকাল। ঠাঁইনাড়া হ'লে ভালো হ'তে পারে। ইত্যাদি যুক্তিতে সে বৃন্দাবনকে ভবানীপুরে ফিরবার কথা জানিয়েছে। বৃন্দাবন বুঝলেন পুত্রের বাড়ি ফেরার কারণটা; কিন্তু খুশি-ও হ'লেন।

গতকাল বটতলা ইস্কুলের সম্পাদক সুধীরবাবু এসে অনেকক্ষণ গল্প ক'রে গেছেন তাঁর সঙ্গে। কন্যা কমলার ধর্মপিপাসাকে সামলাতে পরামর্শ দিয়েছেন; পুত্র ফিরছে শুনে দরদ দেখিয়ে গেছেন। তা ছাড়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন ইস্কুল নিয়ে। জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে। কবে যে জীবনবাবু চাকরিতে বহাল হ'য়ে ইস্কুল ছাড়বেন তার জন্য তিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

সুধীরবাবুর নিজের শরীর-ও ভালো যাচ্ছে না। তাই ইস্কুলের কাজ থেকে অবসর নিতে পারলে ভালোই হয়। অথচ ইস্কুলের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থায় তাঁকে ছাড়লে ইস্কুল চলবেই বা কি ক'রে? সভাপতি মহীতোষ বাবু-ও নিষ্কৃতি চাইছেন বার্ধক্যের কারণে। অবশ্য রীতিমতো বৃদ্ধই তিনি হ'য়েছেন।

একটি ভালো হেড্‌মাস্টার নিয়োগ ক'রে ইস্কুলকে পাকা ভিতে বসিয়ে তাঁরা রেহাই চান। বৃন্দাবন বললেন, "ভালো হেড্ মাস্টার পাওয়া দায়। দেখলেন তো অনেক। এম. এ. বি. টি দীনবন্ধু মজুমদার-ও দেখলেন এড়ুকেশনে এম. এ. জীবনবাবুকে-ও দেখছেন। তখন জিদ্ ধরলেন যে আপনারা। ঐ সুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট নরেন্দ্রবাবুর মতো বিচক্ষণ আর সৎ-ব্যক্তিকে ছাড়া উচিত হয় নি।" একথায় সুধীরবাবু বললেন, "কি মুশ্‌কিল! সরকারী ব্যবস্থা যে! গভর্ণমেন্ট্ বি. টি. ছাড়া হেড্ মাস্টার রাখবেন না যে। না হ'লে যতোই মতভেদ থাক্, সম্ভব হ'লে আমরা কি আর নরেন্দ্রকে রাখতুম না?" ইত্যাদি অতীত মনোভাবের এই বর্তমান অসত্য সংস্করণের যুক্তিগুলি বৃন্দাবন ধ'রে ফেললেন সহজেই। বুঝলেন মানুষটা এখন আর

নরেন্দ্রকে পাবেন না জেনেই তখনকার বাঁকা মনোভাবটি সোজা ক'রে সাজিয়ে সাধু সাজতে চাইছেন।

* * *

জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থ যাচ্ছে, এ-খবর ইস্কুলের অনেকেই জানেন। ইস্কুলের ছেলেরা-ও কয়েকজন। ইস্কুলের কর্তৃপক্ষের সদস্যরা সকলেই। কেননা, ইদানীং প্রায়ই তিনি ছুটি নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন।

তিন দিন আগে হাঁসপাতাল থেকে যে-অবস্থা দেখে এসেছেন স্ত্রী কণিকার, তাতে বেশ বুঝেছেন কণিকা বাঁচবে না। ডাক্তার নিভৃতে একটু আভাস-ও তাঁকে দিয়েছেন।

কণিকা জীবনের স্ত্রী। অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিলো তাকে। যখন বুঝলেন সে-নারী হয়তো আর এ-পৃথিবীতে থাকবে না, তখন নিজের শূন্য সংসারের কথা মনে ক'রে জীবনকৃষ্ণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে পড়লেন। পুষ্পকণা যদি পূর্বের মতো ঘনিষ্ঠতা রাখতো, তা হ'লে হয় তো অতোটা ফাঁক আর ফাঁকা কল্পনায় আসতো না। কিন্তু পুষ্প বার বার দু'বার সংকটমুখী হ'য়ে একেবারে স'রে গেছে জীবনকৃষ্ণের সান্নিধ্য হ'তে। আর যাই হোক্ মেয়েটার জোর আছে।

শুনেছি মেয়েরা যখন তলায় তখন একেবারে নিশ্চিন্তমনে রসাতলে গড়িয়ে চলে। পুষ্পকণা জীবনকে ভালোবাসে না। কাকে-ও ভালোবাসা হয় তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। ভালোবাসার বৃত্তিটুকু তার নেই বোধহয়। মেয়েমানুষ হ'য়ে বক্ষপ্রাচুর্য নেই যাদের, নারী হ'য়ে-ও হৃদয়সম্পদ বোধহয় তাদের বেশি থাকে না। অন্ততঃ এই রকমের একটা দেহতত্ত্ব ও চিত্ততত্ত্ব অঙ্গাঙ্গী হ'লে ব্যাপারটা সহজ হয় বুঝে নেবার। কিন্তু অতো বুঝে নেবার দরকার কি? মোটা কথাটা এই যে, পুষ্পকণা জীবনের দিকে মন দিয়েছিলো। ক্রমে তাকে অধিকার করলো। তারপর আত্মপ্রভাবে জীবনকে ভগিনীর হাতে সম্প্রদান করলো। তখনো জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যেতেই তার তৃপ্তি ছিলো মনে। কিন্তু বার বার দু'বার কামতাড়নায় তার মন হুঁসিয়ার হ'য়ে গেছে।

পুষ্পকণা হিসেবী। হিসেব ক'রে জীবনকে কণিকার সঙ্গে বিয়ে

দিয়েছিলো। হিসেব ক'রে স'রে এলো নিজে। হিসেব না করতে পারলে কোন্ সর্বনাশের গহ্বরেই না পড়তে হ'তো স্খলিতপদে।

যারা বলে হঠাৎ কামতাড়না মেয়েদের আসে না, পুরুষদেরই আসে, তাদের খবর ঠিক খবর নয়। একবার এক ভদ্রঘরের মেয়ে রঙ্গালয়ে এসে পড়েছিলো। তার অকস্মাৎ থিয়েটারের একজনকে ভালো লেগে যায়। যেদিন ভালো লাগে, তার দু'দিন পরে তাকে বিহ্বল চিত্তে পত্রে সব জানায়। তার তিন দিন পরে সেই পুরুষ তার অতিথি হ'লো। সেদিনই তারা পরস্পর সঙ্গত হ'য়েছিলো। অথচ মেয়েটি তখনো পুরুষটির বিষয় কিছু জানতো না। একটা মাসের মধ্যে কয়েকবারই তাদের এই ঘূর্ণীসঙ্গ। তার পর পুরুষটি নিজেকে সামলে নেয়। মেয়েটি-ও তার খোঁজ আর রাখে নি।

তাই কি? সে-মেয়ের আগের ও পরের জীবন কি ঠিক জানা আছে? সে-পুরুষের পূর্বাপর? পুষ্পকণার মধ্যে একটি কামিনী আছে। সকল পুরুষের মধ্যেই কামুক আছে। অনেক মেয়ের কামনা কামের দেহ-উচ্ছ্বাস নিয়ে ততোটা দেখা দেয় না। ধীরে ধীরে ফল্গুস্রোতে একটি অধিকারের ধারা নিয়ে তারা কামনা চরিতার্থ করে। পুরুষকে অধিকার করার আনন্দই তাদের কাছে কামনার একটি চরিতার্থতা।

তা ছাড়া মেয়েরা স্বস্তি চায়। হাঙ্গামার সঙ্গে, অস্থির অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায় না তারা। বাধ্য হ'য়ে যদি অনিশ্চিত জীবনযাত্রাকে সইতে হয় তবে নিরুপায়। কিন্তু গণিকা-ও স্বস্তির জন্যই প্রণয় ফেলে পেশাতে মগ্ন হয়। কেননা, টাকা চাই। টাকা না হ'লে পরিণত জীবনে কোন্ ছায়াঞ্চলে বিশ্রাম নেবে? তার কি বৃদ্ধ পতির মমতা জুটবে ভাগ্যে? পুত্রের আশ্রয় জুটবে কপালে? তবে? তাই মেয়েরা স্বস্তি চায়, নিরাপত্তা চায়।

পুষ্পকণা হঠাৎ কয়েকবার একটা দুষ্প্রবৃত্তির হড়্কানিতে পিছলে গিয়ে বুঝলো এতে শান্তি জুটবে না। তা ছাড়া হাত-পা এলিয়ে চোখকাণ বুজে ডুব দেবার মতো তো নয় তাদের আকর্ষণ। জীবনকুঞ্জ তো উচ্ছিষ্ট। ওর মধ্যে ছিলো কী? এখনই বা আছে কী? পুষ্পকণার নিজের মধ্যে ছিলো কী, আছে কী, তার হিসেব পুষ্পকণার হিসেবের খাতায় সে লেখে না।

সেদিনটা শনিবার। ইস্কুলের সকাল-সকাল ছুটি হ'য়েছে। জীবন ভাবছে হাঁসপাতালে যাবে কিনা। এমন সময় পুষ্পকণা এসে উপস্থিত। অনেক পরে সে সংবাদ দিলো কণা কাল রাত্রিতে মারা গেছে।

কোনো নৈকট্য আর পূর্বের মতো রাখে না পুষ্পকণা। অথচ এই দুঃসংবাদ দিতে সে-ই এলো। খবর দিলো যখন তার আধঘণ্টা পরে পুষ্পকণার বাবা এলেন। এসে জামাইকে নিয়ে যেতে চাইলেন। প্রথমটা জীবন রাজি হয় নি। পরে সম্মত হ'লো।

লোকজন ডেকে গাড়িতে প্রধান জিনিসগুলো চাপিয়ে জীবনকৃষ্ণ শ্বশুরের সঙ্গে তাঁর আশ্রয়ে চললেন। চাকরকে দিয়ে ইস্কুলের সম্পাদককে লিখে জানালেন তিন দিন তাঁর ছুটি চাই, ইত্যাদি। চাকর-ছেলেটিকে বললেন, সে যেনো তার কাকাকে জানিয়ে এসে এ-কয়দিন এ-বাড়িতে থাকে। রাত্রে-ও প্রতিবেশী দু'জনকে তাঁর বাড়ির দিকে একটু নজর রাখতে ব'লে গেলেন।

* * *

শ্বশুর বাড়িতে অর্থাৎ সে-বাসায় পৌছে শুনলেন পুষ্পকণা নাকি চাকরি আর করবে না। সে বিবাহ স্থির ক'রে ফেলেছে। নটবর দে একজন বড়ো কণ্ট্র্যাক্‌টর্‌। পনেরো দিন আগে সখীর বাড়িতে তার সঙ্গে পুষ্পর আলাপ হয়। সেই নটবরই পুষ্পকণার বর। জীবনকৃষ্ণ বিস্মিত হ'লো বৈ কি!

পুষ্পকণা গিয়েছিলো তার কলেজের বন্ধু সবিতার বাড়ি। সবিতা তার জন্মতিথি উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছিলো। কলেজে যখন বি. এ. পড়তো, তখন সবিতা ছিলো সহপাঠিনী। সেই সময় সবিতার সঙ্গে পুষ্পর খুব ভাব ছিলো। বি. এ পাশ করার পর সবিতা তার বাবার কর্মস্থল বোম্বেতে চ'লে গিয়েছিলো। মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখতো পুষ্পকে। পুষ্প-ও জবাব দিতো। এবার তার বাবা কর্ম থেকে অবসর নিয়ে কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে বাসা করেছেন। এ যাবৎ মনোমতো পাত্র না পাওয়ায় তার বিয়ে দেন নি। এবার পাত্র পেয়েছেন।

সবিতার জন্মতিথি উৎসবটা যে মূলতঃ তার বিবাহেরই অধিবাস-উৎসব তা যখন পুষ্পকণা শুনলো, তখন তার মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো।

একে-একে সকলেই বিয়ে করছে। কেবল সে-ই বাকি। কিন্তু মাস্টারিতে জীবনটা ভরছে না। বিয়ে করলেই সব ভরাট হ'য়ে যাবে, ভরপুর হ'য়ে যাবে, একথা তাকে কে বললো জানি না। কেউ বোধহয় এ-যুগে আর তা বলে না। সে-যুগে বলতে হ'তো না সে-কথা। সেকথা সবাই মেনে নিয়েছিলো সে-যুগে। এযুগে যারা বাধ্য হ'য়ে দেরি করে বিয়েতে, যাদের নানা কারণে দেরি হ'য়ে যায়—তাদের সকলেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে বৈ কি। সেক্‌স্‌পীয়র সনেট থেকে উঁকি মেরে এর যা কারণ বলছেন সেটা স্থূল। হিউগো যা বলছেন তাঁর উপন্যাস ফুঁড়ে বেরিয়ে, সে-কারণটাও ভুল নয়। যৌন মনস্তাত্ত্বিকরা অনেকে যা বলে, তা ভারি একগুঁয়ে প্রস্তাব।

চা-চক্র যখন বেশ জ'মে উঠেছে তখন এক ভারিভুরি দেহের চাকচিক্য-প্রয়াসী পরিণত যৌবন ভদ্রলোকের সঙ্গে সবিতা পুষ্পর আলাপ করিয়ে দিলো। তিনিই অবশেষে পুষ্পর পাণিগ্রহণ করবেন।

সখী সবিতা-আহূত চা-চক্রের অন্যতম অতিথি নটবর দে, মহাশয় ব্যক্তি। অর্থাৎ লোকে যাকে বলে সদাশয়। যুদ্ধের অর্থাৎ দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে থেকেই কণ্ট্রাক্টারি করছিলেন। তখন বয়স পরিণত হয় নি। যুদ্ধের সময় থেকে আর তার পরে ব্যবসায়ে পাকা হ'য়ে টাকার কুমীর না হ'লেও বেশ কিছু নগদ, কয়েক খণ্ড জমি, দু'খানা বাড়ি ইত্যাদির মালিক হ'য়েছিলেন। পরিণত যৌবনের চেহারায় কিছু স্থূলত্ব থাকলেও অকর্মণ্য প্রৌঢ় জনের স্থূলত্ব সেটি নয়। ভদ্রলোকের শরীরে বেশ একটি মজবুদ্ কর্মঠতা সুস্পষ্ট। আরো একটু ছিম্‌ছাম্, আরো একটু কম বয়স, আরো একটু একহারা গঠনের হ'লে পুষ্পকণার পাশে আরো মানাতো হয় তো। অন্ততঃ বাণী হালদারের মতটা সেই রকম। সে-মত আক্ষেপের না সুবিচারের তা কেউ কেউ জানে। যাই হোক্, পুষ্পকণা নটবরকে পেয়ে নেহাৎ হেরে যায় নি।

চা-চক্রের আলাপ ঘনিষ্ঠ হ'তে দেরি হয় নি। অল্প একপক্ষকাল মাত্র; তারি মধ্যে পরিচয় পরিণয়ে পরিণতি লাভ করায় আত্মীয় ও বান্ধবদের মধ্যে কিছু বিস্ময় জেগেছিলো বৈ কি। কিন্তু পরিণত যৌবনের সংসারাভিজ্ঞ পুরুষ যদি যুবতী বুঝদার মেয়েকে বিবাহ করে, তবে তাদের পূর্বরাগাদির পালা সংক্ষেপ হ'তে পারে অনেক সময়ই। পুষ্পকণার বয়স কতো? চব্বিশ কি ছাব্বিশ দেহ দেখে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। সত্যকথা শিক্ষিতা মেয়েরা-ও বলে না। অন্ততঃ বয়স সম্পর্কে। এ সম্বন্ধে ধুরন্ধর পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার ইব্‌সেন্ ওয়াকিব্‌হাল ছিলেন।

বিবাহ ক'রে পুষ্পকণা কলকাতায় বালিগঞ্জেই রইলো স্বামীর বাড়িতে। সঙ্ঘ-সমিতি অর্থাৎ ক্লাব ইত্যাদি ক্রমশঃ তার অবসর বিনোদনের সহায় হ'লো। তার বাবা চুঁচড়োতে একটি ছোটোখাটো বাড়ি কিনে পাকারকমের পশ্চিম-বঙ্গবাসী হ'য়ে পড়েছেন। জামাই জীবনকৃষ্ণকে সেই বাড়িতেই থাকবার কথা বলেছিলেন, জীবনকৃষ্ণ তাতে সম্মত হন নি।

যেদিন পুষ্পকণার বিয়ের কথা পাকাপাকি হ'য়ে গেলো সেদিনটা

পুষ্পকণা অথবা জীবনকৃষ্ণ কেউই কিছুদিন ভুলতে পারবে না বোধ হয়। দিনটা ছিলো পূর্ণিমা। জীবনকৃষ্ণের বাসায় পুষ্পকণা এসেছিলো তাকে তার বাবার বাড়িতে গিয়ে বাস করবার অনুরোধ নিয়ে। অনুরোধটা কতোখানি তার আর কতোখানি তার বাবার, তা জানবার চেষ্টা ক'রেও জীবনকৃষ্ণ সঠিক জানতে পারে নি। সেকথা সঠিক না জানলেও পুষ্পকণার বিবাহের সঠিক খবরটা পুষ্পকণা জীবনকে দিয়েছিলো সেইদিনই।

পুষ্পকণা বললো, "একলা একটা চাকর আর ঠিকে ঝি নিয়ে এভাবে এখানে বাসা ক'রে নাই বা থাকলে?"

"আর থাকলেই বা ক্ষতি কি?"

"তুমি ততো কর্মণ্য মানুষ তো নও; তাই বলছিলুম।"

"বিয়ের আগে অনেক বৎসরই আমার একা কেটেছে।"

"জানি।"

"পরের বাসায়, মেসে, কখনো বা একা বাসা ক'রে-ও দিনের পর দিন কেটেছে আমার।"

"কি জানি কেমন ক'রে পেরেছিলে? তোমাকে যবে থেকে দেখছি, তবে থেকে তো বিশ্বাসই হয় না তুমি একা থাকতে পারো।"

তারপর আরো কিছু কথাকাটাকাটি হ'লো। জীবনকৃষ্ণ একা থাকাই জিদ্ ধ'রে রইলো। এক সময় হঠাৎ প্রশ্ন করলো পুষ্পকণাকে, "এমন খামকা একটা বিয়ে করার খেয়াল মাথায় এলো কেন?"

"খামকা মানে? খেয়াল মানে?"

"বেশ তো কেটে যাচ্ছিলো দিন?"

"তাই নাকি? বেশ কেটে যাচ্ছিলো?"

"কেন? নয়?"

"নিজে বউ নিয়ে থাকতে। আমি দু'বার অঘটনের ধাক্কা খেয়ে সামলে নিলুম। কি-ক'রে বুঝবে বেশ দিন কেটে যাচ্ছিলো কিনা?"

"এখন তো বউ নিয়ে থাকতে পাবো না।"

"বউ নিয়ে থাকলেই পারো। দ্বিতীয়বার বিয়ে তো তোমাদের জাতে নতুন হবে না।"

"তোমরা মেয়েরা-ও তো আজকাল দু'বার বিয়ে করো।"

"ক'টা গো? ক'টা মেয়ে দু'বার বিয়ে করে?" পূর্ণিমার চাঁদ এসে পড়েছিলো ঘরে। চাঁদ মানে চাঁদের আলো। পুষ্পকণা আর জীবনকৃষ্ণ মুখোমুখী বসেছিলো চেয়ারে। মাঝখানে টেবিল। টেবিলের উপর রবীন্দ্র-নাথের "দুই বোন" বইখানা পড়েছিলো। আর পড়েছিলো নরেন্দ্রের শিক্ষা-বিষয়ক বইখানা। জীবনকৃষ্ণ নরেন্দ্রের বইখানা কিনেছিলেন। প'ড়ে তারিফ করেছিলেন মনে মনে।

পুষ্প যাকে বিয়ে করবে সেই নটবর লোকটির কিছুটা খবর জীবনকৃষ্ণ জেনেছিলো। এখন জিজ্ঞাসা করলো, "ওকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছিলে বোধহয়? Love at first sight?"

"কলেজের ছেলেবেলার মন এখনো তোমার কাটলো না?"

"কেন?"

"Love আবার কি? ওকে বিয়ে করছি মাত্র। ভালোবাসাবাসির অতোশতো এতে আছে নাকি?"

"না ভালোবেসেই বিয়ে করছো?"

"আগেকার মেয়েরা ভালোবেসে বিয়ে করতো নাকি?"

"তাদের যে-বয়সে বিয়ে হোতো, তোমার সে-বয়স এ-জীবনে আর আসবে না।"

"আমরা অনেকেই বিয়ের বয়সে নাবালিকা।"

"না-বালিকারা মনে মনে ভগিনীপতিকে হাতের পাঁচ রেখে তাস খেলতো বুঝি?"

"কি করবো? বয়স তো চোদ্দর ধারে-কাছে নয়? মাসে মাসে যৌবনটা দেহে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়ে পুরোনো হ'য়ে গেলো। অগত্যা দু'বার ঘুরণপাক খেলুম।"

"তোমার মতো বয়সে অন্য মেয়েদের-ও কি অমন দুর্ভোগ ভুগতে হয়?"

"সকলের খবর জানবার খবরের কাগজ কিনতে পাওয়া যায় না। তা হ'লে বলতে পারতুম। তবে দু-একজনকে আমার চেয়ে-ও তলিয়ে যেতে

জেনেছি। অবশ্য সকলেরই শালি-শালা সম্পর্ক নয়।"

"আমি আবার বিয়ে করি এই কি তুমি চাও?"

"চাই।"

"তবে একটা প্রস্তাব করবো?"

"বলো।"

"নটবরকে জবাব দিয়ে দাও।"

"সে কি?"

"হ্যাঁ।"

তারপর জীবনকৃষ্ণ যা বললো সেকথা শুনে পুষ্পকণার দুটো কাণ ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকলো। জীবন বললো, পুষ্প মিথ্যাচার ক'রে চলেছে। এ-বিবাহে পা দেওয়া মানে নিজেকে ঠকানো। নটবরকে তো বটেই। একথায় পুষ্প ঝাঁঝিয়ে উঠলো। নটবরকে সে ঠকাবে না। তাকে সে ভালোবাসবেই। জীবনের দিকে দু'দণ্ডের ট'লে পড়ার মানে ভালোবাসা নয় নিশ্চয়ই। তা ছাড়া অন্যায় অপকর্ম-ও সে কিছু করে নি। বিয়ে হ'লে নটবরকে সে এই ত্রুটিটুকু-ও জানাতে ভুলবে না।

জীবনকৃষ্ণ যখন দেখলো ঘড়িতে আটটা বেজে গেলো, তখন এক সময় মরীয়া হ'য়ে উঠলো তার মন। শক্ত ক'রে পুষ্পকণার হাত দুটো চেপে ধরতেই পুষ্প বিব্রত হ'লো। ভাবলো দু'বার যার আক্রমণ ঠেকিয়েছি, তৃতীয়বার যদি পরাজিত হই, তবে যে তার সব আত্মমর্যাদা ভেসে যাবে। জীবনকৃষ্ণ বললো, "তুমি আমায় বিয়ে করো।"

"শালি ভগিনীপতির বিয়ে?"

"নূতন নয়।"

"না। কিন্তু কেন?"

"ঠকানোটা শুধ্‌রে নেওয়া হবে।"

"উপর থেকে কণা দেখতে পাবে না?"

"তার কাছে ক্ষমা চাইবো।"

"সেইটুকুতেই তোমার মন মানতে পারে, আমার তাতে কুলোবে না। আমি এমনিতেই কণার কাছে অপরাধী হ'য়ে আছি।"

"কেন, কী এমন ঘটেছিলো? সে কি কিছু বুঝতে পেরেছিলো কোন দিন?"

"পেরেছিলো।"

"কি-ক'রে জানলে?"

"মেয়েমানুষের মন যে আমার। বুঝতে পারতুম।"

সাড়ে আটটা বাজতেই পুষ্প নরম একটা মিষ্টি চুমো জীবনকৃষ্ণের মুখে খেয়েই দূরে স'রে গিয়ে বললো, "ক্ষমা করো জীবন, নটবরকে বিয়ে ক'রে ভালোবাসতে চাই। আমার সে-সাধে বাদ সেধো না।"

চ'লে গেলো পুষ্পকণা। জীবন একা ব'সে রইলো অনেকক্ষণ। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো এতোদিন কি বোকাই ছিলুম। অনায়াসে পুষ্পকে জোর ক'রে বিয়ে করতে পারতুম প্রথম দিকেই। কণিকাকে গাছয়ে দেওয়ার দুর্বুদ্ধি পুষ্পকণার মাথায় গজাবার অবসরই পেতো না তাহ'লে। কোথায় যেনো পুষ্পকণাকে জ্যেষ্ঠ ব'লে মনে হোতো জীবনের! যেনো মনের বয়সে পুষ্পকণা তার চেয়ে বড়ো। পুষ্প বয়সে ছোটো, কিন্তু বোঝে বেশি তার চেয়ে। তা ছাড়া পুষ্পকণার মুখখানি মেয়েমানুষের, কিন্তু চলন আর বলন না মেয়ের না পুরুষের। অথচ ক্লীব ব'লে গালির ভাষা প্রয়োগ করলে একেবারে ভুল হবে। ছলা-কলার ভাবভঙ্গী বেশ ছিলো তার। ছলনার কৌশলেই তো জীবনকে বোনের জন্য বাগাতে পেরেছিলো।

কোথায় যেনো ভুল হ'য়ে গেছে জীবনের। যাক্, আর নয়। মন থেকে ও-মেয়েকে মুছে ফেলতে হবে। ওর বিয়ে হোক্। জীবন নতুন চাকরিটা পেলে কলকাতাতেই থাকবে। তখন বোধহয় তার জীবনের মোড় ফিরবে। কিন্তু বয়সটা পঁয়ত্রিশ হ'তে যে আর বেশি দেরি নেই।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন কাটিয়ে জীবনকৃষ্ণ ভাবলো, ঐ নটবরের বয়স কম নয়। টাকার সঞ্চয় প্রচুর। নানান্ ব্যবসায়ে পাকা। শহুরে এই মানুষটা কি নিতান্ত অনূঢ়-নিষ্পাপ? যে-পণ নিয়ে পুষ্পকণা তাকে বরণ করতে যাচ্ছে, তাতে বাধা ঘটবে না তো? হয়তো শীঘ্রই পুষ্প দেখবে, এ-পুরুষ সত্যবানটি নয়।

এ-রকম বৈরীভাবাপন্ন চিন্তা কেন এলো জীবনকৃষ্ণের মাথায় তা জানি

না। কামনা যে মানুষের কতো রকম হ্রস্বদীর্ঘ সুতোয় বোনা থাকে, কতো রকম লঘুগুরু রঙে প্রলিপ্ত থাকে, কতো রকম ইতর বিশেষ রেখায় চিহ্নিত থাকে—তা কে জানে? পুষ্পকণার কী কামনা ছিলো জীবনকৃষ্ণের দিকে, জীবনকৃষ্ণের কী কামনা এলো পুষ্পকণার বিমুখে, তা বলবো কি-ক'রে?

শুয়ে শুয়ে জীবন ঠিক করলো, বিয়েতে যাবে না। মন ভালো নেই—এই অজুহাতই যথেষ্ট হবে। এই সেদিন তার স্ত্রী মারা গেছে, এখনই আনন্দোৎসবে যোগ দেবার ইচ্ছা যদি তার না-ই হয়, তাতে অস্বাভাবিকতাটা কোথায়? অস্বাভাবিকতা রীতিমতোই। কিন্তু সেকথা বুঝবার বুদ্ধি তখন জীবনকৃষ্ণের নেই।

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই জীবন বিছানার বাইরে এলো। আলো জেবলে চেয়ারে ব'সে কাগজ নিয়ে লিখতে বসলো। লিখলো, "প্রিয় পুষ্প, তোমার বিবাহে আমি সর্বান্তঃকরণে সুখী। তোমাকে সুখী দেখলে স্বর্গ থেকে কণা খুশি হবে।"

লেখা শেষ ক'রে দু'বার চিঠিখানা পড়লো। কিম্ভূতকিমাকার মনে হ'লো লিপিটুকুকে। হঠাৎ ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ ক'রে ছিঁড়ে ফেললো লেখাটা। বারান্দায় গিয়ে উঠোনে টুক্‌রোগুলো উড়িয়ে ফেলে দিলো। তখনো পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে সমান উজ্জ্বল।

বৃন্দাবনচন্দ্র কন্যা কমলার প্রত্যাবর্তনে যারপর নাই সুখী। এদিকে বিবাগী ছেলে-বউ-ও ঘরে জাজ্জ্বল্যমান। কমলা নিজের মনকে মনে মনে গুপ্ত রেখে প্রকাশ্যে যেভাবে চলাফেরা করতে থাকলো, তাতে তার বাবা বুঝলেন, মেয়ের আশ্রম-দর্শন একটা নতুন কিছু দেখার তৃষ্ণানিবারণ মাত্র। একান্ত কোনো বৈরাগ্যের বেদনা তাকে পেয়ে বসে নি।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছেন কমলার ভাবান্তর এসেছে। আভাসে বুঝেছিলেন প্রথম দর্শনেই। পরে কথায়-বার্তায় সেটি প্রমাণিত দেখে নিজের বুদ্ধিতে আশ্বস্ত হ'য়েছেন। গত রবিবার সকালে কমলা এসেছিলো। কমলা আসবার দশ মিনিট পরেই বাবার গাড়িখানির বাহনে বংশীধর-ও এসে পড়েছিল। গোপী চাকর যখন চা এনে দিলো সকলকে এক পেয়ালা ক'রে, আর আন্নাকালি তার বংশীদার জন্য এক পেয়ালা কোকো, তখন ওদের মজলিশ বেশ জ'মে উঠলো।

চা খেতে খেতে প্রথমটায় কমলা নরেন্দ্রের বইখানি কেমন বিক্রি হচ্ছে তার খবর নিলো। আরো খবর নিলো তাঁর দ্বিতীয় বইখানি ছাপা হ'য়ে বের হ'তে কতো দেরি। নরেন্দ্রের বর্তমান ভারত পত্রিকা যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কতকাংশ শিক্ষিত সাধারণকে প্রভাবিত করতে পেরেছে, তা-ও জেনে নিলো ভালো ক'রে। তারপর নরেন্দ্রের প্রশ্ন, আন্নাকালির এক-আধটা জিজ্ঞাসা এবং বংশীধরের কয়েকটি কথার উত্তরে পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সম্পর্কে নিজের চোখে যা দেখে এসেছে, তা বললো।

কমলার আশ্রম-অভিজ্ঞতা, ভালো লাগার অভিজ্ঞতা। যাকে সত্যই ভালো লাগে, অন্তরঙ্গ মহলে ঘনিষ্ঠ পরিবেশে তার কথা বলতে মানুষ কুণ্ঠিত তো হয়-ই না; বিশেষ সতর্ক-ও হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশীযুগে যা-কিছু প্রবর্তন করেছিলেন এবং আরো যা-কিছু প্রবর্তন করার ইঙ্গিত করেছিলেন;—দেশের পরবর্তী রাষ্ট্র-আন্দোলনের বহুধা বিস্তারে জনমনে তা চাপা প'ড়ে গেছে। গান্ধীজির দীর্ঘ নেতৃত্বে

চরকা-হরিজন-অহিংসা ইত্যাদির তুমুল কলরোলে শ্রীঅরবিন্দযুগের দেশকর্ম জনমন ভুলে গেছে। তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর নিভৃত জীবনযাপনে শ্রীঅরবিন্দ দেশের লোকের মন থেকে স'রে গেছেন। বুদ্ধিচতুর একোলিয়ানাগবী শিক্ষিতজনের কেউ কেউ মজ্‌লিশে ব'সে ব'লেই ফেলেন যে, শ্রীঅরবিন্দ **escapist.** সংসার থেকে স'রে গিয়ে ভগবানের ধোঁয়ায় আত্মনিয়োগ করলেন। কমলা যদি বেশি রকম বুদ্ধিদীপ্ত মেয়ে হ'তো আর তার সম্মুখে যদি আজ এ-ধরণের সংশয়ী বা বৈরী প্রতিপক্ষ থাকতো, তবে তার মতো সরলবিশ্বাসী মেয়ে মুখ খুলতো না। কিন্তু বংশীধর ও নরেন্দ্র সামনে থাকলে কমলার আত্মপ্রকাশে বাধা নেই। তাই সে মনখুলে আশ্রমের শত প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলো।

বংশীধর এক সময় বললো, "মাস্টার মশাই, শুনেছি শ্রীঅরবিন্দ অজস্র সব বই লিখে গেছেন। তবে সে-সব বই নাকি দুরূহ। আমরা বুঝতে পারি, এমন কোনো সহজ বই নেই তাঁর?" এ-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কমলা দিতে পারলো না। কারণ সে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম দেখে এসে তাঁর বই-এর কথা ভুলে গেছে। পণ্ডিচেরি আশ্রম একটি অত্যন্ত জীবনধর্মী কর্মক্ষেত্র। সেখানে রীতিমতো জীবনস্রোত প্রবহমান। যাই হোক্‌, নরেন্দ্র বললেন, "তোমাকে বলবার মতো জ্ঞান আমার এখনো হয় নি বংশীধর, তাঁর বইগুলি পড়তে আরম্ভ করেছি। খানিকটা তাঁর ভাবকে আয়ত্ত করতে পারলে তোমাকে বলবো।"

নরেন্দ্রকে কমলা যা-যা বললো এবং আরো দু-একবার যা বলেছে তাতে নরেন্দ্র বুঝেছেন, শীঘ্রই কমলা আবার আশ্রমে যাবে এবং তখন তার ফিরে আসার ইচ্ছা বোধহয় আর থাকবে না।

আন্নাকালি প্রশ্ন করেছিলো মাত্র একটি। সে বললো, "কমলাদি, সেখানে ইস্কুল-কলেজ আছে? গান-বাজনা, জ্ঞানবিদ্যে সবের চর্চা করা হয়?" কমলা তার উত্তর দিতে আন্না খুশি হ'লো। আর বিশেষ কিছু প্রশ্ন সে করে নি। তবে ওদের কথাবার্তা শুনেছে মন দিয়ে।

চা খাওয়া শেষ হ'লো। বংশীধরের কোকো। বংশী নরেন্দ্রকে বললো, "মাস্টার মশাই, শরীরটায় বেশ জোর পাচ্ছি না। বাবা বলছিলেন

পড়াশুনা বেশ কিছুদিন বন্ধ রেখে একটা কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় যেতে।" একথায় নরেন্দ্র সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন, "পড়াশুনার জন্য ভেবো না। এক বছর নষ্ট হ'লে-ও ক্ষতি নেই। শরীরটা ঠিক ক'রে নাও। টাইফয়েড্ একবার হ'লে শরীরকে বড়ো বেশি জখম করে।"

আন্নাকালি অন্যমনস্ক হ'লো। বংশীধর অসুস্থ হ'লে সে চিন্তিত হয়। তার মনের সংসারে নরেন্দ্র, কমলা আর বংশীধর-ই একমাত্র আপনজন। নরেন্দ্র অসুস্থ হ'লে আন্নাকালি দিশেহারা হয়, অসহায় বোধ করে। কমলা অসুস্থ হ'লে চিন্তিত হয়। আর বংশীর রোগের সময় তার সমস্ত অন্তর একপ্রহরের রোদে শুকিয়ে-ওঠা কীটদষ্ট শিথিলমূল চারা গাছটির মতো অবসন্ন ও প্রাণক্ষীণ হ'য়ে পড়ে।

স্বাস্থ্যের জন্য বংশী ভিন্ন দেশে যাবে, থাকবে অনেক দিন, তাতে বংশীর শরীর ভালো হবে;—এতে আন্নার কতো স্বস্তি। কিন্তু দীর্ঘদিনের অদর্শন সইতে হবে ভেবে আন্নার বুকের ভিতর একটা কষ্ট হ'লো। এই কষ্টটি বিশেষ একটি বেদনা। এ-বেদনা তার কমলার জন্য হয় না; নরেন্দ্রের জন্য-ও নয়। তবু-ও মুখে খুশি এনে আন্নাকালি বললো, "বংশীদা, বিদেশ যাও। অনেক দিন থেকে এসো। পড়াশুনার কামাই হোক্ গে। কিন্তু কোথায় যাবে? আমাকে ঠিকানা দিয়ে যেয়ো। আমি তোমাকে চিঠি লিখবো। বাবার সংগে তো লিখবোই; আবার ইচ্ছে গেলে আলাদা লিখবো; কেমন? জবাব দেবে?"

"কেন দেবো না?"

"সে-দেশের গল্প লিখবে ভালো ক'রে।"

"তা লিখবো।"

বংশী যখন চ'লে গেলো তখনো কমলা রইলো। খেয়ে-দেয়ে বিকাল-বেলা সে বাড়ি যাবে।

দুপুরে খেতে ব'সে কমলা নরেন্দ্রকে ভবানীপুরের বটতলা ইস্কুলের কিছু খবর দিলো। প্রধান শিক্ষক জীবনকৃষ্ণের খবর-ও দিলো। নরেন্দ্র জেনেছিলেন জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী মারা গেছে। সরকারী চাকরি জীবনকৃষ্ণ পেয়ে যাবেন-ই। ইস্কুল থেকে তিনি চ'লে যাবেন-ই। কিন্তু নতুন প্রধান শিক্ষক

আনতে কমিটি কুণ্ঠা বোধ করছেন। নতুন দুটি লোকের নমুনায় হতাশ হ'য়ে গেছেন তাঁরা। সম্পাদক সুধীরবাবু এইটুকু বুঝতে পারছেন না যে, নরেন্দ্রের পরিচালিত ইস্কুলের পরবর্তী অবস্থা কিছুতেই তাঁদের মনঃপূত হবে না। নরেন্দ্র ইস্কুলকে যে শৃংখলা, শান্তি ও দক্ষতার উঁচু সুরে বেঁধে দিতে পেরেছিলেন, সেটি সহজে আর সম্ভব হবে না। বর্তমান সভ্যতায় যান্ত্রিক কায়দায় এম. এ. পাওয়া যায়, বি. টি. পাওয়া যায়, এম্-এড্ পাওয়া যায়; কিন্তু মানুষ পাওয়া যায় না। অবশ্য সংসারে মানুষের মতো মানুষের অভাব কোনোদিনই হয় না; কিন্তু ঠিক ক্ষেত্রে ঠিক মানুষটি সব সময় জুটে আসে না।

কমলা চ'লে গেলো বিকালে। নরেন্দ্র আন্নাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলেন। আন্না তাঁকে বংশীর কথা অনেকবারই প্রশ্ন করলো। নরেন্দ্র উত্তর অবশ্যই দিচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি বিমনা ছিলেন অনেকখানি। কমলার কাছ থেকে আশ্রমের গল্প শুনে তাঁর বিমনা-ভাব।

প্রৌঢ়ত্ব-অতিক্রান্ত এই বার্ধক্যে পদক্ষেপকারী মানুষটির অন্তরের ইতিহাস কেউ জানে না। কলেজ-জীবন, স্বদেশী-জীবন, শিক্ষক-জীবন এবং বর্তমান জীবন মোটামুটি কোন্ কোন্ ঘটনায় চিহ্নিত তা জানা যায়; কিন্তু প্রৌঢ় জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত অনূঢ়, একটি বিধর্মী অসহায়া কন্যার পিতৃস্থানাধিকারী নরেন্দ্রের অন্তর-জীবন কি এতোই সরল রেখাপাতে কেটেছে যে, তাঁর [illegible] বৃত্তান্তটুকুই তাঁকে জানার পক্ষে যথেষ্ট?

রাত্রিতে যখন আন্না নিদ্রিত, তখন নরেন্দ্র 'জাতীয় শিক্ষা কোন্ পথে' বইখানির প্রুফ দেখা শেষ করলেন। বইখানি প্রকাশিত হ'তে একমাস লাগবে। তাঁর প্রথম বইখানি দেখে শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছেন। শিক্ষা বিভাগের যে-দু'জন লোক জানেন যে নরেন্দ্র যথেষ্ট ডিগ্রি না থাকায় ইস্কুল ছাড়তে অর্থাৎ হেড্ মাস্টারি ছাড়তে বাধ্য হ'য়েছেন তাঁরা ভাবছেন যে, এ-রকম যোগ্য লোককে নিয়মের বাইরে রেখে যোগ্যস্থানে বসানো উচিত।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আন্নাকালি স্বপ্ন দেখছে যে, বিদেশে বংশীধরের বাসায় সে হঠাৎ তার বাবার সঙ্গে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু বংশীদা খুব

অসুস্থ। যখন স্বপ্নে দুশ্চিন্তার আক্রমণে আন্নার ঘুম ভাঙ্‌লো, তখনও নরেন্দ্র শুতে যান নি। আন্না জানতে পারলো। কিন্তু বাবার সঙ্গে কোনো কথা বললো না। জানতে দিলো না যে সে জেগে উঠেছে। পাশফিরে বংশীর জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো। ঠাকুর বলতে সে হিন্দুর ঠাকুরদের-ও বোঝে। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ মূর্তি তার মনে এলো না। সে সুধু কমলাদির গল্পে যে-আশ্রমের কাহিনী শুনেছে, সেই কথাই ভাবলো। সে ভাবলো, আশ্রম মানেই ঠাকুর।

আন্না ঘুমিয়ে পড়লো। নরেন্দ্র শুয়েছেন এবার। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছেন। আন্না আবার স্বপ্ন দেখলো। এবারকার স্বপ্নে তার আর ঘুম ভাঙ্‌লো না। সুখস্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আন্না খুব গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন রইলো। সে দেখলো, বংশী সুস্থ শরীরে তার সঙ্গে ব্যাড্‌মিন্‌টন্‌ খেলছে। জায়গাটা বেশ মস্তো মাঠ। ধারে নদী ব'য়ে যাচ্ছে।

নিন্দুকে যা-ই বলুক, অসহিষ্ণু মন যতোই সমালোচনা করুক স্বাধীন ভারত সরকারের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে, একথা ঠিক, সরকার নানা রকমভাবে প্রকাণ্ড দেশটার বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্তস্রোত প্রবহমান করতে সচেষ্ট। নানা রকমের পাঁচসালা দশসালা বন্দোবস্তে দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি জাঁকিয়ে তোলবার ফর্দ আর ফিরিস্তির অন্ত নেই। সাধারণভাবে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সবিশেষ কিছু করার বন্দোবস্তের দেখা না পাওয়া গেলেও, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য,—যাকে তাঁরা সামাজিক শিক্ষা বলেন—তার জন্য অফিস আর অফিসার বানিয়ে ফেলছেন মন্দ নয়। সেই সামাজিক শিক্ষা-বিভাগে জীবনকৃষ্ণ চাকরি পেয়েছেন। কাজে বসতে অর্থাৎ বেতন নিয়ে কর্ম শুরু করতে হয়তো এখনো তিন মাস লাগবে। ইতিমধ্যে তিনি বটতলা ইস্কুলের সম্পাদক, সভাপতি এবং অন্যতম সদস্য বৃন্দাবনচন্দ্রকে সেকথা জানিয়ে দিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা কমিয়েছেন। জীবনকৃষ্ণ মানুষটির মধ্যে অসার, অপদার্থ একজন ব্যক্তি বাস করে; নচেৎ তিনি দুষ্ট নয়। এই সরকারী চাকরিটা পাওয়া না যেতো যদি, তবু-ও তিনি বটতলা ইস্কুল ছেড়ে চ'লে যেতেন। তাঁর সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ. পাশ ক'রে যারা ভালো ভালো চাকরিতে বহাল হ'য়েছে, তিনি তাদের অনেককেই চাকরির জন্য ভালো ক'রে ব'লে রেখেছেন।

পুষ্পকণা শ্বশুর বাড়ি থেকে একখানা চিঠি লিখেছিলো জীবনকে। জীবন যাতে এভাবে একা না থেকে শ্বশুরের সঙ্গে চুঁচড়োতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকে এবং সেখান থেকে ইস্কুল করে, তার অনুরোধ ছিলো পত্রে। পত্র প'ড়ে জীবনকৃষ্ণ মনে মনে স্বীকার করলেন যে একা একটি চাকর নিয়ে বাস করার ঝঞ্ঝাট তাঁর স্বভাবে সহজ নয়; কিন্তু শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে আর কোনো বিশেষ সম্পর্ক রাখতে তাঁর ইচ্ছা যায় না। তা ছাড়া পুষ্পকণার অভিভাবকত্ব এখন তাকে বিরক্ত করে। যতোদিন নাবালক থাকা যায় ততোদিন অভিভাবকের শাসন মধ্যে মধ্যে আপত্তির ও অস্বস্তির হ'লে-ও

মোটের উপর অভিভাবককে স্বীকারই করি আমরা। কিন্তু একবার সাবালক হ'লে আর অভিভাবকের তদারক পছন্দ করা যায় না। কণিকার গর্ভনাশ, কণিকার মৃত্যু, পুষ্পকণার জীবনকৃষ্ণকে ছেড়ে দেওয়া, পুষ্পকণার বিবাহ;— এতগুলো ব্যাপারের পরেও কি পরিণত যৌবন এম. এড্. পাশকরা জীবনের জীবনে সাবালকত্ব আসবে না? পুষ্পকণার চিঠির জবাব দেয় নি সে। শেষ অংশ 'পুনশ্চ' দিয়ে যে ছোট্ট লিখনটুকু ছিলো, তার কথা জীবনকৃষ্ণ ভুলতে পারলো না। বরং সেই লিপিটুকু মনে পড়লে জীবনের একটু অনুকম্পাই জাগছিলো পুষ্পকণার জন্য।

নটবর সদাশয় লোক। স্বামী হিসাবে মন্দ তো নয়ই, বরং তিন-চার বার আলাপ-আলোচনার পর-ও লোকে বলবে স্বামী হিসাবে নটবর বেশ ভালো। অথচ বিবাহের পর স্ত্রী যেভাবে স্বামীকে জানে, তার সিকির সিকিটুকু-ও অপরে জানবার কথা নয়। তাই পুষ্পকণা নটবরের যে-পরিচয় পেলো পরিণয়ের পরে, তার ফলে স্বল্প একটু আক্ষেপের সুর যদি তার চিঠিতে জীবনকৃষ্ণ পেয়ে থাকে, তা ভুলবে কি-ক'রে?

বিশেষ কিছু সে-লেখায় ছিলো না। লিখেছিলো পুষ্পকণা, "পুঃ; ভালো আছি। ভালো খাচ্ছি, ভালো পরছি। বন্ধু-বান্ধব জুটেছে অনেক। স্বামী মহাশয় আমাকে যত্ন-আদরের ত্রুটি তো করেনই না, বরং একটু বেশি আদর করেন। কিন্তু সব পুরুষ সমান নয়। তোমার মতো নাবালক পুরুষ-ও ভালো লাগেনি আমার, আবার অতি--সাবালক পুরুষ-ও পোষাকী স্বামীই হ'তে পারে; অন্তর যেমন শূন্য তেমন শূন্যই থাকে।......একদিন সময় ক'রে আসবে কি?"

একদিন সময় ক'রে যেতে বলার লাইনটি জীবনকৃষ্ণকে নরম করেছে। জীবনকৃষ্ণ ভাবলো নটবর বোধ হয় অনুগত স্বামী হ'তে পারছে না। পুষ্পকে সে অন্ন-বস্ত্র, সহায়-সম্বল ইত্যাদি যাবতীয় গৃহ-উপকরণে অলংকৃতা করেছে কিন্তু তার মধ্যেকার অধিকার-বিস্তারিণী রমণীটি খুশি হচ্ছে না। তবে কি নটবর অনন্যগতি নয়?

চিঠিখানা পাওয়ার তিনদিন পরে আবার একখানি চিঠি এলো জীবন-কৃষ্ণের নামে। পুষ্পকণারই লেখা। লিখেছে, যতোই অনিচ্ছা থাক্, একবার

চেষ্টা ক'রে-ও যেনো সে পুষ্পের সঙ্গে আধঘণ্টার জন্যেও দেখা করে। বিশেষ কথা আছে।

চিঠি অর্থাৎ এই দ্বিতীয় চিঠি পেয়ে জীবনকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করার জন্য উন্মুখ হ'লো এবং সাক্ষাৎ করলো। সেদিনটা রবিবার। জীবনের ইস্কুলেব ছুটি। পুষ্পকণার বাড়ি গিয়ে জানলো নটবর কণ্ট্রাক্টারির কাজে কাল গেছে দমদমে না ব্যারাকপুরে, তিনদিন ফিরবে না। এরকম অনুপস্থিতি তার হামেশাই ঘটে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। জীবন পুষ্পকণার শোবার ঘরে কোচে ব'সে তার সঙ্গে কথা বলছিলো। আরো এক ঘণ্টা থাকা চলে তার। তারপর ভবানীপুরে ফিরতে হবে। পুষ্পকণা জীবনকে দুপুরে যা খাইয়ে দিয়েছে তাতে রাত্রিতে আর জীবনকে খেতে হবে না। বেশি খাওয়ানোর জন্য অনুযোগ করছিলো জীবন। বলছিলো, "সাধারণ মেয়ের মতো 'খাও, খাও; মাথা খাও' এই ধরণের পরিচয় তো তোমার পাইনি আগে?"

"আমি কি 'মাথা খাও' বলেছি নাকি?"

"সে-ভাষাটি বলো নি। কিন্তু সেই ভাবেই খাইয়েছো।"

"ভয় নেই, অসুখ করবে না।"

"করলেই বা করছি কী?"

"আমি দায়ী।"

"তুমি তো আমার সব কিছুর জন্যই দায়ী।"

"তাই নাকি?"

তারপর কথা থেমে গেলো। দু'জনেই চুপ ক'রে রইলো। পরে কথা শুরু করলো জীবনকৃষ্ণই প্রথমে। বললো, "নটবরবাবু তোমাকে একলা ফেলে যান ব'লে তোমার অসুবিধে হয় না?"

"একলা মাঝে মাঝে থাকতে পাই ব'লে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"কেন, তিনি কি খুব জবরদস্ত আদায়ী মানুষ?"

"যে-সুরে কথাটা বললে, তাতে বাঁকা ভঙ্গি আছে। না। সে-বিষয়ে তিনি অত্যাচারী পুরুষ নন। অবশ্য তার কারণ আছে।"

"কেন?" তোমাকে ভয় করেন?"

"না। তিনি এক পুকুরে, একটি মাছের আশায় ছিপ হাতে মশা খেয়ে ব'সে থাকার মানুষ নয়।"

"তোমার কথা তো বদলেছে পুষ্প?"

"বিয়ে করলে বদলায়। কণার-ও বদল হ'য়েছিলো।"

"আমার?"

"কথার বিশেষ হয় নি।"

"তবে?"

"বদল হ'য়েছে বৈ কি।"

ক্রমে রাত্রি আরো ঘনীভূত হচ্ছে। চাকর-দাসী যে-যার কাজ সেরে আড্ডা দিচ্ছে নিচের তলায়। উপরে তারা আসবে না আর। তা ছাড়া এই শোবার ঘরে তো নয়ই। কথাটা বলার কারণ আছে।

পুষ্পকণা আজ এতোক্ষণে মনের মধ্যে একটা বেহিসেবী প্রবৃত্তিকে পাকিয়ে তুলেছে। কিছুদিন হ'লো সে বুঝেছে যে কণার মতো সে-ও মা হ'তে চলেছে। বিশ্রী লেগেছে তাতে। নটবরের ছেলেকে গর্ভে ধরতে ইচ্ছে যাচ্ছে না তার। এই বিরক্তি বড়ো অদ্ভুত। আমাদের সংসারে স্বামীর সন্তানকে গর্ভে ধারণ ক'রে অসুখী বোধ করে এমন মেয়ে ক'জন আছে জানি না। তা ছাড়া এ-সংসারে অর্থাৎ এই পরিবারে অর্থের অভাব যখন নেই। কিন্তু পুষ্প ছেলে চায় না। ছেলে চায় না নাকি কয়েকজন শিক্ষিত মেয়েই। আজকাল। কি জানি? সঠিক খবর কোনো খবরের কাগজে লিখলেও বিশ্বাস হ'তে বাধা আছে। ও-খবরের খবর-কাগজ নেই ব'লে।

পুষ্প জেনেছে এবং বন্ধু সবিতার সঙ্গে কথা ব'লে স্থির-নিশ্চিত হ'য়েছে যে নটবর শহরের সাধারণ স্ত্রীলোকদের কাকে-ও বা মধ্যে মধ্যে আপ্যায়িত করে। গণিকাসক্তির কথা শিক্ষিতা মেয়েরা বেশি বলা-কওয়া করে না। সেকালের হিন্দু অন্তঃপুরিকা মেয়েরা একথা অনায়াসে আলোচনা করতো। পুষ্প বিশেষ বুঝতে-ও পারে না এসব ব্যাপার। তবে যুবতী শিক্ষিতা মেয়ে সে। দুনিয়া জুড়ে নারী দেহের পণ্য যে একটা রীতিমতো চলে সে-খবর সে জানে বৈ কি। তবে খবর জানা মাত্র। তার বেশি নয়।

একবার একটি সোনার হার কিনে এনে নটবর রেখেছিলো টেবিলের

টানায়। পুষ্পকণা সেটি দেখে জিজ্ঞাসা করলো সেটি কার জন্য। নটবর বললো তার এক বন্ধুর ভগিনীর বিয়েতে উপহার দেবার জন্য। বন্ধুটির নাম জানতে চাইতেই সে যার নাম করলো, তার যে বোন নেই এবং তাকে যে পুষ্পকণা জানে, সবিতাদের বাড়ি জেনেছে এক চা-চক্রের দিনে;—নটবর তা জানলো না। তা ছাড়া পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সহবাস ক'রে মেয়েমানুষ স্বামীকে অন্যগতি কিনা বুঝতে পারে বৈ কি। বঙ্কিমচন্দ্রের সরলাবালা ভ্রমর-ও যদি রোহিণীর মাথা মুড়িয়ে দিতে চায়, তবে পুষ্পকণা নটবর তিনদিন বাইরে থাকার পর চতুর্থ দিনে রাত্রিতে কামালিঙ্গন দিলে বুঝতে পারে বৈ কি। সামান্য চা খাওয়ার ব্যাপারটাই ধরা যাক্ না কেন। প্রত্যহ চা খাই অভ্যাসে। একদা ক্লান্ত দেহে চা খাই সাগ্রহে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমিক স্বামীর প্রতিটি সহবাসই তো সাগ্রহ। তবে নটবরের বারে বারে স্পৃহা আর স্পর্শ, আগ্রহ আর আদর, আরতি আর রতি এতো বিভিন্ন হয় কেন? পুষ্পকণা বাৎসায়ণ পড়ে নি। এলিস-ও পড়েনি। কিন্তু সে কামিনী, রমণী।

ঢং ঢং ক'রে আটটা বাজলো। নিচে গিয়ে পুষ্পকণা চাকরদের বিশ্রাম নিতে বললো। বললো, "জামাইবাবু যখন যাবেন, তোদের ডেকে দেবো, দরজা বন্ধ করবি।"—ইত্যাদি।

পুষ্পকণা জীবনকৃষ্ণের চোখে চাইলো। বললো "আমাকে ক্ষমা করতে পারো?"

"কি জন্য? কী অপরাধ?"

"অনেক অপরাধ। তোমাকে বুঝতে পারিনি। তোমাকেই বিয়ে করা উচিত ছিলো আমার। কণার প্রতি অবিচার করেছি। সব চেয়ে অবিচার করেছি তোমার উপর।"

"না। আমি যদি যথেষ্ট পুরুষ হতুম, তা হ'লে এ-ভুল হ'তো না।"

"বলো, বলো। আবার বলো। তুমি ঠিক বুঝতে পারছো। ইস্, এই বুদ্ধি যদি তখন থাকতো তোমার।"

"আমি যে বত্রিশে বাইশ ছিলুম। কেউ কেউ তা থাকে। সাইকলজিতে বলে।"

"সাইকলজি থাক্। একটা কথা বলবো?"

"শুনতে পারি।"

"তুমি আর আমি জেনে-শুনে একবার যদি অনাচার করি, তাতে কি দোষ হয়?"

কথাটায় জীবনকৃষ্ণ একেবারে সাততলা থেকে গভীর নিচে প'ড়ে গেলো। কোনো উত্তর দেবার কথা মনে এলো না তার। পুষ্প আবার বললো, "অপরাধ হবে না। নটবর বেশ্যার বাড়ি যায় মধ্যে মধ্যে। অনেক পয়সা দিয়ে নাম-করা মেয়েদের কাছে যায় সে। সে তো সত্যবান নয়। তবে আমি যদি সাবিত্রীটি না হই তাতে দোষ কী?"

আশ্চর্য! একি সেই পুষ্পকণা? জীবন কোনো উত্তর দিতে পারলো না। কিন্তু পুষ্পর এই অসম সাহস তাকে বিব্রত করলো। পুষ্পকণাই আবার কথা বললো। সে বললো, "ভয় নেই; কোনো গোলমাল হবে না। পেটে ছেলে এসেছে। কোনো গোলমালে পড়তে হবে না তোমাকে। আমাকে-ও।"

ছি, ছি, ছি। জীবনকৃষ্ণ তাজ্জব ব'নে গেলো। ভাবলো এলায়িত-কুন্তলা রমণীকুল শিথিলিতচিত্তা কামিনী হ'য়ে উঠলে কি রোহিনীর মতো জলেই ডোবে না? গোবিন্দলালকে ভূমিপাতিত করে?

জীবনকৃষ্ণের মুখে কথা এলো না এখনো। এক সময় পুষ্প এসে তার মুখে, চোখে, কপালে, গালে উত্তপ্ত চুম্বনে তাকে জর্জরিত করলো। তারপর কখন যে জীবন বিছানায় এসে পড়েছে জানতে পারলো না সে নিজে। হুঁস হ'লো যখন পুষ্পকণা হঠাৎ উঠে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে হঠাৎ এতোখানি শিথিল বেশে শুয়ে প'ড়ে তাকে সবলে চেপে ধরলো যাতে জীবনকৃষ্ণ জেগে উঠলো।

হয় বৈ কি। এমন হয়। হঠাৎ তন্দ্রা যেমন আসে, হঠাৎ জাগরণ-ও তেমনি ঘটে। জীবনকৃষ্ণ সজোরে পুষ্পকে ছুঁড়ে ফেলে দোর খুলে তড় তড় ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো। সে দেখতে পেলো না দাসী তখন কী মস্করা করছে পাচকের সঙ্গে সাদরে।

দাসী উপরে এসে দেখলো, গৃহিণী দুহাতে মাথা রেখে চেয়ারে

বসেছেন। বললো, "মা, জামাইবাবু চ'লে গেলেন। কী হ'য়েছে মা?"

"ঝগড়া। আমার বোন কণার সম্পর্কে যা-তা বলতেই আমি রেগে তাড়িয়ে দিয়েছি। তুই যা। তোরা শুতে যা। আমি শুয়ে পড়ছি।"

পুষ্পকণার উপস্থিতি বুদ্ধিকে প্রশংসা করবে কে? কেন, সকলেই। অন্ততঃ অনেকেই। অন্ততঃ কেউ কেউ। যারা এই রকম ফাঁপরে পড়ে, তারা।

ক'জন এরকম ফাঁপরে পড়ে? কি জানি। পুষ্পকণার এই কাহিনী বোধহয় না লিখলেই ভালো হোতো। যা নির্ঝঞ্ঝাটে মন আমাদের পাঁচজনের।

বাণী হালদার ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধানা শিক্ষিকার কাজ নিরুদ্বেগেই ক'রে যাচ্ছিলো। ঝঞ্ঝাট কিছুই ছিলো না। ইস্কুলের কর্মকর্তারা মধ্যে মধ্যে সভার অধিবেশন ডাকতেন। দপ্তরী কাজকর্ম প্রধানতঃ বিশ্বস্ত কর্মচারীর উপর রেখে পরম নিশ্চিন্তে বাণী হালদারের উপর ইস্কুলের যাবতীয় ভার দিয়ে গতানুগতিক দিন যাচ্ছিলো তাঁদের। কিন্তু সম্প্রতি এক গোলোযোগ উপস্থিত হ'তেই ইস্কুলের সম্পাদক চঞ্চল হ'য়েছেন এবং দু-একজন সদস্যকে ব্যাপারটি জানিয়েছেন।

ব্যাপার এমন কিছু নয়। শ্রীমতী বাণী হালদার এম. এ-ইন্-এডুকেশন শহরের একটি যুবককে নিয়ে কলকাতায় সিনেমা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিঁড়িয়াখানা, শিবপুরের বাগান ইত্যাদি স্থানে ঘোরা-ফেরা করছেন বেশি-রকম নজরে পড়বার মতো। তার ফলে ইস্কুল কামাই হচ্ছে। সহকারিণী প্রধানা শিক্ষিকা সম্পাদককে তাঁর বাড়ি ব'য়ে গিয়ে সকল সমাচার সবিস্তার জানিয়েছেন। ইস্কুলের বড়ো বড়ো মেয়েরা-ও নাকি কানাঘুসা করে এই নিয়ে।

বাণী এম. এ. পাশকরা একক জীবনের মেয়ে। তার স্বাধীন চলা-ফেরায় এতো অস্বস্তি পাওয়ার কী আছে? তবে ইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্ ব'লেই হোক্, আর স্বভাবতঃ মানুষ রক্ষণশীল ব'লেই হোক্, বাণী হালদারের এই হালচাল শহরের অনেকেরই আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো।

যে-যুবকটি দ্বিতীয়-পক্ষ, তার বয়স বাণীর চেয়ে দু-বছর কম। পাশাপাশি দাঁড়ালে তাকেই ছোটো আকারের দেখায়। ছেলেটি উত্তর কলকাতার কোন্ এক ইস্কুলে বাঙ্‌লা পড়ায়। বাঙ্‌লায় সে সেকেন্ড্-ক্লাস এম. এ। বাড়িতে প'ড়ে ইংরেজিতে এম. এ. দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস পাবার বাসনা তার বরাবরই। কিন্তু হ'য়ে উঠছে না। অথচ একটার পর একটা বছর পার হ'য়ে

ছেলেটির নাম শ্রীকুমার। তার বোন অমিতা, বাণী হালদারের ইস্কুলে পড়ে।

দশম শ্রেণীর ছাত্রী। অমিতার আগ্রহেই বাণী তাদের বাড়ি আসে। প্রথম দুদিন যাতায়াত করবার পরই শ্রীকুমারের সংগে বাণীর বেশ সহজ মেলামেশা হ'য়ে গেলো। বাণী দেখলো শ্রীকুমার অনেকগুলি ভাই-বোন আর বাপ-মায়ের পরিবারে বাস ক'রে-ও বেশ একটি উপনিবেশ রচনা ক'রে নিয়েছে নিজের চারপাশে একটি স্বাতন্ত্র্যের নিরালা সৃষ্টি ক'রে। শ্রীকুমার সুধু এম. এ. নয়। রীতিমতো পড়ে সে। নানান্ সাহিত্য গ্রন্থ তার দুটি আলমারিতে ঠাসা। খুব তাড়াতাড়ি ভারি ভারি বই প'ড়ে শেষ করতে সে পটু। এমনকি, হাক্স্‌লির দার্শনিক গ্রন্থখানাও পড়ে ফেলে সে বেশ ত্বরিত গতিতে।

বাণী হালদার অতোশতোর ধার ধারে না। তবে পুরুষ মানুষের এই বিদ্যানুরাগ বাণী হালদারকে টানলো। অন্ততঃ শ্রীকুমার তাকে আকর্ষণ করলো। অবশ্য তার কারণ শ্রীকুমারের বিদ্যানুরাগ, না, বাণীর প্রতি সানুরাগ মনোযোগ—তা জানি না। শ্রীকুমার যতো কথা বলতো, যতো সাহিত্যের কথা বলতো, তার মধ্যে বিলিতী উপন্যাস-গল্পের কাহিনীগুলিই বেশি ক'রে আলোচনা করতে চাইতো বাণী।

বাণী এম. এ। অথচ পড়াশুনা নেই বললেই হয়। শ্রীকুমার-ও এম. এ; অথচ বিস্তর পড়াশুনা। শ্রীকুমার বিদ্যা জানাতে চায়, বাণী মনোযোগ পেয়ে খুশি হয়। বেশ জ'মে গেছে ওদের প্রীতি-পরিচয়।

উপন্যাসের কোনো কাহিনীর কামনা-বাসনার পর্যায়টি যখন আলোচনায় এসে পড়ে তখন শ্রীকুমারের চোখ চক্ চক্ করে, মন বক্ বক্ করে। বাণী কী যেনো একটা আকর্ষণ পায়। শ্রীকুমার বয়সে ছোটো ব'লে আক্ষেপ হয় মনে।

শ্রীকুমারের বাবা একটা চটকলের বড়োবাবু। সৎ ও অসৎ উপায়ে রোজগার বেশ ভালোই। অবস্থা সত্যিই যতোটা সচ্ছল, আহার-বিহারে পরিবার সে-সচ্ছলতা দেখায় তার চেয়ে কম। কিছুটা পরিচয় হওয়ার পরই বাণী হালদার বুঝলো শ্রীকুমার বিত্তহীন তো নয়ই, বরং স্বল্পবিত্ত বললেও ঠিক বলা হয় না। তবে ভাই-বোন তার অনেকগুলি।

এ-হেনো শ্রীকুমার আর এ-হেনো বাণী হালদার সেদিন শিবপুরের বাগানে পদ্মদিঘির ধারে ব'সে ব'সে গল্প করছিলো। অনেক রকম গল্পই

হচ্ছিলো তাদের। এক সময় শ্রীকুমার বাণীকে জানালো যে, তার এতো মাথা ধরেছে যে আর সে ব'সে থাকতে পারছে না। অতি সহজেই বাণী তখন শ্রীকুমারকে শুতে বললো কুসুমে আস্তীর্ণ তৃণভূমিতে; আর অতি সহজেই শ্রীকুমারের পীড়িত মাথা বাণীর সুকোমল কোলে আশ্রয় পেয়ে অশেষ স্বস্তি লাভ করলো।

এ-রকম দৃশ্য শিবপুরের বাগানে অনেক ঘটে। এর চেয়ে ঘোরালো, এর চেয়ে ঝাঁঝালো দৃশ্য-ও এই উদ্ভিদ্-বিদ্যানিকেতনে হামেশা নজরে পড়ে। তবে যারা দৃশ্য রচনা করে আর যারা দৃশ্য দর্শন করে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিচিত, অনাত্মীয়। বাণী ও শ্রীকুমারের এই ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যটি যদি বাণীর ইস্কুলের সম্পাদকের বড়ো মেয়ে তার সঙ্গীসহ দেখে ফেলে, তবে দোষ কি এ-রঙ্গের নট-নটীর, না, দর্শকের? সম্পাদকের কন্যা তার মাসীর বাড়ি গিয়েছিলো শিবপুরে। মাস্তুতো ভাই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। সে নিয়ে গিয়েছিলো বরুণাকে বাগানে বেড়াতে। দূর থেকে বাণী হালদারকে দেখেই বরুণা মাসতুতো ভাই ভূপেশকে বললো, "জানো ভূপেশদা, ঐ যে দুজন সখা-সখী ছায়ায় বিশ্রাম করছে, ঐ যে ছেলেটির মাথা মেয়েটির কোলে, ঐ মেয়েটি কে জানো? উনি আমাদের ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা।"

অনেক পূর্ব থেকেই বাণী ও শ্রীকুমারের ব্যাপার মেয়েদের মহলে কুৎসাকাহিনীর রসবস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। আজ শিবপুরের বাগানে এই দৃশ্য বরুণাকে ইস্কুলে গিয়ে অনেক গল্প রচনা করবার খোরাক দিলো।

শহরের আরো কেউ কেউ আরো কিছু কিছু জমকালো খবর দিয়েছে। কবে এক শনিবারে ওদের দুজনকে ভবানী বিদ্যালয়ের কর্মচারীর পুত্র শ্রীমান্ নিতাই কলকাতায় টাইগার সিনেমায় পাশাপাশি ব'সে ছবি দেখতে দেখেছিলো এবং ছবি দেখার পর ঘটনাক্রমে একই রেস্তোরাঁয় ওদের দেখা হয়েছিলো চা খেতে গিয়ে। অবশ্য নিতাইকে ওরা দেখতে পায় নি। দেখতে পেলে ওরা হয়তো খেতে বসবার আগেই অন্য রেস্তোরাঁয় চ'লে যেতো। কেননা, শ্রীকুমার নিতাইকে না চিনলে-ও বাণী নিতাইকে চিনতো।

নিতাই দেখলো ওরা পরদা-দেওয়া আড়ালে খেতে গেলো। নিতাই

বসলো বাইরে একখানা চেয়ারে। চাকর এসে যখন নিতাইকে জিজ্ঞাসা করলো কী খাবার চাই, নিতাই তখন 'বলছি' ব'লে একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হ'লো। কিছু পরে ব্যস্ত চাকর আবার কাছে আসছে দেখে নিতাই উঠে প'ড়ে বাণী-শ্রীকুমারের কামরার দিকে এগোলো। ক্ষণমাত্র থমকে দাঁড়িয়েই নিতাই হাতের আধ-খাওয়া সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতোতে চেপে চট্ ক'রে পরদা সরিয়েই কক্ষে প্রবেশ ক'রে যা দেখলো তাতে তার রসনা-কণ্ডূয়ন অত্যন্ত বেশি হ'তে থাকলো। বলতে ইচ্ছে করলো, "বা বা দিদি, তোফা আছো।"

নিতাই ফাজিল। নিতাই বেকার। নিতাই কেরাণী বাপের অকাল-কুষ্মাণ্ড ছেলে। বাপ যে আশী টাকা রোজগার করে, তাই থেকে মাকে ভুলিয়ে পয়সা নিয়ে সিনেমা দেখে, চা-চুরুট ফোঁকে, আড্ডা-ইয়ার্কি দেয়। অবশ্য কেরাণী হরিহরবাবুর পাকিস্তানে এখনো জোত-জমা যা আছে, তার আয়ের অংশ কাকার কাছ থেকে নিতাই বেশ কিছু আদায় ক'রে আনে। বাপকে জমা দেয় যতো, কাকা তাকে দিয়ে থাকে তার বেশি। নিতাই দেখে ফেললো বাণী শ্রীকুমারকে ঘন ঘন গোটা কয়েক চুমু খেয়ে ফেললো। নিতাই-এর ইচ্ছে ছিলো সংখ্যাটা গুণে ফেলে মনে রাখে, যাতে গল্প বাস্তববাদী হ'তে পারে। কিন্তু বিহ্বল দর্শক দৃশ্যের খুঁটিনাটি দেখতে হুঁস রাখতে পারে নি। নিতাইকে দেখেই বাণী চমকে গেলো। নিতাই-ও অমনি সেখান থেকে স'রে গিয়ে বাইরের চেয়ারে থপ্ ক'রে ব'সে প'ড়ে ব'লে উঠলো, "বয়্, দুটো চপ্ আর এক কাপ্ কড়া চা দাও তো।" কথাটা ওখানে নিরালা ঘরে বাণীর কাণে গেলো।

ইত্যাদি ইতর-বিশেষ খবরে বাণী-শ্রীকুমার সংবাদ ভবানীপুরের ভবানী বালিকা বিদ্যালয় মহলে বেশ সর্গরম্ হ'য়ে উঠেছে। বাণী হালদার তাতে ভড়্কায় না। কেন না, এটা বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক অতিক্রম ক'রে যাওয়া যুগ।

কলকাতা শহরে এমন কাণ্ড, এর চেয়ে গুরুতর কাণ্ড, গুরুতম কাণ্ড-ও কতো ঘটে। কিন্তু সেখানে, লক্ষ লক্ষ লোকের জনতায় দু-একজনের জনান্তিকের এই প্রীতিজয়গান জগঝম্পের কলরব তোলে না আর সকলের

মনে। সেখানে পরস্পরে এতো কাছাকাছি যে, একে অন্যকে সবটা দেখতে পায় না। কিন্তু ভবানীপুরের মতো গ্রামধর্মী ছোটো শহরে গ্রামের নিভৃতি-ও আছে, আবার শহরের স্বাতন্ত্র্য-ও এসেছে অনেকটা। আমি যা-ই করি না কেন, তোমার তাতে কী?—এ-মনোভাব ভবানীপুর মুখে কেউ কেউ বললে-ও মনে কেউ এখনো বলে না। এখনো একের দুষ্কর্ম অন্যের শিরঃপীড়ার কারণ না হ'লে-ও রসনা-কণ্ডুয়নের হেতু হয়-ই। তা ছাড়া বাণী হালদার এম. এড্. যে ইস্কুল-মিস্ট্রেস্। হেড্‌মিস্ট্রেস্। দেড়শো টাকা মাইনে দিয়ে তাকে যে পবিত্রতার নিষ্কলঙ্ক মূর্তি হওয়ার দাসখৎ লিখে দিতে হ'য়েছে। ইস্কুলের মেয়েদের যাবতীয় নৈতিক বিচ্যুতির সম্ভাব্যতার দায়িত্ব যে তার উপর সমাজ ন্যস্ত করেছে। কোথায় সমাজ? মুশ্‌কিলের কথা। সমাজ কোথাও তো নেই। আপাততঃ এই ব্যাপারটির জন্য যে-সমাজ, তার ঠিকানা হাওড়া জিলার ভবানীপুর শহরের পশ্চিম প্রান্তে আধ মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া একখণ্ড বঙ্গভূমি, যে-ভূমি শিক্ষিত বাঙালী, মধ্যবিত্ত অর্থাৎ নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর বাসভূমি।

কানাঘুসা বাণী হালদারের কাণেও আসতে আরম্ভ করেছে, তখন একদিন শনিবারে ইস্কুল ছুটির পর সহকারিণী তটিনী রায় তাকে মেয়েদের বাথ্‌রুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। দেয়ালে লেখা অর্থাৎ অশ্লীল লেখার রোগ ছেলেদের ইস্কুলে, কলেজে, অফিসে, রেলগাড়িতে, সরকারী পায়খানা ও প্রস্রাবখানা ইত্যাদিতে চিরকালই অজস্র ও সহস্র ভাষাবিন্যাসে অলঙ্কৃত ও কলঙ্কিত। মেয়ে-ইস্কুলে বা মেয়ে-কলেজে নাম লেখে মেয়েরা, দুটি মেয়ের নাম-ও লেখা দেখা যায়, অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়ে চাপা ভাষায় কখন-কখন দু-একটা লেখা নাকি কারো কারো নজরে পড়েছে। ভবানী বিদ্যালয়ে এযাবৎ এ-রকম লেখা কিছু ছিলো না, নাম ইত্যাদি শ্রাব্য লেখায় কিছু কিছু দাগাদাগি দেয়ালে থাকলে-ও। বাণী হালদার দেখলো লেখা আছে, "শ্রীকুমারের মুখখানিতে শত চুম্বন দিলাম।—ইতি রাণী।" বাণী রাণী হ'লো কেন বাণী বুঝলো না। তটিনী রায় লেখা মুছে দিলেন ইস্কুলের ঝি-কে দিয়ে। বাণী হালদার গম্ভীর হ'য়ে গেলো। সেদিন তার বাড়ি ফিরতে দেরি হ'লো।

বাড়ি ফিরে বাণী চা খেলো। স্টোভ জেবলে চা খেয়ে একবার বাণী ভাবলো জীবনকৃষ্ণের বাসায় যায়। দ্বিধা করলো। কণিকা নেই, পুষ্পকণাও আর আসে না। পুষ্পকণার কথাটা মনে হ'তেই তার বিবাহিত জীবনটার কথা মনে এলো। ক্ষোভ হ'লো বাণীর। কেমন সবাই একে একে বিয়ের বর জুটিয়ে নিলো, কেবল সে-ই প'ড়ে রইলো। দেখতে নাকি সে ভালো নয়। কিন্তু তার চেয়ে দেখতে খারাপ যে-সব মেয়ে, তাদের-ও তো পাত্র জোটে; অনেকের আবার সুন্দর সুপাত্র-ও জুটে যায়।

জীবনকৃষ্ণ তখন সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে একখানা ইংরেজি বই পড়ছিলো বটে, কিন্তু মনটা বইতে বসছিলো না। পুষ্পকণার শেষ পর্ব বারংবার মনে আসছিলো। এক-একবার মনে হচ্ছিলো সে কী বোকা: অনায়াসেই মেয়েটাকে ভোগ করতে পারতো। কিন্তু কী লাভ হ'তো তাতে? নারীসম্ভোগ তো জানে সে। অবশ্য পুষ্পকণাকে ভোগ করলে সুধু নারী-মাংস রমণ করা ছাড়া একটি বিশেষ রমণীকে সর্বাঙ্গ দিয়ে পাওয়ার সার্থকতা থাকতো। রামোঃ, ওকে বলে সার্থকতা? কিচ্ছু না। মাত্র কিছুক্ষণের ভ্রান্ত বিলাস। স্ত্রী কণিকার সঙ্গে-ও ভোগ করায় সুখ পায় নি সে। ভোগে সুখ পাওয়ার মতো পুরুষকার তার ছিলো না—এমন কথা সাম্প্রতিক পুষ্পকণা বলবে। কিন্তু তা নয়। জীবনকৃষ্ণ এতোদিন অত্যন্ত তামসিক ছিলো। এখন কিছুটা প্রাণনা তার চিত্তে আসায় তার এই সব বিষয়ের চিন্তা একেবারে যা-তা। তার না আছে ইতর, না আছে বিশেষ। সে এখনো নাবালকত্ব কাটিয়ে বয়ঃসন্ধির বোকামিতে ব্যস্ত-ব্যাহত।

যাই হোক, এ-হেনো সময়ে বাণী হালদার জীবনের ঘরে এসেই বললো, "কী করছেন মশাই?"

"আসুন, আসুন; বসুন।"

"এই বসলুম। তারপর? খবর কী?"

"ভালো। আপনার?"

"খুব ভালো। শোনেন নি?"

"না তো। কী? কী খবর?"

"কেন, শহরময় তো ঢি ঢি।"

"কাকে নিয়ে?"

"কেন? আমাকে? আমি এবং শহরের এক যুবক শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় খুব প্রণয়-হুল্লোড় ক'রে বেড়াচ্ছি। এমন কি, ইস্কুলের মেয়েদের নাকি নৈতিক স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছি।"

"শ্রীকুমারকে পরোক্ষে চিনি। সে তো বাগবাজারের এক ইস্কুলে বাঙ্‌লা পড়ায়?"

"হ্যাঁ, তাকে আর আমাকে নিয়ে শহরের মাথাব্যথা। ওর বোন আমাদের ইস্কুলে পড়ে। সেই সূত্রে ওদের বাড়ি যেতুম। ক্রমে ওর সঙ্গে আলাপ হ'লো।"

"ওর ওর বলছেন কেন? তবে তো রসেছেন দেখছি।"

"এ আবার কী ভাষা? আপনি তো আগে এমন ছিলেন না?"

"আমি এখনো কেমনতরো হ'য়ে যাই নি। ভাষাটা তো অত্যন্ত শ্লীল। 'রস' শব্দটি শিল্পতত্ত্বে কুলীন। ওর মর্যাদা যারা হানি করে তারা ইতর।"

"পুষ্পকণার খবর কী?"

"বর নটবরে ভাসমান।"

"আপনি এইখানেই থাকবেন? একা?"

"সঙ্গীর অভাবে একা না থেকে উপায়? তবে আপাততঃ আপনি সঙ্গী।"

"আবার বিয়ে করুন।"

"বিধবা-বিবাহ?"

"মানে?"

"মানে, বিপত্নীক তো। তাই বললুম। আচ্ছা আপনি বরাবর বাণী হালদার এম. এ.—এই ব'লে নাম লেখেন কেন? মিস্, মিসেস্, কুমারী, শ্রী, শ্রীমতী— এ সব কিছুই লেখেন না। এম. এড্ পড়বার সময় অনেকে এই নিয়ে বলাবলি করতো। বলতো কেউ কেউ—"

"বলতো আমি বিধবা। সত্যিই বলতো। বাল্যকালে বিয়ে হ'য়ে, ছ'মাস বাদে বিধবা। বাবার বন্ধুর আশ্রয়ে মানুষ হ'য়েছি। নিজেকে

বিবাহিতা স্বীকার করতে আমি রাজি নই।"

"সত্যিই আপনার বিয়ে হ'য়েছিলো?"

"হ্যাঁ। তবে সে কোন্‌কালে। আমার মনে নেই। গ্রামে থাকতে বিয়ে হয়। সে ঊনবিংশ শতকে বলতে পারেন।"

"শ্বশুর কুলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই? ছিলো না?"

"কোনো কালে নয়। আমার জ্ঞানতঃ নয়। বাবার বন্ধুর মুখে শুনেছিলুম, তাঁদের বংশের সকলে ছন্নছাড়া, ঠাঁইনাড়া, এদেশ-সেদেশে বিচ্ছিন্ন। আর আমার বিয়ের সময় বয়স ছিলো ন-বছর। বর ছিলেন তেরো।"

"বেশ গল্প তো।"

"বাবার বন্ধুটি যখন মারা গেলেন, আমি তখন বি. এ. পাশ ক'রে বি. টি. পড়ছি। ভাই আর বোন ছেলেমানুষ। ভাইটি ম্যাট্রিক পাশ করেছে সবে।"

"কিছুই জানতুম না। এতো কষ্ট ক'রে মানুষ হ'য়েছেন আপনি? অথচ ক্লাসে সকলে কতো কথাই না বলতো।"

"তা বলবে বৈ কি। মেয়েমানুষ বাইরে বের হ'লেই কথার আর অন্ত থাকে না। আমাদের পুরুষগুলো এখনো মানুষ হ'লো না।"

"আমি-ও পুরুষমানুষ।"

"মেয়েমানুষের সঙ্গে যে-সব পুরুষ এম. এ. পড়ে, আমি তাদের ধ'রে বলিনি কথাটা।"

"তারপর? বাবার বন্ধু মারা গেলে বড়োই ফাঁপরে পড়লেন তো ভাই বোন নিয়ে?"

"নিশ্চয়ই। বাবার বন্ধুর বাড়ি থেকে চ'লে এলুম। বাবার বন্ধুর স্ত্রী—তাঁকে কাকিমা বলতুম—থাকতে বলেছিলেন।"

"লোক ভালো তো!"

"খুব ভালো লোক। কিন্তু আমি একটা বাসা ভাড়া ক'রে রইলুম। সুবিধে এই ছিলো যে, বাবার বন্ধু অর্থাৎ কাকাবাবু মৃত্যুকালে আমার হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন।"

"আশ্চর্য উদার মানুষ তো।"

"হ্যাঁ। নিজের দু-হাজার আর আমার বাবার গচ্ছিত-রাখা তিন হাজার।"

"আপনার মা কি আপনার ছেলেবেলাতে মারা গিয়েছিলেন?"

এই কথায় বাণী হালদার একটু স্তম্ভিত হ'লো। অর্থাৎ তার অনর্গল-বলা আত্মকাহিনী কথনস্রোতে যেনো উপহত হ'য়ে থমকে গেলো। কিছুক্ষণ সে কোনো কথা বললো না। তারপর বলে গেলো পুরা কাহিনী।

পুরা কাহিনীর যে-টুকু আমাদের দরকার সেটুকু এই যে, বাণীর বাবা নারাণ চৌধুরী একদা অফিস-ফেরৎ ঘরে এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী আফিম্ খেয়ে আত্মহত্যা ক'রে প'ড়ে আছে। বাণী হালদার জীবনকৃষ্ণকে বললো যে তার বাবা-মা খুব কলহ করতেন মধ্যে মধ্যে। ওর বেশি বিরাগ-বিতৃষ্ণার কারণ সে কিছু মনে করতে পারে না। তবে মায়ের আত্মহত্যার দিনটা, ক্ষণটা, পরিবেশটা, প্রভাবটা সে এখনো মনে করতে পারে।

সেদিন অনেকক্ষণ ওদের কাটলো। বাণী হালদার প্রকৃতিতে মোহনীয়া মেয়ে আদৌ না হ'লে-ও তার জীবনকাহিনীর পুরাবৃত্ত শুনে অবধি জীবনকৃষ্ণ আর-এক বাণীকে দেখতে পেয়েছে। কষ্ট পেয়ে, দুঃখ সহ্য ক'রে, ভাই-বোনকে মানুষ ক'রে, লেখাপড়া ক'রে এম. এড্ পাশ ক'রে, পোড় খেতে খেতে বাণী হালদার যে প্রকৃতিতে বেঁকেচুরে খানিকটা যাবেই, সেকথা জীবনকৃষ্ণ কিছুটা বুঝলো বৈ কি। জীবনকৃষ্ণ-ও যে ধাক্কায় আহত-প্রতিহত হ'য়ে ধস্তা-ধস্তি ক'রে জীবন চালিয়ে এসেছে। তাতেই না তার স্বভাবে তামসিকতা, অসাড়তা, নির্জীবতা এতোখানি অধিকার পেয়েছিলো। নচেৎ পুষ্পকণা তাকে যতোই কম-পুরুষ মনে করুক না জীবনকৃষ্ণ-ও পুরুষ। তার-ও শক্তি কিছুটা আছে। তা ছাড়া পুষ্পকণাই কি আশু একটা মেয়েমানুষ? যাক্ সে কথা।

পরদিন সকাল আটটার সময় বাণী এলো জীবনকৃষ্ণের কাছে। জীবনকৃষ্ণ তখন ব'সে ব'সে ছেলেদের সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতা দেখছিলো। বাণী আসতেই খাতা দেখা বন্ধ ক'রে জীবনকৃষ্ণ দ্বিতীয়বার চা করতে বললো তার চাকরকে। যতোক্ষণ চাকরটি চা করছিলো, ততোক্ষণ বাণী একথা-ওকথায়

সময় নিচ্ছিলো। কেননা, বেশ কতকগুলো গুরুতর কথা তার মনে ঘুর্ণী ঘুরছিলো। সেই জন্য কথা বলছিলো সে থমকে থমকে। জীবনকৃষ্ণ-ও ধীরে বাক্যালাপ করছিলো। কেননা, বাণীকে সামনে দেখে সে তার পূর্বকথিত কাহিনীর চাপটা চিত্তে অনুভব করছিলো। একটা অনুকম্পা বোধ হচ্ছিলো তার।

চা এলো। দুজনে চা খেতে থাকলো। বাণী হালদার বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. অর্থাৎ শিক্ষাতত্ত্বে এম. এ. পড়বার সময় একবার চড়ি-ভাতিতে ডায়মণ্ড হারবারে যে-হুল্লোড় হ'য়ে ছিলো তারই গল্প তুললো। অধ্যাপক সরকার বিলেত থেকে কতো দেখে-শুনে এসে-ও কি-ক'রে যে মায়া গুপ্তর প্রেমে এতো ডগোমগো হ'লো তাতে বাণী বিস্ময় দেখালো খুব।

ইত্যাদি হাল্‌কা কথা-বার্তায় কিছু সময় কাটলো, তারপর এক সময় জীবনকৃষ্ণই শুরু করলো। বললো, "ঐ শ্রীকুমারকে ভালো বাসছেন কি?"

"না। ও বয়সে ছোটো।"

"তা হ'লেই বা। ওটা একেবারে অচল নয়। দু'একটা ও-রকমের ব্যতিক্রম হচ্ছে আজকাল এবং হ'তে পারে।"

"সুধু তাই নয়। ওকে ভালো ঠিক বাসি না।"

"তবে?"

"বেশ লাগে। ছেলেটি নরম।"

"নরম ছেলে ভালো লাগে?"

"ঠিক বোঝাতে পারলুম না। কী জানেন, আমি যদি জোর ক'রে বলি বিয়ে করো, শ্রীকুমার বাধা দিতে পারবে না। ওর বাপ-মা'র অবাধ্য হ'য়ে-ও আমাকে বিয়ে করবে।"

"বেশ ভালো তো তা হ'লে?"

"না। সেটা সুখের হবে না। তা ছাড়া ছেলেমানুষ।"

"আপনি বুড়োমানুষ চান?"

"বড়ো মানুষ চাই।"

"বটে? তা, কতোখানি মাখামাখি করেছেন? পাঁচকানে ওঠবার মতো জটলা পাকালেন কেন?"

"মাথামাখি একটু হ'য়েছে। তবে, সেটা ক'জন জানে? একবার কলকাতার এক রেস্তোরাঁয় চা খেতে গিয়েছিলুম। পরদা-ঢাকা কামরায় ছিলুম। চাকর তখনো চা-খাবার আনে নি। ওকে খুব কতকগুলো চুমু খেয়ে ফেলেছিলুম। ভূতে পেয়েছিলো সেদিন আমাকে।"

"আশ্চর্য!"

"হ্যাঁ। আমার কাণ্ডে আমিই আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলুম পরে হুঁস হ'তে। হুঁস হ'লো ইস্কুলের কেরাণীবাবুর ছেলেটি পরদা সরিয়ে ওখানে খেতে বসতে যাচ্ছিলো দেখে।"

"কি সর্বনাশ। এ-তো রীতিমতো কেলেঙ্কারি। তারপর?"

"তারপর আর কিছু নয়। ওর বেশি কিছু ঘটেনি। অন্ততঃ বাহ্যতঃ।"

"আর মনে মনে?"

"মনে মনে তো আমরা সবাই পতিত।"

"তা যা বলেছেন।"

বেলা দশটার সময় বাণী হালদার উঠে চলে গেলো। তারপর এক পক্ষ-কাল-ও কাটেনি। ইতিমধ্যে দুবার জীবনকৃষ্ণ ও বাণী হালদার সিনেমায় গেছে কলকাতায়, লাইট হাউসে; একবার বেলুড় মঠে গিয়েছিলো শ্রীমায়ের উৎসব দিনে; একবার শিবপুরের বাগানে। সেই শিবপুরের বাগানেই দুজনের কথা-বার্তা পাকা হ'লো। ওরা ঠিক করলো যতো শীঘ্র পারে বিবাহ করবে। অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণের সরকারী চাকরীটি হ'লেই। তখন যদি ইস্কুল গোলমাল করে বাণীর চাকরি নিয়ে, তবে, কলকাতায় কোথাও কাজ খুঁজে নেবে বাণী। কাজ একটা তাকে করতেই হবে। এতোটা বয়স পর্যন্ত স্বাধীন ভর্তৃকা থেকে স্বামীকে হাজার ভালোবাসলেও তার হাঁড়ি ঠেলে দাসীবৃত্তি করতে বাণীর আটকাবে। আর হাঁড়ি যদি ঠেলতে না-ই হয়, সারা দিন ঘরে ব'সে দিন কাটাতে সে পারবে না। পুষ্পকণা কি-ক'রে কাটায় বাণী হালদার ভাবতে পারে না। তবে দুটো ছেলে পেটে ধরলে কি হয় কে জানে?

বিয়ের কথাটা পুষ্পকণাকে জীবন জানালো। পত্রে নয়; নিজে গিয়ে। শুনে পুষ্পকণার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিলো। পুষ্পর বাড়ি জীবন যেদিন গিয়েছিলো সেদিন নটবর বাড়ি ছিলো। ছেলে ভূমিষ্ঠ হবে ব'লে

নটবর সাত-তাড়াতাড়ি আরো দুটো লাইফ্-ইন্সিওর ক'রে ফেললো মোটা টাকার। সেই কথাটা জীবনকৃষ্ণকে জানালো।

জীবনকৃষ্ণ যে আবার বিয়ে করতে চাইছে একথা শুনে নটবর সহাস্য-মুখে সমর্থন জানালো। বাণী হালদারকে সে দেখেনি। তবে এম. এড্. পাশ করা মেয়ে যখন, তখন বলবার মতো বৈ কি!

সেদিন দুপুরে জীবনকৃষ্ণ ওখানেই খাওয়া-দাওয়া সারতে বাধ্য হ'লো: নটবরের আগ্রহের আতিশয্য এড়ানো দায়। খাওয়ার পর নটবর শয়নগৃহে গেলেন বিশ্রামের জন্য। শালি-ভগিনীপতির বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিলেন। পুষ্পকণা অনেক কথাবার্তার পর শেষে বললো, "যাক্, বিধবা বিয়ে করছো, ভালো। দুজনেই পোড়-খাওয়া।"

"না। আমি পোড়ামাটি। বাণী অক্ষত রমণী। নিতান্ত বালবিধবা।"

"ইতিমধ্যের কথা কে জানে?"

"সকলেই পুষ্পকণা নয়।"

"তলিয়ে তো গেলুম না গো মশাই।"

"ভাগ্যিস্ বাধা পেলে?"

"কার কাছে?"

"আমার কাছে।"

"আর তুমি বাধা পাও নি?"

"পেয়েছিলুম। তোমার কাছে।"

"তবে?"

"শোধ-বোধ। যাই। উঠি। বাণী আসবে বলেছে।"

"ইডিয়ট্।"

পুষ্পর এই কথায় জীবনের চোখ জ্ব'লে উঠলো। সে বললো, "মানে?"

"তুমি নয়; বাণী।"

"না; সে-ও নয়।"

"তবে ভালোবেসেছো দেখছি।"

"আমি না ভালোবেসে বিয়ে করছি না, তোমার মতো।"

"কণাকে ওষুধ-গেলা ক'রে বিয়ে করেছিলে।"

"তুমি তাই ভাববে। কেননা, তুমিই ওষুধ ঢেলে দিয়েছিলে গলায়। কিন্তু কণাকে আমি ভালোবাসতুম।"

"ভালো, ভালো। তোমরা পুরুষ; অনেক ভালোবাসতে পারো।"

"আর তোমরা মেয়েরা?—থাক্, বিশ্রী কথাটা ঢোঁক গিলে পেটের মধ্যে ফেরৎ পাঠিয়ে দিই।"

এই কথা ব'লে জীবন চ'লে গেলো। পুষ্পকণা বুঝলো না 'কামাৎ সঞ্জায়তে ক্রোধঃ।'

পুষ্পকণার সে-রাত্রে ঘুম হয়নি। নটবর ওর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করতে পুষ্প অনেক যত্নে বিরক্তি চেপে উত্তর দিয়েছিলো। স্বাস্থ্যের ব্যত্যয় কিছু ঘটেনি। তবে কিনা ভারী জননীর স্বাস্থ্য একটু এদিক-ওদিক হয় বৈ কি। আশ্চর্য এই, আজ কদিন থেকে পেটে ছেলে আসার জন্য পুষ্পকণার বিরক্তিটা যেনো ক'মে আসছে। কিন্তু কেন?

[২৫]

নরেন্দ্রের দ্বিতীয় বইখানি প্রকাশিত হ'য়েছে। 'জাতীয় শিক্ষা কোন্ পথে' শিক্ষামহলে সাড়া তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিদ্বান তারিফ্ ক'রে লেখককে বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে স্বাগত জানিয়েছেন। দিল্লির হরেন্দ্র সেন তাঁকে জানিয়েছেন আপাততঃ শিক্ষা-বিভাগ চাকরি থেকে তাঁকে ছাড়তে চাইছেন না। কাজেই অবসর পেয়ে একটা নূতন ধরণের ইস্কুল করার প্রচেষ্টা তাঁর এখনকার মতো পিছিয়ে গেলো। তবে অবসর একদা তিনি তো নিশ্চয় পাবেন। তখন নরেন্দ্রনাথের সাহায্য তাঁর দরকার হবে।

'বর্তমান ভারত' পত্রিকা খুবই ভালো চলছে। কোথায় যেনো বিপর্যস্ত শিক্ষিত বাঙালী সত্যিকারের ভাব ও চিন্তার স্বাতন্ত্র্য চাইছিলো মনে মনে। সাহিত্যের বোকামি, বকামি, ন্যাকামি ইত্যাদি বাঙলা সাহিত্যে ভ'রে যাক্; রাষ্ট্র ব্যাপারে ত্যাদ্ড়ামি, বাঁদরামি, ইতরমি তলে তলে খাল কেটে কুমীর আনুক; সামাজিক জীবনে শৈথিল্য, ঔদ্ধত্য, নোংরামি ডাস্ট্‌বিন্ ছাপিয়ে পড়ুক:—তবুও বাঙালীর, শিক্ষিত বাঙালীর, শিক্ষিত বাঙালীর অন্তর-প্রদেশে তলে তলে ভাবের স্রোত একটা আছে বৈ কি! না হ'লে বর্তমান ভারত পত্রিকার গত সংখ্যায় নরেন্দ্রনাথ যখন লিখলেন যে, "যে-বাঙালীর প্রথম জাগরণ রামমোহনে, যে-বাঙালীর ছবির ছত্তরে অবনীন্দ্রনাথ, যে-বাঙালীর কাব্যের কীর্তিতে মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, যে-বাঙালীর রাষ্ট্রে অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জন, যে-বাঙালীর দুরন্তপনায় কানাই-ক্ষুদিরাম, যে-বাঙালীর নিশ্চিত জাগরণ স্বামী বিবেকানন্দে;—সে বাঙালী নৈতিকতার নামাবলী আর দুর্বলতার কামাবলী গায়ে দিয়ে কদিন বাঁচবে?" ইত্যাদি : তখন পাঠকের সংখ্যা কাগজখানায় বেড়ে গেলো বেশ। লোকে বুঝলো সম্পাদকের একটি মনীষা আছে যেটি বর্তমানে বিশেষ এবং বেশি ক'রে দরকার।

সেদিন নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় যান নি। কোনো কাজে তাঁর মন বসছিলো না। আম্মার অতীত-ভবিষ্যৎ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন ক'রেছিলো।

বংশীকে আনি ভালোবাসে। বংশী আনিকে ভালোবাসে। জলের উপর

একটা হাঁস সর্ সর্ ক'রে সাঁতরে চলে; ফুলের উপর একটা প্রজাপতি থর্ থর্ ক'রে পাখা কাঁপায়; চাঁদের কাছে একটি তারা জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলতে থাকে;—আর আন্নাকালি বংশীধরকে ভালোবাসে। বংশীধর আন্নাকালিকে ভালোবাসে।

বয়ঃসন্ধিতে কতো অনাচারই না প্রকৃতি ছেলেমেয়েদের করায়। কিন্তু কৈ, বংশী আনির বয়ঃসন্ধি তো অতি-সুন্দর। তবে কি এরা ভালোবাসলো ব'লে কালো কাদাগুলো মুখ লুকিয়ে ওদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলো?

সেদিন আনি চেঁচিয়ে বললো স্নানের ঘর থেকে, "বাবা, আমার জামা-কাপড়টা দাও না, আনতে ভুলে গেছি।" রবিবারের দিন। বংশী সকালেই এসেছিলো। আনির ওই ডাক নরেন্দ্র শুনতে পান নি। তিনি বই পড়ায় মগ্ন ছিলেন। বংশী তখন অনায়াসে, অতি-সহজে আন্নার জামা-কাপড় নিয়ে স্নানের ঘরের কাছে গিয়ে বললো, "আনি, বাবা মন দিয়ে পড়ছেন, আমি শুনতে পেয়েছি, নাও জামা-কাপড়।"

দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে আনি জামা-কাপড় নিলো হাত বাড়িয়ে। ভারি সুন্দর একটি হাসি মাখা ছিলো তার মুখে। নরেন্দ্রনাথ বংশীর কথায় মুখ তুললেন বই থেকে। বংশীর সব কথাটিই শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। মধুর উপভোগে ভ'রে গিয়েছিলো তাঁর চিত্ত।

কিন্তু ব্যস্। রবিবারের পরে বুধবার যে-কাণ্ডটা বংশী-আন্নার জীবনে ঘটলো তা তো নরেন্দ্র জানলেন না। কি ক'রে জানবেন? নরেন্দ্রনাথ তখন লিখছেন ঘরে। তখন রাত্রি একটু হ'য়েছে সন্ধ্যা কেটে গিয়ে। বংশী-আন্না উঠানে গন্ধরাজ গাছটির কাছে ঘাসে ব'সে আছে। আজ বংশী রাত্রিতে এখানে থাকবে। তার অনেক দিনের সাধ। বংশীর বাবাকে ব'লে এসেছিলেন নরেন্দ্র-নাথ। তিনি অনায়াসেই সম্মতি দিয়েছেন। পর দিন আটটার সময় তাঁর গাড়ি গিয়ে বংশীকে নিয়ে আসবার কথা।

ওদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে। উঠোনে বংশীধর আর আন্নাকালি বিহ্বল চিত্তে ব'সে চাঁদের আলোয় আচ্ছন্ন মনে মনোবাস করছে। বংশী বললো, "আনি, তোমাকে কথা দিয়েছিলুম কখনো বিয়ে করবো না। আজ কিন্তু উল্টো কথা যদি শোনাই?"

"কেন বংশীদা, উল্টো কথা কেন শোনাবে? বিয়ে করবে নাকি তুমি? না, না। তা হয় না। বাবাকে যে বলেছি তুমি-ও বিয়ে করবে না, আমি-ও বিয়ে করবো না। কী বলছো তুমি তবে?"

"হ্যাঁ করবো। কাকে জানো?"

"না। আমি শুনবো না। তুমি খারাপ ছেলে হ'য়ে গেছো। আমি চ'লে যাই। উঠে যাই। বাবার কাছে যাই। বাবা খুব ভালো। কেমন বিয়ে করেনি।"

"আমি করবো। কাকে জানো? তার নামটা শোনো তুমি। তার নাম— উঠো না। উঠে যেয়ো পরে। তার নাম আন্নাকালি, আনি, আমিনা।'

শুনেই আন্নাকালির দেহের সমস্ত রক্তস্রোতে মুখখানি উত্তপ্ত হ'যে উঠলো। সে যেনো অসুস্থ বোধ করলো। হঠাৎ এক সময় বংশীধরের গলা জড়িয়ে ব'লে উঠলো, "ঠিক তো? কথার নড়্ চড়্ হবে না? আনি-ও তাই চায়। বংশীদা, মুসলমানীকে কি-ক'রে বিয়ে করবে? আমার বাবা মত দেবে। তোমার বাবা?"

"এখনি তো নয়? সে তখন ঠিক পথ হ'য়ে যাবে। অনেক দেরি এখনো। তুমি অপেক্ষা ক'রে থাকবে?"

"থাকবো, থাকবো, থাকবো।" ব'লেই আনি বললো, "ঐ চাঁদ সাক্ষী।"

সে-রাত্রে বংশী নরেন্দ্রনাথের পাশে শুয়ে অতি গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হ'লো। আন্না নিজের বিছানায় কখন যে ভোর হ'য়ে গেছে একঘুমে, জানতেই পারে নি। বংশী এসে ওকে ঠেলে ডাকতে ঘুম ভাঙ্‌লো। বংশী ডাকলো, "এই আন্না, প'ড়ে প'ড়ে কতো ঘুমোবে? চা-টা হবে না? গোপী যে তাগাদা দিচ্ছে। মাস্টার মশাই-এর যে স্নান হ'য়ে গেলো।"

বৃহস্পতিবার সকালে বংশী চ'লে গেছে। আনি বিদায়-ক্ষণে কতো হাসিমুখে তাকে গাড়িতে উঠতে দেখেছে। কিন্তু আজ-ও বৃহস্পতিবার: পরবর্তী সপ্তাহ। এই এক সপ্তাহের মধ্যে বংশী যে রোগে পড়েছে আবার, সে-খবর নরেন্দ্রনাথ সারাদিনেও আন্নাকে শোনাতে পারলেন না। ঠিক করলেন, মেয়েকে আজ কাছে নিয়ে শুয়ে বংশীর খবরটা দেবেন ধীরে ধীরে।

[২৬]

বটতলা ইস্কুল আজকাল তেমনই চলছে যেমন কাল-পরশু চলেছিলো। নরেন্দ্রনাথ ইস্কুল থেকে বিদায় নেওয়ার পর ইস্কুলের গতিবিধিতে, কি ছেলেরা কি অভিভাবকরা কি কর্তৃপক্ষ, কেউই খুশি ছিলো না। কিন্তু এলতলা-বেলতলা-অশথতলা-বকুলতলা এবং আরো পাঁচটা ইস্কুল যেমন দশটা-চারটে চাকা ঘোরায়, বটতলা ইস্কুল-ও তেমনি ধারাতেই চাকা ঘোরাচ্ছিলো। অথচ সকলের মনঃপূত হচ্ছিলো না সে গতিবিধি। কারণ এই যে, নরেন্দ্রনাথ বটতলা ইস্কুলকে যে-উঁচুসুরে বেঁধে দিয়েছিলেন, তাঁর বিদায়ের পর সে-সুর নেমে যেতেই শ্রোতার কাণে সে-সুর খারাপ লাগছিলো। এম. এ. বি. টি. দীনবন্ধুর মতো বা এম. এড্ জীবনকৃষ্ণের মতো প্রধান শিক্ষক পেয়ে বহু ইস্কুলই বছর-বছর শত সংখ্যায় ছেলে পাঠাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবং তার মধ্যে ষাট বা সত্তরজন ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ-ও হ'য়ে যাচ্ছে। ইস্কুল তো একটা কারখানা মাত্র। সেখানে উদয়-অস্ত কতিপয় কর্মচারী কতিপয় বালককে বিদ্যা গেলাবার প্রচেষ্টায় তৎপর। এর বেশি প্রত্যাশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সালারের-ও নেই, অভিভাবকের-ও নেই, দেশের লোকের-ও নেই। তবে নরেন্দ্রনাথের মতো বেমক্কা স্বভাবের শিক্ষক কোনো ইস্কুলের ভাগ্যে জুটলে সেটা বড়ো আনন্দময় ব্যতিক্রম ব'লেই গণ্য হ'য়ে থাকে।

জীবনকৃষ্ণ পুজোর ছুটির পরই সোসাল এডুকেশনের চাকরিতে বহাল হবেন। সম্পাদককে তিনি সেকথা জানিয়েছেন। জীবনের শিথিল-প্রযত্ন কাজ-কর্মে কর্তৃপক্ষ যে-অসুবিধা ভোগ করছিলেন তা থেকে তাঁরা অব্যাহতি পাবেন বটে, কিন্তু নতুন হেড্মাস্টার আবার না জানি কি-ধরণের হবে তাই নিয়ে সম্পাদকের মাথাব্যাথা। বৃন্দাবনচন্দ্রের সঙ্গে এই নিয়ে তিনি কথা-বার্তা বলেছেন। বৃন্দাবন বলেন, শিক্ষাবিভাগকে রাজি করিয়ে তাঁরা আবার নরেন্দ্র-নাথকেই ইস্কুলের হালে বসিয়ে দেবেন। কেননা, নরেন্দ্রের লেখা শিক্ষাবিষয়ক বই দুখানি শিক্ষাবিভাগ মহলেও সমাদর পেয়েছে এবং নরেন্দ্রের বর্তমান

ভারত পত্রিকা জন-সমাজে তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে। সুধীরবাবুর, কেন জানি না, এতে এখন আর ততো আপত্তি নেই। কিন্তু শিক্ষা বিভাগ কি রাজি হবে? যদিই বা রাজি হয়, নরেন্দ্রনাথই বা আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে যাবেন কেন? প্রেস্ আর পত্রিকা এবং বই লেখা নিয়ে তিনি তো ভালোই আছেন। ভুবন চৌধুরি তাঁকে নাকি ইদানীং তিনশত টাকা ক'রে মাসিক দক্ষিণা দেন। সুধীরবাবু সম্প্রতি নরেন্দ্রনাথকে চান অথচ চান না, এই রকম তাঁর মনের অবস্থাটা।

বৃন্দাবনচন্দ্র কন্যা কমলাকে দিয়ে কথাটা নরেন্দ্রনাথের কাছে পেড়েছিলেন। কমলা বাপকে বললো যে, মাস্টার মশাই বললেন, তিনি ইস্কুলে আর পড়াবেন না। তবে দিল্লির হরেন্দ্র সেন যদি নতুন ধরণের আবাসিক বিদ্যালয় গড়তে পারেন এবং নরেন্দ্রনাথের সাহায্য চান তবে তিনি পত্রিকা বজায় রেখে-ও সে-ইস্কুলের কাজে যোগ দেবেন। কেননা, সে-ইস্কুল মামুলি ইস্কুল হবে না এবং সাধারণ হেড্‌মাস্টারের মতো মামুলি দপ্তরিখানার চাকরি তাঁকে করতে হবে না। একথা শুনেও বৃন্দাবনচন্দ্র নরেন্দ্রের আশা ছাড়েন নি। কেননা, বৃন্দাবনচন্দ্র ব্যবসায়ী মানুষ হ'লে-ও এ সব ব্যাপারে বাস্তববুদ্ধি তাঁর খেলে কম। নরেন্দ্রকে তিনি অন্ধভাবে ভালোবাসেন।

একদিন কলকাতায় বর্তমান ভারত পত্রিকার অফিসে বৃন্দাবনচন্দ্র গিয়েছিলেন। কাছাকাছি কাজ ছিলো একটা; অমনি নরেন্দ্রকে প্রেসের অফিসে একবার দেখতে গেলেন। দেখলেন প্রেস চলছে একটু ভিতরে; বাইরে অফিস-ঘরখানি নিতান্ত গুদাম-ঘর তো নয়ই, বরং বেশ পরিচ্ছন্ন লাইব্রেরি ঘরের আবহাওয়া। ভুবনমোহনবাবু তখন কাজে বেরিয়েছেন। নরেন্দ্র একমনে প্রুফ্ দেখে চলেছেন।

স্বাগত সম্ভাষণের পালা সারা হ'লে একটু পরেই নরেন্দ্রনাথ কাজ থামালেন। আলাপ করতে থাকলেন। বৃন্দাবনচন্দ্র জানালেন কমলা এবার নভেম্বরে আবার পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে পণ্ডিচেরি যাবে। নরেন্দ্র এ-সংবাদ জানতেন না। অর্থাৎ কমলা তাঁকে বলে নি। নরেন্দ্রনাথকে কমলা বলেনি জেনে বৃন্দাবন বিস্মিত হলেন খানিকটা। নরেন্দ্র বিশেষ বিস্ময়বোধ করেন নি বটে, কিন্তু কমলার এই গোপনতা তার পূর্বেকার আচরণের সঙ্গে

মেলে না।

বৃন্দাবনচন্দ্র বটতলা ইস্কুলের কথা পাড়লেন। জীবনকৃষ্ণ যে সরকারী চাকরি পেয়ে ইস্কুল ছেড়ে দেবেন তা জেনে নরেন্দ্রনাথ খুশি হ'লেন। বললেন, এইবার বেশ ভালো লোক দেখে হেড্‌মাস্টার করুন। জীবনকৃষ্ণ যে খুব ভালো হেড্ মাস্টার হ'তে পারবেন না, নরেন্দ্র তা বুঝতেন। কিন্তু ইস্কুলের সেই টালমাটালের সময় ঘন ঘন নতুন নতুন হেড্‌মাস্টার বদল করলে ছেলেদের ক্ষতি হয় জেনে তিনি কমিটিকে বাধা দিয়েছিলেন। না হ'লে জীবনকৃষ্ণের উপর নরেন্দ্রের আস্থা ততোটা ছিলো না, যতোটা সুধীরবাবু ভেবেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথকেই বৃন্দাবন যখন চেয়ে বসলেন প্রধান শিক্ষকের পদে, তখন নরেন্দ্র হেসে বললেন, "না, আমার মনোমতো কর্মক্ষেত্র পেয়েছি; প্রয়োজনমতো টাকা-ও উপার্জন হচ্ছে। ইস্কুলে আবার কেন? বরং চেষ্টা করবো ভালো একজন যুবক, কর্মঠ হেড্‌মাস্টার দিতে।" এ-কথায় বৃন্দাবন-চন্দ্র আশ্বস্ত হ'লেন। যাবার সময় বললেন, "নরেনবাবু, ভুবনবাবুর এই প্রেসখানিতে আয় যথেষ্ট, পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর মতো বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধিই ঘটাতে পারবেন। ভদ্রলোক মানুষটি-ও বেশ। তাঁকে তো আপনি খুবই জেনেছেন। কিন্তু একটি বিষয় আমাকে জানাতে পারেন কি?"

"কী বলুন তো?"

"ভুবনবাবুর একটি ছেলে মাত্র। ছেলে বিলেতে কাপড় রং করার বিদ্যায় বিশারদ হ'য়েছে। মাসখানেক আগে বাড়ি ফিরেছে। বোম্বাইতে এক কাপড়ের কলে সাতশো টাকা মাইনের এক চাকরি-ও পেয়েছে নাকি। আপনি তো ঐখানেই, মানে, ভুবনবাবুর বাড়ির নিচের তলাতেই থাকেন। ছেলেটির সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন কি?"

"না তো। তবে আলাপ হ'য়েছে। কমলা-ও সেদিন অনেকক্ষণ তার সঙ্গে আলাপ করলো। ছেলেটি ভালো। সপ্রতিভ, উদার, বুদ্ধিমান। এই পর্যন্ত বলতে পারি।"

"কমলার সঙ্গে মানাবে কি?"

এর পর ধীরে ধীরে বৃন্দাবনচন্দ্র ভুবনবাবুর ছেলের হাতে কন্যা কমলাকে দিলে কেমন হয় সে কথা সবিস্তার আলোচনা করলেন নরেন্দ্রের সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথ ভুবনবাবুর ছেলে অনিমেষকে কমলার অযোগ্য মনে করেন না। একথা তিনি বৃন্দাবনকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু কমলা যে হঠাৎ বিবাহে সম্মত হ'য়েছে, আবার শীঘ্রই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পুনর্বার যাচ্ছে, এই সকল কমলা-সংবাদে তিনি বিস্মিত না হ'লে-ও আগ্রহী হ'লেন একটু। কেননা, কমলা এযাবৎ যে-স্রোতে জীবনটাকে চালিয়েছে ব'লে নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন, এই স্রোতটি তার প্রতিকূল না হ'লে-ও মূল স্রোতের থেকে অন্যগতি। অর্থাৎ এটি তার শাখা স্রোত, মূল স্রোত থেকে বাহির হ'য়ে একটু ভিন্ন ধারায় স্বতন্ত্র পথ নিয়েছে।

বৃন্দাবনচন্দ্র চ'লে গেলেন। নরেন্দ্রনাথ "জাতীয় শিক্ষা কোন্ পথে" বইখানির ত্রিশটি ভি. পি. পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন কর্মচারীকে ডেকে। বইগুলি সবই বাঙ্লার বাইরে বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ইত্যাদি শহরে যাবে। পাটনাতে-ও তিনখানির চাহিদা আছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাড়ি ফেরার জন্য উঠতে যাবেন এমন সময় ভুবনবাবু কাজ সেরে এসে পড়লেন। এ-সময় প্রেসে আর না এসে সোজা বাড়ি চ'লে যান নিজের ছোটো গাড়িখানি ক'রে। আজ নরেন্দ্রনাথ দেখলেন তাঁর ছেলে অনিমেষকে নিয়ে তিনি প্রেসে এলেন। প্রেসের মধ্যে আর গেলেন না। নরেন্দ্রনাথ বাড়িতে রওনা হওয়ার উপক্রম করছেন জেনে তাঁকে-ও গাড়িতে তুলে নিয়ে শ্রীরামপুর-মুখে যাত্রা করলেন।

গাড়িতে অনিমেষ আজ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকগুলি কথা বললো। ইস্কুলের ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা, কমলার আশ্রমানুরাগ সম্পর্কে কথা। আশ্রম সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে লণ্ডনে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তদ্দেশবাসীর আগ্রহ-ও যে তরুণ মহলে কিছু-কিছু আছে তা বললো সে। ওদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক ফরাসী ছাত্র শ্রীঅরবিন্দের 'Essays on the Gita' প'ড়ে নাকি মনস্থ করেছে পণ্ডিচেরি আসবার এবং তার মনের বাঞ্ছা আশ্রমে বরাবর থেকে যাবার। কমলার সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা নরেন্দ্রনাথের ঘরেই হ'য়েছিলো কয়েকবার। তার ফলে কমলার আশ্রমানুরাগ সে বুঝেছে।

কমলার প্রতি অনিমেষ একটি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে সেটি নরেন্দ্রনাথের কাছে অগোচর রইলো না। এক সময় অনিমেষ বললো, ওদেশে খুব খারাপ মেয়ে, কিছুটা বঙ্কিমপথবাহী এলোমেলো মেয়ে সে দেখেছে যেমন, তেমনি আবার দু-পাঁচটি অতি-সরল শুচি-প্রকৃতির কুমারী মেয়ের সঙ্গে-ও সে পরিচিত হ'য়েছিলো। এ-রকম মেয়েরা যৌবনে-ও শুচি থাকে। কমলার মতো। কমলা খুব সৎ মেয়ে।

অনিমেষের কথায় নরেন্দ্রনাথ বুঝলেন ছেলেটির মূল প্রকৃতি সাত্ত্বিক; এবং কমলার সত্ত্বাপ্রধান প্রকৃতিই তার প্রতি অনিমেষকে অনুকূল করেছে। গাড়িতে কথা বলতে বলতে কখন তারা বাসায় পৌঁছে গেছে ভুবনমোহনের খেয়াল থাকলে-ও, অনিমেষ বা নরেন্দ্রনাথের হুঁস্ ছিলো না।

বংশীর রোগটা শেষ পর্যন্ত বাঁকা পথেই ভিড়লো। চিকিৎসক জানিয়েছেন টাইফয়েড্। শুনে নরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হ'লেন। আন্নাকালির জন্য-ও তিনি চিন্তান্বিত হ'লেন। যদি ভালোয় ভালোয় বংশী সেরে ওঠে তবেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু বিধাতা কার কপালে কী লেখেন জানি না। খুব সুন্দর দুগ্ধপোষ্য শিশু-ও অকালে ইহলোক ছেড়ে যায়, আবার পলিতকেশ গলিতদন্ত অতি-বৃদ্ধ কত লোক শতবার কামনা ক'রে-ও মৃত্যুকে ডেকে পায় না। বংশীর রোগের কথা ভেবে নরেন্দ্রনাথের মাথায় নিজের অজ্ঞাতসারেই বহু কালো চিন্তা কিল্‌বিল্ করতে লাগলো।

আন্নাকালিকে তিনি রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বংশীর খবরটা দিলেন। জানালেন রোগের সংবাদ, জানালেন রোগের সংকট। শুনে আন্নাকালি বেশ কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকবার পর বললো, "বাবা, টাইফয়েড্ রোগে খুব বড়ো ডাক্তার কলকাতায় কে আছে?" নরেন্দ্রনাথ আন্নার মন বুঝলেন। বুঝে তিনজন বড়ো ডাক্তারের নাম করলেন এবং শেষোক্তজনই যে বংশীকে কাল থেকে দেখছে সেকথা জানালেন। শুনে আন্নার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো। সে বললো, "তবে ভাবনা নেই, কী বলো? কিন্তু এবার সেরে উঠলে বংশীদাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। তুমি ওর বাবাকে বুঝিয়ে দিয়ো-না বাবা?" "দেবো মা।" ব'লেই নরেন্দ্রনাথ আন্নাকালিকে অনেক দিন বাদে মুখে চুমু খেলেন। আনি বাবার গলাটি পরম নির্ভয়ে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর বুকে মাথা গুঁজ্‌লো।

ভালোবেসেছে। সত্যিই আন্না বংশীকে ভালোবেসেছে। তেরো বছরের আমিনা ষোলো বছরের বংশীধরকে ভালোবেসেছে। বয়ঃসন্ধির জটিল মনস্তত্ত্বের বিচারকরা শুনে রাখুন তেরোর এক বালিকা ষোলোর এক কিশোরকে ভালোবেসেছে। কিন্তু কৈ, জটিলতা তাদের কিশোর মনে আছে কি? কি জানি! যদিই বা জটিলতা না থাকে, তা ব'লে আনি আর বংশী কি পাঁচ আর আট বছরের বালক-বালিকার মনোবাসী? না, তা নয়। প্রমাণ আছে।

একবার দুটি খারাপ ছেলের সঙ্গে বংশীর ঝগড়া হ'য়ে গিয়েছিলো। তারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পর্কে বিশ্রী আলোচনা করছিলো। স্বামী-স্ত্রী হ'লে-ও রামকৃষ্ণ এবং সারদামণির দেহসম্পর্ক ছিলো না,—এই কথা তারা কোন্ একখানি জীবনীগ্রন্থে পড়েছিলো। তাতে তারা অবিশ্বাস জানালো। তার মধ্যে একজন কিছুটা বিশ্বাসী। সে বললো, "তবে ওঁদের ছেলে-পুলে হয় নি কেন?" অবিশ্বাসী অন্যজন সহজেই প্রতিপক্ষকে কাবু করলো। বললো, তাদের পাড়ার ভবতোষবাবু ও তাঁর স্ত্রীর সন্তান নেই, তা ব'লে তারা কি সাধু? তর্কচ্ছলে বংশী এসে পড়লো। সে ওদের দুজনকে জোর গলায় শুনিয়ে দিলো যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবী পবিত্র; তাঁদের মধ্যে ওটা থাকতে পারে না। কথায় কথায় তারা বংশীকে জেরা করতে লাগলো। তাদের তর্কের রিপোর্ট তাদের তর্কসভার বইতে নেই; কিন্তু কিশোর ছেলেরা পরস্পরে যে-রকম বাস্তব ভঙ্গিতে এ সব কথা বলাবলি করে, অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকের তা খুব জানা আছে। এক সময় বংশী বললো, "সংসারে পশুর চেয়ে নোংরা মানুষ আছে, আবার দেবতা-ও আছে।" তার কথায় অবিশ্বাসী জন বললো, "তবে আমরা সব কুকুর-বেড়ালের মতো বাপ-মা থেকে এসেছি বলো?" বংশী উত্তর দিলো, "কুকুর-বেড়ালই হ'তে হবে তার কথা কী আছে? দেবতা না-ই বা হ'লো সবাই, তা ব'লে কুকুর-বেড়াল হ'তে যাবে কেন?"

মোট কথা বংশীধর নরনারীর সহজ-স্বাভাবিক দেহসঙ্গমের বিষয়টা মূলতঃ জানে। তবে তার জন্য তার মাথাব্যথা নেই। সেই রকম আন্না-ও জানে। রজ্জবের স্ত্রী তাকে কি-যেনো সব বলেছিলো যখন আনিকে তার বয়ঃসন্ধিতে সে পালন করে। আনি এইটুকু বুঝেছিলো যে, নরনারীর মধ্যে গোপন একটা দেহসম্পর্ক আছে। তবে তা নিয়ে তার মন ব্যস্ত হয় নি কোন দিন। সংসারে জন্তু-জানোয়ারের নির্লজ্জতা দেখেও এ-রকম মেয়ের বা ছেলের মনঃপীড়া হয় না। সংসারে এ-রকম ছেলেমেয়ে হয়তো বেশি নেই। কিন্তু যা বেশি নেই তা কি আদৌ নেই? তারা কি অসম্ভব?

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীনরা ব্রহ্মচর্য শিক্ষার উপর জোর দিতেন। নিশ্চয়ই তাঁরা কিশোর-কিশোরীদের নর-নারীর দেহসঙ্গম রহস্যের ব্যাপারটি

কোনো এক প্রকারে জানাতেন। তবে সে-সম্পর্কে ইতিহাস নেই। বাৎসায়নাদির কামশাস্ত্র আছে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের মতো Sex in Education নিয়ে তাঁরা পুঁথি লিখে যান নি। এবং দুঃসাহসিক কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্য মনস্তাত্ত্বিকের মতো উলঙ্গ স্নান ক'রে, জনক-জননী-পুত্র-কন্যা একত্র উলঙ্গ স্নান ক'রে কিশোর ছেলে-মেয়ের যৌন মনের অন্ধ গুহায় আলোক নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করেন নি। পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা যৌন-শিক্ষা অর্থাৎ কিশোরকে পূর্বাহ্নে সুবিদিত ক'রে দিয়ে তাদের অনেক বিকৃতি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রে সব সময় ভালো করেন না। প্রত্যেক ছেলে ও প্রত্যেক মেয়ে এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তারতম্যে আচ্ছন্ন। কুতূহলী কুন্তী সতী ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি থেকে জাবালী ও কীচক পর্যন্ত সকলেই। কিন্তু কিশোর কীচকের মন ও কিশোর অর্জুনের মন এক শয্যায় ঘুমায় না। কিশোরী কুন্তীর মন আর কিশোরী জবালার মন এক স্বপ্নে আক্রান্ত হয় না। হয় তো ব্যক্তি সত্তার স্বাতন্ত্র্য বুঝে জ্ঞানীজন যৌনশিক্ষা দিতে পারেন কিশোর-কিশোরীকে; হয়তো এই কলিযুগে খুব পরিশুদ্ধরূপে সাধারণভাবে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা বালক-বালিকাকে দেওয়া চলে; কিন্তু বংশীধর ও আন্নাকালির তার প্রয়োজন নেই। ওরা অন্য অনেক তথ্য জানার মতো অস্পষ্ট ক'রে এটা-ও জানে। কিন্তু ওদের মন তাতে জড়িত-আসক্ত নয়।

বংশীধরের রোগের কথাটায় কমলা-ও চিন্তিত হ'য়েছিলো। বংশীকে সে-ও যে ভালোবেসেছে। বংশী আর আনির সৌহার্দ্য কমলাকে মুগ্ধ করে। এ-যাবৎ কমলা ভালোবাসাকে বিশেষ আমল দেয় নি। সম্প্রতি নিজের মনের কানাচে একটা সরীসৃপ আর একটা বিহঙ্গ নড়া-নাড়ি করছে। সরীসৃপটা কিলবিলিয়ে ওঠে, পাখিটা ডানা ঝাপটায়। সরীসৃপটা ওকে ততো বিরক্ত করে না, কিন্তু তাকে ওর ভালো লাগে না। পাখিটা ওকে বিব্রত করে।

অনিমেষ সুন্দর যুবক। অনিমেষকে কমলার পছন্দ হয়। যুবজন, পুরুষজন যদি অমনি কোমল হয়, শিষ্ট হয়, সংযত-আচারী হয়;—তবে তার সঙ্গে বেশ আলাপ করা যায়, আলোচনা করা চলে, বেড়াতে গিয়ে সঙ্কোচ হয় না, দুজনে নিভৃতে গল্প ক'রে আরাম বোধ হয়। কমলার অনিমেষকে বেশ ভালো লাগে।

নরেন্দ্রনাথের বাসায় গত শুক্রবার কমলা গিয়েছিলো। একটি মুসলমান পর্ব-উপলক্ষ্যে সেদিন ইস্কুল-কলেজ বন্ধ ছিলো। সকালেই গিয়েছিলো কমলা। দুপুরে তাকে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিলো আন্নাকালি। সকালবেলা রান্নার কাজ আন্না, কমলা আর গোপী সমাধা করবার পর কমলা আর আন্না গল্প করতে লাগলো, গোপী গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত রইলো, নরেন্দ্রনাথ একখানি মোটা খাতা টেনে "বর্তমান ভারতে"র জন্য লিখে চললেন। এই খাতাখানিতে তিনি রচনার পর রচনা লিখে রাখেন যখন যা মনে আসে। প্রয়োজন মতো পত্রিকার চলতি সংখ্যায় মুদ্রিত করেন।

দুপুরে সেদিন ভুবনবাবুর ছেলে অনিমেষ বাড়ি ছিলো। কমলার খাওয়া-দাওয়ার পর সে কমলাকে তাদের উপরের ঘরে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলো। আন্না বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এ-পরিচর্যার অভ্যাসটি সে সম্প্রতি নিয়েছে। গত মাসে একাদশীর দিনে নরেন্দ্র ভৃত্য গোপীকে পা টিপে দিতে বললেন। এতোদিন পা কামড়ানোর কোনো বাতিক তাঁর ছিলো না। গোপী সানন্দে তাঁর পদসেবা করলো। পরে আন্না মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করতো তাঁর পা কামড়াচ্ছে কিনা। নরেন্দ্র বুঝলেন আন্নার আগ্রহের কারণটা। কাজেই ইদানীং প্রায়ই ছুটি থাকলে নরেন্দ্র দুপুরে বিশ্রামের সময় না চাইতেই আন্নার নরম হাতের পদসেবা পেয়ে থাকেন। আজ-ও আনি সে-শুশ্রূষা পরম আগ্রহে ক'রে যাচ্ছিলো। কখন এক সময় নরেন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়লেন; আন্না-ও পরে বাবার পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়লো।

সেই সময় অনিমেষের সুসজ্জিত কক্ষে কোচে ব'সে কমলা অতি সহজে অনিমেষের সঙ্গে কথা-বার্তা ব'লে যাচ্ছে। এক সময় অনিমেষ বললো, "একবার লণ্ডনে একটি ফরাসী মেয়ের সঙ্গে খুব মিশেছিলুম। মেয়েটা খুব ভালো দেখতে। আমার মনকে বেশখানিকটা টেনেছিলো। নামটা ছিলো সিমুকি। বেশ নাচতে পারতো। একদিন রাত্রিতে মনটা তার প্রতি এতো ঝুঁকলো যে, ভেবেছিলুম তাকে বিয়েই ক'রে ফেলি। কিন্তু বড়ো বেঁচে গিয়েছিলুম। ভাগ্যিস্।" এই পর্যন্ত ব'লেই অনিমেষ থামলো। তারপর সে খোলাখুলিই কমলাকে তার আকর্ষণ-বিকর্ষণের ইতিবৃত্ত শুনিয়েছিলো।

সিম্‌কি মেয়েটি ভালো। একটু বেশি মিশতো পুরুষদের সঙ্গে। অনিমেষ যখন খুব ঝুঁকেছে তখন ওর বন্ধু, ইংরেজ বন্ধু নিক্‌সন্‌ ওকে এক সংবাদ দিলো। সিম্‌কি একটি পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে-ও হরদম্‌ মিশতো। তার নাম তারা সিং। তারা সিং তাকে বিবাহের প্রস্তাব জানিয়েছিলো। কিন্তু হঠাৎ সে কাকে-ও না জানিয়ে ভারতে চ'লে এলো। এদিকে সিম্‌কি তখন অন্তঃসত্ত্বা। সেই বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার একটা দুরভিসন্ধি-ও সিম্‌কির ছিলো অনিমেষকে বেশি ক'রে আঁকড়ে ধরায়।

ইত্যাদি গল্প অম্লান বদনে ব'লে যেতে লাগলো অনিমেষ। কমলা শুনছিলো। এ-রকম আলাপ তার জীবনে প্রথম। কিন্তু অনিমেষের ভাষণে এতোটুকু মালিন্য না থাকাতে কমলার শুনতে বাধা ঘটছিলো না মনে। অনিমেষ বললো, মেয়েটার ভিতর একটা নরম-ভাব ছিলো। এই নরম প্রকৃতির মেয়েদের সে এড়িয়ে চলে। কেননা, ওদের প্রতি তার একটা দুর্বলতা আসে। ছলনা আর সত্যিটা জড়িয়ে মিশে পড়ে। তাই সে খুব সাবধানী।

কমলার বুকের মধ্যে একটা কথা ঠেলা-ঠেলি করছিলো এই কথা শুনে। তার ইচ্ছে করছিলো বলতে, "আমি কি নরম নই?" সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কড়া মেয়ে ভাবতে আপত্তি জাগছিলো মনে। যাই হোক্‌, মুখ ফুটে এ-রকম আলোচনায় সে অনভ্যস্ত। কাজেই মুখ তার ফোটে নি। অনিমেষ কিন্তু কেন জানিনা ব'লে বসলো, "আপনি কিন্তু বেশ নিরাপদ। নরম প্রকৃতির মানুষ; অথচ জোর রয়েছে চরিত্রে। আচ্ছা, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তো গিয়েছিলেন। জীবনে ঐপথে জোরালো ডাক আছে নাকি আপনার?"

হৃদয়বৃত্তির কথা-বার্তা আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা-বার্তায় পা বদল করতেই কমলার স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস পড়লো। সে বললো, "খুব গভীর প্রদেশের খবর আমার মন আমাকে দেয় নি। কিন্তু ঠাকুর-ঘর আমার ভালো লাগে, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীঅরবিন্দের মতো অথবা স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষকে গুরু মানতে সাধ যায়। ভক্তিরস আমার বড়ো আনন্দ আনে অন্তরে। খুব ভালো কীর্তন গান শুনলে আমার কান্না পায়। দিলীপ রায়ের গান শুনলে, ভজন শুনলে মনে হয় সংসার ছেড়ে সাধুর জীবন নিয়ে ফেলি।" এক নিঃশ্বাসে এতোগুলো কথা ব'লে কমলা লজ্জিত বোধ করলো।

কমলার কথাগুলো অনিমেষ একমনে শুনলো, তাইতে কমলা বুঝলো এ-যুবক অধ্যাত্মবৈরী নয়। কমলার একঝোঁকের বাক্যস্রোত থামতেই অনিমেষ বললো, "আমার ভক্তি ততো হয় না, অর্থাৎ কীর্তনে কান্না পায় না। কিন্তু আর পাঁচজনের মতো ঠাট্টা করতে পারি না। ব'সে শুনতে আনন্দ পাই। ভক্তিতে নয় বোধ হয়। গান ভালো লাগে আমার। এক সময় গায়ক হবার সাধ হ'য়েছিলো মনে। কম বয়সে একটু-আধটু গাইতে পারতুম। এখন অভ্যাস নেই। আর বিজ্ঞান-চর্চাই এখন আনন্দের হ'য়ে উঠেছে। গান শুনতে সাধ হয়; গাইতে সাধ নেই আর।"

বেলা তিনটে নাগাৎ অনিমেষের চাকর গিয়ে নরেন্দ্র আর আম্নাকে তার ঘরে নিয়ে এলো। সেইখানেই ওদের চা খাওয়া চললো। এক সময় কমলা বংশীর কথা তুললো। বংশীর রোগটা কমার মুখে আদৌ নয়। ডাক্তার ভয় পাচ্ছেন। শুনে আম্নার মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। তার হাত চলকে' চা একটু প'ড়ে গেলো। নরেন্দ্র বুঝলেন। তিনি কথাটা হাল্কা করবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "বংশীর বাবা পরামর্শের জন্য আর একজন কে 'দত্ত' ব'লে বড়ো ডাক্তারকে আনবেন।" নরেন্দ্র বুঝলেন, কথাটা শুনে আম্না সাহস পেলো।

কমলা বাড়ি চ'লে এলো বিকাল বেলা। তার বাবার কাছে ভুবনবাবুর ছেলে অনিমেষের কথা বললো। তার মতো স্বল্পভাষিণী মেয়ে যুবজনের কথা এতোখানি বলতেই বৃন্দাবনচন্দ্র উৎসাহিত বোধ করলেন মনে। ভাবলেন, তবে মেয়েটা আশ্রম-মঠ ইত্যাদি করলেও বৈরাগি নেহাৎ হবে না। অন্য অনেক বাপ-মা, স্নেহশীল বাপ-মা'র মতো বৃন্দাবনচন্দ্র বেশি ভেবে ফেললে-ও একেবারে ভুল করেন নি। কেননা, সেদিন রাত্রিতে কমলা নিদ্রায় স্বপ্ন দেখলো অনিমেষ তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছে।

ঘুম ভেঙে গেলো কমলার। এ-রকম বেমক্কা স্বপ্নে কমলার আত্মধিক্কার এলো। সে ভাবলো এতোটা ভেবে ফেলা অন্যায়। বেচারা খেয়াল করলো না যে, এটা জাগ্রত মনের ভাবনা নয়। ঘুমন্ত মন এইটুকু আর ভাবতে পারে না? অন্য অনেক মেয়ে যে যাচ্ছেতাই ভাবনায় ভুগে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কমলা নেহাৎ লক্ষ্মী মেয়ে।

দিন গুনছে। অনেকেই দিন গুনছে। আন্নাকালি দিন গুনছে বংশীধর কবে ভালো হবে। বংশীধর দিন গুনছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার কতোদিন কাটলো। বৃন্দাবনচন্দ্র দিন গুনছেন কবে কমলা আর অনিমেষের পরিচয় ঘন থেকে ঘনতর এবং পরিশেষে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'য়ে তাদের পরিণয় সম্ভব হ'য়ে উঠবে। অনিমেষ দিন গুনছিলো বোম্বাইয়ের কাজ নেবার দিনটি আসতে আর কতো দেরি। কমলার মনে আসছিলো পুনর্বার আশ্রমে যাবার দিনটি। কিন্তু তার ইচ্ছার স্বাধীন গতি যেনো প্রতিহত হ'য়েছে খানিকটা। পুষ্পকণা দিন গুনছে তার ভাবী সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'তে আর কতো দেরি। নটবর দিন গুনছে কবে তার রেলের বড়ো কণ্ট্র্যাক্টটা হাতে আসবে নিশ্চিত। ইত্যাদি ভাবনায় সকলেই ব্যস্ত। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দিন গুনছেন না।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর তৃতীয় একখানি বই লিখে চলেছেন, শিক্ষা সম্পর্কে নয়। এখানির নাম দিয়েছেন 'বর্তমান ভারত।' স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বর্তমান ভারতের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিবর্তনের গতি-বিধিতে নব প্রবর্তনা কী কী প্রয়োজন তারই একটা আলোচনা। বইখানির সম্পর্কে নরেন্দ্রের ভাবনা এখনো স্পষ্ট নয়। কিন্তু একটি বেগবান অনুভূতি ও স্পন্দিত বেদনার বশে তিনি পাণ্ডুলিপির খসড়া ক'রে যাচ্ছেন। তা ছাড়া নরেন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য "সাবিত্রী" প'ড়ে শেষ ক'রে অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন। মিস্টিক-সিম্বলিক-অকাল্ট্ এই অতিমানস লোকের বার্তাজীবী অপরূপ মহাকাব্য ও জ্ঞানে পৃথিবীর এক আশ্চর্যতম সৃষ্টি। নরেন্দ্রনাথ-ও শীঘ্রই পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাওয়া মনস্থ করেছেন। অবশ্য বংশীধর সুস্থ হ'লে। কেননা, আন্নাকালি-ও সঙ্গে যাবে যে। অসুস্থ বংশীকে রেখে বাঙ্‌লা দেশ ছেড়ে সুদূর মাদ্রাজে আন্নাকালি যেতে চাইবে না; নরেন্দ্রই বা যেতে বলবেন কি-ক'রে?

জীবনকৃষ্ণ সোস্যাল এডুকেশনের চাকরিটা পেলেই বাণীকে বিবাহ করবেন এই রকম স্থির হ'য়েছে উভয়ের কথা-বার্তায়। এই সংবাদ জীবনকৃষ্ণ

পুষ্পকণাকে জানিয়েছিলেন। পুনর্বার জানাতে গেলেন। পূর্বের সংবাদে দিন স্থিরের কথা বলা হয় নি, আজকের সংবাদে পঞ্জিকার দিনটি জানাতে গেলেন। যেনো বিশেষ একটি বিদ্বেষ চরিতার্থ করবার জন্যই তার যাওয়া।

জীবন যখন গেলো পুষ্পকণা তখন ব'সে ব'সে একটি ছোটো পায়ের পশমের মোজা বুনছে। জীবন বুঝলো। তবুও প্রশ্ন করলো, "ছেলের মোজা বুঝি?"

"হ্যাঁ। নটবরবাবুর ছেলের। অর্থাৎ সন্তানের। কারণ, মেয়ে-ও তো হ'তে পারে।"

"এখনো ওঁকে ভালোবাসতে পারোনি তা হ'লে? সাধনায় এখনো সংশয়ের যুগ চলছে?"

"যে-আজ্ঞে।"

"যাক্, তিনটে ছেলে মানে সন্তান হওয়ার পর ভালোবাসতে পেরে উঠবে।"

পুষ্পকণা রূঢ়-দৃষ্টিতে তার দিকে চাইবে এমনটা আশা করেছিলো জীবনকৃষ্ণ। কিন্তু দেখলো তার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে পুষ্পকণা যে-দৃষ্টিতে চাইলো তাকে বলে অনুনয়। তবে কি পুষ্পকণা জীবনকে অনুনয় করতে চায় সে যেনো তার দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ না করে? তবে তো মেয়েটা নেহাৎ খারাপ নয়।

নটবর বাড়ি ছিলো। তবে জীবনকৃষ্ণ চা খাওয়ার পরই সে চ'লে গেলো তার বড়ো দরের কণ্ট্র্যাক্টের তদ্বির করতে। ছুটির দিনে সাহেবকে তার বিশেষ আড্ডায় গিয়ে দেখা ক'রে কাবু করতে চায় নটবর। এ সব ব্যাপারে নটবর বেপরোয়া। অন্য কণ্ট্র্যাক্টর্‌রা নিভৃত আড্ডায় সাহেবকে আক্রমণ করতে ভরসা পায় না। কিন্তু নটবরের আটকায় না। অপ্রস্তুত হ'য়ে-ও সে সব রকম আক্রমণকে সামলাতে পারে। কোথায় কতোখানি শ্লীল আর কতোখানি অশ্লীল তোষামোদ বা ঘুষ লাগে নটবরের অভিধানে তা নির্ভুল লেখা আছে। বৃদ্ধ-বয়সে কণ্ট্রাক্টারি জীবনের শেষে নটবর এই নিয়ে যদি একখানি বই লেখে তবে তার কাটতি হবে অনেক এবং কোনো কোনো বাঙ্‌লা উপন্যাস-লেখক উপাদানের বৈচিত্র্য পেয়ে যাবেন তা থেকে।

সন্ধ্যার পর-ও জীবনকৃষ্ণ উঠতে চাইছে না কেন? পুষ্পকণার বিশেষ

আগ্রহ আসছে না জীবনকে আপ্যায়িত করবার; কী কথায়, কী বার্তায়। প্রথম এসেই এক পেয়ালা চা খেয়েছিলো জীবন। তারপর নটবরের বিদায়ের পর কিছু খাবার ও চা খেলো সে। ব্যস এই পর্যন্ত। এর বেশি আপ্যায়ন জীবনকে পুষ্পকণা করে নি।

এক সময় পুষ্পকণা বললো, "কখন উঠবে?"

"যখন বুঝবো তোমার খুব অসহ্য হচ্ছে।"

"আমার তো অনেক আগেই অসহ্য হ'য়েছে।"

"মেয়েরা কখন অসহ্য বোধ করে আমরা সব সময় বুঝতে পারি না তা হ'লে?"

"যেদিন প্রথম খবর দিলে বাণীকে বিয়ে করবে, সেদিন থেকেই তুমি আমার অসহ্য।"

"বলো কি? তবে কি তুমি চেয়েছিলে আমি তোমার বোনকে হারিয়ে বরাবর আইবুড়োই থেকে যাবো? কোন্ দুঃখে?"

"তা ব'লে বাণী? রামোঃ। ধন্য তোমার পছন্দ।"

"বলিহারি তোমার পছন্দ! নটবর!"

"সাবধান জীবন।"

"সাবধান পুষ্প।"

"এই পৌরুষ এতোদিন কোথায় ছিলো তোমার?"

"এই আর্তি এতোদিন কোথায় ছিলো শ্যালিকার?"

"বাণী আজকাল ঘন ঘন আসছে বোধ হয়?"

"ঘন। ঘনতর। তবে ঘনিষ্ঠ নয়। তোমার মতো বেয়াদবি করে নি।"

"আমি কি দেখতে গেছি নাকি?"

"নটবরকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি দেখতে গিয়েছিলে বুঝি?"

"জীবন, মুখটা একটু সামলে।"

"বহুৎ খুব। এই থামলুম।"

জীবনকৃষ্ণ চুপ করলো। যে-ভাবে, যে-ভাষায়, যে-ভঙ্গিতে জীবনকৃষ্ণ আর পুষ্পকণা বিতর্ক করে, তাকে কলহ বললে ভুল হবে না। যে-সব মেয়ে আর পুরুষ এম. এ. বা এম. এড্. পড়েনি তাদের কলহ যে-ধরণের, যে-বর্ণের,

যে সব রেখার হয়—এদের কলহ তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ এরা শিক্ষিত। শিক্ষাকালে শেলি-বায়রণ পড়েছে, য়্যাডামস্-নান্ পড়েছে। কাজেই শেলির মানসরাজ্যে, বায়রণের প্রাণরাজ্যে, য়্যাডাম্স-নানের ভাবনা রাজ্যে এদের অনুপ্রবেশ না হ'লেও, পড়তে পড়তে, শুনতে শুনতে, বয়সের বছরগুলো গুনতে গুনতে পুষ্প ও জীবনের মনন রাজ্যে কিছু ভিন্ন রঞ্জনের আমেজ লেগেছে বৈ কি। তা ছাড়া আরো একটা কারণ নেই কি?

পুষ্পকণা আর জীবনকৃষ্ণ ওদের রাগ-দ্বেষকে যে পার্শ্বপথে সরিয়ে রেখে জীবনের প্রকাশ্য পথে চলছিলো তাতে ওদের অনুরাগ-বিরাগ আরো স্পষ্ট, আরো জোরালে, আরো জমকালো হ'য়ে ওঠার কথা নয়। ওদের চিত্তের সাততলা নিচের কামনা নিচেই গুমরে ছিলো। উপরতলায় চলছিলো সহজ ঘর-কর্ণা। আজ জীবনের প্রায় দুটো বছরে নানা ঘটনার ঘূরণে ওদের সাততলা নিচেকার সরীসৃপটা উপরতলায় মুখ বাড়ালো। ছিদ্রপথে।

যাক্ তত্ত্বকথা। অবশ্য তত্ত্ব সূক্ষ্ম ব'লেই স্থূলেরা আর তাকে তথ্য বলে না। কিন্তু তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তবে সে-তত্ত্ব তথ্য বৈ কি। জীবনকৃষ্ণ ও পুষ্পকণার জীবনের বর্তমানটা এই রকম কিছু। ওদের দুজনের স্বপ্নেচলার জীবনযাত্রা জেগে উঠে স্পষ্ট হ'তে চাইছে। নটবর বিয়ের পর থেকে পুষ্পকে সমাদরে রক্ষা ক'রে আসছে। পুষ্প বিয়ের পর থেকে নটবরকে সাবধানে অনুগমন ক'রে চলেছে। জীবনকৃষ্ণ কণার মৃত্যুর পর থেকে সতর্ক চিত্তে বোহিসেবকে ঠেকিয়ে রেখেছে। পুষ্পকণা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকে বিরোধকে সর্বপ্রযত্নে প্রহরায় রেখেছে।

রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত হ'লো। জীবন উঠলো। পুষ্পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার কথা। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে কোথায় যেনো তার বুকের ভিতর ব্যথা বাজলো। হঠাৎ ব'লে উঠলো, "দেখো ভাই জীবন, তোমার উপর অন্যায় করেছি। কণার উপর অন্যায় করেছি। নিজেকে বুঝতে পারি নি। তাই অপরকে ঠকিয়ে এসেছি; নিজেকে-ও ঠকিয়েছি। বাণী হালদারকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হবে, এই আমার কামনা। খেয়াল হ'লে মাঝে মাঝে এসো। ঝগড়া ক'রো না আর। আমি-ও করবো না।"

পুষ্পকণার এই করুণ চেহারা জীবনকৃষ্ণের অজানা। অবাক হ'য়ে

চেয়ে রইলো চুপ ক'রে পুষ্পকণার মুখে। পুষ্পকণা আশা করছিলো দরদের অনুকম্পার, সহানুভূতির কোনো সুরে উত্তর দেবে জীবন তার কথার। কিন্তু নিরাশ হ'লো সে। জীবনকৃষ্ণ নীরবে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

পথে নেমে ট্রাম ধরবার মুখে দেখলো বাণী হালদার-ও সেই ট্রামের অপেক্ষায়। বাণী-ও কলকাতায় এসেছিলো। জীবন তাকে ডেকে নিলো পাশে। দুজনে কথা বলতে বলতে ট্রামে চললো। পুষ্পকণা খুব সুখে আছে, এই ধরণের কথা চমৎকার বিন্যাসে জীবনকৃষ্ণ বানিয়ে বলতে থাকলো বাণীকে। বাণী ভাবলো, বিয়ে হ'লে সে-ও খুব সুখে থাকবে। জীবনকে তার চাই। পাবে-ও সে।

[২৯]

"আন্না? আন্নাকালি? আনি? আন্না-মা?"—এতোগুলো সাদর ডাকে-ও আন্নার সাড়া মিললো না। নরেন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারলেন না কন্যা এই একটুখানি পরিসরের গৃহস্থালির কোন্ অন্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে তাঁর এতোখানি সাগ্রহ আহ্বান-ও শুনতে পেলো না। অবশ্য মধ্যে মধ্যে আন্না এই রকম ক'রে ছোটো ছেলের মতো সাড়া না দেওয়ার খেলা করে। কিন্তু ইদানীং সেই ছেলেমানুষী আচরণ অনেকদিন তো নরেন্দ্রের সঙ্গে আন্না করে নি। তবে কি হঠাৎ 'বড়ো হ'য়ে ওঠা' মেয়ে ছোটো হ'য়ে গিয়ে সেই রকম লুকোচুরি খেলা বাপের সঙ্গে আবার খেলছে?

নরেন্দ্রের ঘর দুখানি। শয়ন-ঘর আর বসবার ঘর। শয়ন-ঘরে পিতা-পুত্রীর দুখানি স্বতন্ত্র শয্যা। বসবার ঘরে দু-আলমারি বই, লিখবার টেবিল, দুখানি চেয়ার ইত্যাদি। সম্প্রতি ভুবনবাবু স্বল্পমূল্যে একখানি কৌচ নরেন্দ্রনাথকে কিনে দিয়ে তাঁর আসবার বৃদ্ধি করেছেন। এই দুই কক্ষে আন্না নেই। রান্নাঘরে-ও না। স্নানের ঘরে এখন যাওয়ার কথা নয়; অর্থাৎ স্নান করতে। তবু-ও একবার সেখানে দেখলেন। ভুবনবাবুর ছেলে অনিমেষ আনিকে আজকাল বেশ স্নেহ দেখাচ্ছে। তার কাছে তাদের ঘরে গেছে কিনা ভাবলেন। কিন্তু ওদের ঘরে তো আন্না যায় না। তবু সেখানে গোপীকে পাঠিয়ে সন্ধান নিলেন। গোপী এসে বললো, আন্নাদিদি সেখানে যায় নি। হঠাৎ গোপীর মনে প'ড়ে গেলো একটি কথা। মধ্যে মধ্যে আন্না ভুবনবাবুদের বাড়ির পিছনদিককার সুদৃশ্য বাগানটিতে ফুলগাছগুলির মধ্যে কাঠের বেঞ্চে চুপচাপ ব'সে থাকে আজকাল। গোপী সেদিন বিকালে আন্নাদিদিকে ঘরে না পেয়ে সর্বত্র খুঁজে অবশেষে সেই নিভৃত স্থানে তাকে আবিষ্কার ক'রেছিলো। নরেন্দ্রকে গোপী সেই গোপন আশ্রয়ের সন্ধান দিলো। নরেন্দ্র গেলেন। গিয়ে যা দেখলেন, তাতে আন্নাকে ডাকতে ইচ্ছা হ'লো না তাঁর।

নরেন্দ্র দেখলেন আন্না কোলের উপর দুখানি হাত জড়ো ক'রে চোখ মুদে স্থির হ'য়ে ব'সে রয়েছে। একটু অপেক্ষা ক'রে আরো কাছে গিয়ে

দেখলেন আন্নার ঠোঁট দুখানি নড়ছে। যেনো মনে মনে কী বলছে সে। নরেন্দ্র চুপ ক'রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন কন্যার ধ্যানভঙ্গের? এক-সময় আন্না যোড়কর কপালে ঠেকিয়ে কাকে যেনো নমস্কার করলো। তারপর চোখ খুললো। পিছন থেকে নরেন্দ্র ব'লে উঠলেন, "আন্না?" চম্‌কে উঠে আন্না বাপের কাছে ঘেঁসে এলো। তার চোখে জিজ্ঞাসা। নরেন্দ্র বললেন, "মা আমার ঠাকুরকে ডাকছিলো। নারে আনি?"

"হ্যাঁ বাবা, কালী ঠাকুরকে জানালুম বংশীদাকে যেনো শীঘ্র শীঘ্র সারিয়ে দেয়।"

"আচ্ছা।"

"বাবা, বংশীদার জন্যে মন কেমন করছে। কতোদিন দেখিনি।"

"এই রবিবারের আমি তাকে দেখতে যাবো। তুই যাবি?"

"যাবো। কিন্তু—"

"বল্।"

"না বাবা, তুমি দেখে এসে আমাকে ব'লো।"

"তুই-ও চল্-না।"

"থাক্।"

"কেন মা?"

"খুব রোগা হ'য়ে গেছে তো?"

"তা একটু হবে বৈ কি।"

"চুপটি ক'রে বিছানায় প'ড়ে আছে তো?"

"রোগী মানুষ কি লাফালাফি করবে পাগ্‌লি?"

"ঐ রোগাকে আমি দেখবো না। তার চেয়ে ভালো হ'য়ে গিয়ে যেদিন ঝোল খাবে, সেদিন ঠিক ওর খাবার সময় আমাকে নিয়ে যাবে তুমি। আমি দেখবো। ওর মা দেবে। ও খাবে, তুমি থাকবে সেখানে, আমি দেখবো।"

"তাই হবে। এখন এইখানেই বসবি, না, ঘরে যাবি?"

"চলো ঘরে।"

ব'লে আন্নাকালি নরেন্দ্রের সঙ্গে ঘরে এলো। বসবার ঘরে পিতা-পুত্রী

বাপের লিখবার টেবিলের দুধারে দুখানি চেয়ারে বসলো। গোপী ঘরে আলো জেবলে দিয়ে গেছে। সে বারান্দার একধারে ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবছে। বোধ হয় তার দেশেরই কথা। আন্না বাপকে বললো, "বাবা, তোমার পত্রিকার এখন গ্রাহক কতো?"

"বাৎসরিক গ্রাহক তিন হাজার। তা ছাড়া খুচরো বিক্রি আছে।"

"বাবা, তুমি আবার যে-বইখানা লিখছো, সেখানা কবে বার করবে?"

"খুব তাড়া-তাড়ি লেখা শেষ করতে পারলে সরস্বতী পুজো নাগাদ বের করতে পারবো।"

"বাবা, তুমি গল্পের বই লেখো না কেন?"

"কার মতো?"

"এই বঙ্কিমবাবুর মতো?"

"বঙ্কিমবাবুর কোন্ বই তোর ভালো লাগে?"

"আমি তো তিনখানি পড়েছি সুধু। তার ভেতর কপালকুণ্ডলাই সব চেয়ে ভালো লাগে।"

"আমার-ও। আচ্ছা কপালকুণ্ডলার কোন্ জায়গাটা সব চেয়ে ভালো লাগেরে?"

"কেন, সেই যেখানে বলছে, পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?"

"ঠিক বলেছিস্।"

"বাবা, আমার মনে হচ্ছে, বংশীদা যেনো পথ হারিয়ে ফেলেছে। এমন বার বার অসুখে পড়ছে কেন?"

মেয়ের কথাটা সহজ ও বাস্তবধর্মী নয়। এ-যেনো মিস্টিক্ কথা! যেনো রোগ ভুগে বংশীর স্ফূর্ত প্রাণধারা তার স্রোতকে মরুবালুকায় হারিয়ে ফেলেছে। আন্না চায় সবল, সতেজ, সুস্থ বংশীকে দেখতে। সেই প্রাণ-গরিমাকে ঘিরে কিশোরী বালার কল্পনা ষোলোকলায় বিকশিত হ'তে পারবে! আন্না বংশীকে ভালোবাসছে। ভালোবাসলে বাঁচা চাই। সত্যবানের মৃত্যু সাবিত্রী সইতে পারে না। যে-কোনো রমণীর অন্তরাত্মা তার প্রিয়সঙ্গী পুরুষের জীবনের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের গতি পায়। মুক্তি পায়। নরেন্দ্র এ-রকম ভাবুকের মনে ভাবতে অনভ্যস্ত নন। তাঁর পালিতা মুসলমানী

আমিনা যে সরলা কপালকুণ্ডলা, তা তিনি জানেন। নরেন্দ্র চিন্তিত হ'লেন মেয়ের কথায়।

আন্না দেখলো বাবা তার কথায় কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। যেনো কী ভাবছেন। নরেন্দ্রনাথের চিন্তা আন্না বুঝলো না। সে মনে করলো নরেন্দ্রনাথ বংশীর জন্য চিন্তিত। এক সময় আন্নাই নীরবতা ভঙ্গ করলো। বললো, "বাবা, তুমি ভেবো না। বংশীদা ভালো হ'য়ে যাবে। মা কালীকে খুব ডুব দিয়ে ডেকেছি।"

"ডুব দিয়ে ডেকেছি" কথাটা সহজ, বাস্তবধর্মী কথা নয়। মর্মবাণী যেনো ঐ কথায় প্রকাশ পেলো। নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন মানুষ কবি বা চিত্রী বা ভাস্কর বা কোনো চারুশিল্পী হ'লেই যে মিস্‌টিক্ হবে তা কেন? শিল্প-কলায় জীবনের একটা প্রকাশ হয়। সমগ্র জীবনটি শিল্পকে ছাড়িয়ে আরো অনেক গভীরে মগ্ন ও বিস্তৃতিতে ব্যাপ্ত। সেখানে শিল্পী নয় এমন মানুষ-ও মিস্‌টিক্ হ'তে পারে। আন্নার মনখানি মিস্‌টিক্ মন।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রিতে আন্না সকাল-সকাল বিছানায় গেলো। নরেন্দ্রনাথ অনেক রাত্রি পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী পড়তে থাকলেন। এক সময় বই বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। আন্না-বংশীর রাজ্য ছেড়ে তাঁর মন কমলার কথা ভাবতে থাকলো। কমলার অনিমেষকে ভালো লেগেছে। অনিমেষের মন মুগ্ধ হয়েছে কমলার চিত্তশুচিতায়। অন্তররাজ্যের উপর তলায় এই স্বচ্ছতা। ভিতর মহলে নিতান্ত জান্তব দাপা-দাপি ওদের নেই বটে, কিন্তু যুবতী কমলা ও যুবক অনিমেষের জীবধর্ম কি গোপনে ইন্ধন যোগাচ্ছে না ওদের আকর্ষণে-অনুরাগে? অনিমেষ মানুষ দেখেছে; মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে। বিদেশে বিলেতী মেয়েদের সঙ্গে সহজ হ'য়েই মিশতে পেরেছে সে। যুব-চিত্তের ক্ষুৎ-পিপাসা তার আছে। কিন্তু প্রকৃতি তার এমনি যে, যাকে জীবনসঙ্গিনী ব'লে গ্রহণ করবে না সে, তাকে নিয়ে লালসার লালাকে সে সংযত করতে পারে। তার প্রকৃতির মধ্যে পরিপূর্ণ ক'রে নারীকে অধিকার করা অর্থাৎ ধরা দেওয়ার একটি স্বতঃপ্রবৃত্তি প্রবল। অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত বিলাপে বা উৎক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খলায় অন্তরের কেন্দ্র হ'তে যথা-তথা বিকৃত হওয়া, প্রকৃতি তার ধাতে লেখে নি। তাই সিম্‌কির প্রকৃতি ভালো

হ'লে-ও, অনিমেষকে সে মুগ্ধ করলে-ও লুব্ধ করতে পারে নি। অথচ সিম্‌কিকে ছেড়ে তারা সিং পালাতেই যে সিম্‌কি অনিমেষকে বেশি ক'রে আঁকড়াতে চাইলো, সেটা-ও ঠিক খবর। তবু-ও সিম্‌কিকে সে মন্দ মেয়ে বলে না মনে। বিপন্ন, অসহায় কিশোরী কিছুটা ভালোবাসে যে-পুরুষকে, তাকে এ-অবস্থায় জড়িয়ে ধ'রে আশ্রয় খোঁজা স্বাভাবিক। অনিমেষ তার এযাবৎ-দেখা অনেক মেয়েকেই মনে করলো, কমলার সঙ্গে তাদের কারোরই তুলনা হয় না। কিন্তু কমলা এতো ভালো যে ওকে বিয়ে ক'রে সম্পূর্ণ অধিকার করা হয়তো চলবে না;—এই ধরণের একটি বিপরীত ভাবনা অনিমেষের মনে মধ্যে মধ্যে আসছিলো।

এদিকে কমলার মন অনিমেষের পৌরুষকে অবলম্বন করবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলো। কিন্তু দাম্পত্য যদি ঘটে তবে আধ্যাত্মিক জীবনকে সে ষোলো আনা নেবে কি ক'রে? যারা দুহাত মেলে রান্না আর কান্না দিয়ে সংসার আঁকড়ায়, কমলা তাদের দলে নয়। যারা হৃদয়ের খানিকটায় দেব-দ্বিজে অনুরাগ অর্পণ করে আর বাকিটা দিয়ে সংসার করে, কমলা তাদের দলে-ও নয়। কমলা যখন আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের সমাধির কাছে চুপটি ক'রে ব'সে থাকতো, তখন তার চিত্ত সেই শান্তি, নীরবতা আর শুচিতায় যে-একটি অহেতুক অচঞ্চল আনন্দ-রস পেতো, তার একটি উল্লাস আছে। কাজেই আধ্যাত্মিক জীবনে আনন্দ তো বাদ পড়ে না। অথচ বিবাহ আর সংসারের কথা ভাবলেই কমলার স্বচ্ছ মনে কোথায় যেনো আবরণ এসে পড়ে, সেটা তার অন্তরে অনভিপ্রেত।

নরেন্দ্রনাথ এতো কথা এমন ক'রে ভাবছেন না। সমস্ত-মনটা যদি কমলা-অনিমেষের জন্য ব্যস্ত করতেন তবে অনুরূপ হয়তো ভাবতে পারতেন তিনি। এখন তাঁর মনকে আন্না-বংশী অনেকখানি অধিকার ক'রে রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী পড়তে পড়তে অন্ততঃ সিকিখানা মন মাঝে মাঝে এই ভাবনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ছিলো।

গ্রন্থ যথাস্থানে রক্ষা ক'রে নরেন্দ্র আন্নার শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কন্যার বালিকা-বক্ষ আন্দোলিত হচ্ছে। নরেন্দ্র ভাবলেন কেন হিন্দুর ধর্মাচারে কুমারী-পূজোর ব্যবস্থা আছে। আন্নাকে পালন ক'রে

অনূঢ়, প্রৌঢ় নরেন্দ্রনাথ কুমারী-পূজাই ক'রে চলেছেন নিজের অজ্ঞাতে। এক সময় গভীর একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আন্না পাশ ফিরলো। নরেন্দ্রনাথ মুখখানি আর দেখতে পেলেন না।

আলো নিভিয়ে নরেন্দ্র শুয়ে পড়লেন। গোপী অনেক আগেই ঘুমিয়েছে। সন্ধ্যার কিছু পরেই সে শুয়ে পড়ে। অবশ্য বিশেষ কিছু কাজকর্ম থাকলে সানন্দে জেগে থাকতে পারে সে। ছেলেটা নরেন্দ্রনাথকে কোথায় যেনো ভক্তি করে; আন্নাকে ভালোবাসে। নরেন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়লেন। আন্না তখন গভীর ঘুমে স্বপ্ন দেখছে যে, বংশীধর ঝোলভাত পথ্য পেয়েছে। আন্নার দিকে চেয়ে দেখছে গভীর অনুরাগে। আন্নার আনন্দ আর ধরে না। স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভাঙ্‌লো না। স্বপ্ন শেষ হ'লো। আন্না আবার ঘুমুতে লাগলো।

আজ সকাল বেলাতে অনিমেষ আর কমলা এসে পড়েছে শান্তিনিকেতনে ওরা ঘনিষ্ঠ হ'তে চায়, নিভৃত অবসরে পরস্পরকে আরো কাছে পেতে চায় মেয়েদের মহলে কমলার এক কলেজ-সখী শিক্ষিকা হ'য়ে আছে। কমলা তারই অতিথি হ'য়ে আশ্রম-বালিকাদের নিবাসে তাদেরই সঙ্গে তিনদিন বসবাস করবে। অনিমেষ থাকবে পান্থশালায়।

প্রথম দিনটা থাকা-খাওয়া ইত্যাদি ঠিক করতেই অনেক সময় কাটলো। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের নানা বিভাগ দেখতে কেটে গেলো দ্বিতীয় দিবসের সকাল ও দুপুর। সন্ধ্যার দিকে কমলা ও অনিমেষ গ্রামের পথে চলতে থাকলো। আকাশে তারা ফুটেছে অজস্র। ফাঁকা মাঠ, তালতলী, শালবন ইত্যাদির মুক্তির মধ্যে এসে অনিমেষের মন মুখর হ'য়ে উঠলো মনে মনে। কমলা উদার প্রান্তরের এই ব্যাপ্তিতে অন্তরে গভীর হ'য়ে উঠলো। এখানকার মুক্ত প্রকৃতি দেখতে দেখতে ওর মনে পণ্ডিচেরির উদার সমুদ্র জাগিয়ে তুললো। যদিও পণ্ডিচেরি শহর; তবুও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম শহরের একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে। সমুদ্রতীরে। সমুদ্রের গাম্ভীর্য ও উদার শান্তি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের যথাযোগ্য পরিবেশ।

এক সময়ে দুজনে একটি উঁচু তলের উপর এসে বসলো। দূরে সাঁওতাল পাড়ার কলরব স্তিমিত হ'য়েছে। শান্তিনিকেতন হ'তে কিছু গানের সুর মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছে। প্রথম কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ রইলো। তারপর অনিমেষ বললো, "পণ্ডিচেরি কি যাবেই?"

"ইচ্ছে হচ্ছে নভেম্বরে রওনা হবো।"

"সেখানে, মানে, আশ্রমে তো আগে থেকে জানাতে হয়?"

"আমি জানিয়েছিলুম। উত্তর এসেছে। অনুকূল উত্তর।"

"তা হ'লে তো যাবেই। তবে 'ইচ্ছে হচ্ছে' বললে কেন?"

"যাবো। কিন্তু যেতে যেনো বাধা পাচ্ছি।"

"মানে?"

"সত্যি বলবো? রাগ করবে না?"

অনিমেষ বিস্মিত হ'লো। এই প্রথম 'তুমি' সম্বোধন করলো কমলা। অনিমেষ প্রায় পক্ষকাল পূর্বে হ'তে তাকে নাম ধ'রে ডাকছে এবং 'তুমি' বলছে। অনিমেষ বললো, "বলো। রাগ তোমার উপর কোনো কালেই কোনো কারণেই আর বোধহয় করতে পারবো না।"

"তোমাকে ভালোবেসেছি। বিয়েতে মত দিতে কোনো আপত্তি নেই মনে। তবুও কেবলি মনে হচ্ছে, তোমার সব দাবী কি মেটাতে পারবো?"

"দাবীর কথা উঠছে কেন? দাবী কি কেবল আমারই? তোমার-ও তো দাবী আছে? আমিই কি সে-দাবী মেটাতে পারবো তোমার?"

"আমার দাবী? কি জানি কী দাবী?"

"আর আমার কী দাবী?"

"কি জানি? কিন্তু পুরুষ মানুষ যে অনেক চায়।"

"তাই নাকি?"

"না; ঠাট্টার সুর নয়। তোমার ঠাট্টা আমার ভালো লাগবে না। তুমি ঠাট্টা করতে পারো না আমাকে।"

"বুঝিয়ে বলো কী তোমার সংশয়। আমি বুঝতে চেষ্টার ত্রুটি করবো না।"

"আমি পণ্ডিচেরিতে গিয়ে সাধনা করতে চাই।"

"সাধনা কি বিয়ে ক'রে ঘরে ব'সে সংসার করতে করতে হয় না?"

"না। ঠিক হয় না।"

"কে বলেছে?"

"আমার মন। দেখো অনিমেষ, তুমি পুরুষ মানুষ। অনেক মিশেছো, অনেক জেনেছো। আমি বি. এ. পাশ করেছি ব'লেই কিছু পণ্ডিত নই। আর মেলামেশা যা করেছি, বেশি নয়। কিন্তু কেমন যেনো মনে হয়, মেয়ে মানুষ আমি, বিয়ে করবো যখন, ছেলে-মেয়ের মা তো হ'তে হবে?"

"এখনই উত্তর দিতে চাই না। আরো বলো।"

"ছেলে-মেয়ে হ'লে তাদের পালনকরা, মানুষ ক'রে তোলা, সেই তে সাধনা। তখন কি আর ভগবানকে চাইতে পারবো?"

"কেন পারবে না?"

"সে-চাওয়া উচ্ছিষ্টের দান।"

"পরমহংস-ও বিয়ে করেছিলেন।"

"ও কী বললে তুমি? তাঁর বিয়ে কি তোমার আমার বিয়ে? সেই আশ্চর্য বিয়েই কি তুমি করতে যাচ্ছো নাকি? আর আমিই কি সারদা মণি?"

"বেশ, পণ্ডিচেরি তুমি যাও। কথা দাও, ফিরে এসে আমাকে নিশ্চিত ক'রে বলবে, অনিশ্চিত আর রাখবে না।"

"নিশ্চয় নয়। ফিরে এসে বলবো। ইতিমধ্যে জীবনের গতি স্থির ক'রে ফেলবো।"

"ততোদিন কী নিয়ে থাকবো? একটা কিছু দাও।"

"বুঝতে পারছি না। তোমাকে কী দেবো আমি?"

"একটা চুমু খাবো তোমাকে?"

"এইখানে?"

"ধারে-কাছে কেউ নেই।"

"খাও, বাধা দেবো না।"

"না, থাক্। তোমাকে আজ সম্পূর্ণ চিনে নিলুম।'

"দোষ হ'লো?"

"কিচ্ছু দোষ হয় নি। আশ্চর্য নারী তুমি কমলা। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের কুমুদিনী নও তুমি। তোমার তুলনা তুমিই। প্রেমে আমাকে অন্ধ করেছে কিনা জানি না। মনে হচ্ছে করেনি। আমি ঠিকই দেখছি। ঠিকই বলছি। জীবনে মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি। অন্যায় কিছু করি নি। কিন্তু তোমাকে এর আগে দেখি নি। মানে, তোমার মতো মেয়েকে।"

"সিম্‌কির সঙ্গে একটু বেশি মিশেছিলে, না?"

"ওর কথাই বলতে যাচ্ছিলুম। সিমকিকে অনেকবার চুমু খেয়েছিলুম।

একবার খুব মত্তভাবে চুমু খেয়েছিলুম। তাতে সিমকির সমস্ত দেহ শিথিল হ'য়ে গিয়েছিলো। বুঝেছিলুম, সে-মুহূর্তে আমি যা চাই তাই করতে পারি। বুঝতে পারছো কী বলছি?"

"কেন পারবো না? অন্যায় কিছু করিনি ব'লে কি আমি প্রবৃত্তির টানকে চিনি না?"

"কি ক'রে চিনলে?"

"লজ্জা হ'চ্ছে বলতে।"

"আমার কাছে লজ্জা ক'রো না।"

"করবো না। এই মুহূর্তের কিছু আগে, কথা বলা শুরু হওয়ার আগে, চুপ-চাপ ব'সে থাকার সময় মনে হচ্ছিলো তোমাকে জড়িয়ে ধ'রে পাগলের মতো আদর করি। কিন্তু পরক্ষণেই সংযত হ'য়েছি।"

"কমলা, তোমার মতো স্বচ্ছ চেতনার মেয়ে একটা সম্পদ। আবার বলছি, এ-রকম দেখিনি এর আগে। আর কেউ কি দেখেছে? কি জানি?"

"আমি দোটানায় পড়েছি। তুমি টানছো বুকের শিরায় শিরায়। আশ্রম টানছে—কি জানি, ঠিক বলতে পারছি না।"

"চলো, উঠি। কালকে রওনা হবো। নভেম্বরে তুমি যেয়ো পণ্ডিচেরি। সংকল্প স্থির ক'রে এসো। যদি থেকেই যাও সেখানে, আমি দুঃখিত হবো না।"

"বীর-পুরুষ তুমি। আচ্ছা অনিমেষ, আমি ছাড়া আরো তো কতো ভালো মেয়ে আছে সংসারে, আমি যদি না ফিরি, তুমি তাদের কাকে-ও তো বিয়ে করতে পারো।"

"তাদের ঠিকানা তোমার কাছে জেনে নেবে। আমার জানা নেই।"

"না। ঠাট্টা করবে না। তোমার ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

"কেন বলো তো?"

"তোমার সঙ্গে এতোটুকু গরমিল সইবে না আমার।"

ওরা দু'জন শান্তিনিকেতন এলাকায় এসে পড়লো যখন, তখন সঙ্গীত-বিভাগের হেথা-হোথা গানের সুর উঠছে, শালগাছের মধ্যে বাতাস

সির্ সির্ করছে, আমলকির পল্লবে সাড়া জাগছে, আমবাগানে ছায়া যা রচনা করছে তাতে বিলাসীর মোহ আসে, কবিচিত্তের কল্পনা রসায়িত হয়, প্রণয়ীচিত্তে আবেশ ঘন হ'য়ে ওঠে।

কমলা ও অনিমেষ এক সময় পরস্পরের হাত পরস্পরে কিছুক্ষণ ধ'রে রেখেছিলো। অনুভূতিটা উত্তাল ছিলো না বটে, কিন্তু তাতে মোহ ছিলো।

ওরা যে-যার আবাসের দিকে রওনা হ'লো।

তখন রাত্রি গভীর। দক্ষিণ কলকাতার যে-অংশে পুষ্পকণাকে অত্যন্ত আরামে, স্বস্তিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছে চমৎকার ছোট্ট বাড়িখানিতে আমাদের উন্নতিশীল কণ্ট্র্যাক্টর্ নটবর, সে-অংশও নিঝ্ঝুম, স্তিমিত। রাস্তায় নির্জনতা; রাত্রির স্তব্ধতা। ভবনে-ভবনে শিশু নিদ্রিত, যুবক-যুবতী ও অনেকেই নিদ্রায় অচেতন। আর কারো কথা জানি না, কিন্তু নটবরের ছোট্ট বাড়িখানির উপরতলার শয্যাকক্ষে সুকোমল শয্যায় পুষ্পকণা ও নটবর বিনিদ্র। দম্পতি যখন সংঘর্ষের পালা নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তখন কলহের প্রারম্ভে, মধ্যে বা শেষে বিনিদ্র যামিনীই যাপন করে তারা। পুষ্পকণা ও নটবরের মধ্যে বাহিরে কোনো বিরোধ নেই। উভয়েই উভয়কে নির্বিরোধ থাকতে দিতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু ভিতর মহলে মনের অন্দরে যে-বিরোধ প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত কীর্তি, তার গতি রোধ করবে কে? তবু সে-বিরোধ মাত্র দীর্ঘশ্বাসই ফেলে এই দম্পতির জীবনে; বিষফণা গর্জে তোলে না। তা ছাড়া সম্প্রতি, খুব সম্প্রতি অর্থাৎ এইক্ষণে নটবর অম্লান বদনে, অকপট-চিত্তে তার শিথিল প্রবৃত্তির কথা, পণ্যনারীর প্রতি আসক্তির কথা পুষ্পকণাকে ব'লে যাচ্ছিলো। বলছিলো, যেখানে-সেখানে যখন-তখন যা-তা দাম দিয়ে সে যথেচ্ছাচার করেনি কখনো। তবে দামী গণিকার কাকে-কাকে বা সময়-সময় অনুগ্রহ করেছে। তাতে তাদের পণ্যমূল্যের চেয়ে বেশি দাম পেয়ে গেছে তারা। কাজেই, ব্যবহারটা যারা সুধু কড়ি ফেলে তাদের চেয়ে আরো একটু আন্তরিক আর ভদ্র তার ভাগ্যে জুটেছে। পুষ্পকে বিবাহ করার পর মাত্র একটি সিন্ধী মেয়ের কাছে যেতো সে। যাকে হার উপহার দিয়েছিলো। এখন আর সে কোথাও যায় না।

এই ভাবে কাটছিলো তাদের বিনিদ্র রাত্রি। কলহ নয়; বোধ হয় এক ধরণের কলহান্ত। পুষ্প তার কথায় বিশ্বাস করলো। তার পর পুষ্প জানতে চাইলো নটবর-ও কেন তাকে সন্দেহ করে না। স্বাধীন মেয়ে অনেক বয়স পর্যন্ত বিবাহ না ক'রে বাইরে ঘোরাফেরা করলে অনেক পুরুষই তো তাদের বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিত হয়; ইতস্ততঃ করে তাদের সতীত্ব স্বীকার করতে।

পুষ্পকণার এ-প্রশ্নে বিশেষ কোনো উত্তর এলো না নটবরের দিক থেকে। সে শুধু বললো, "না।" পুষ্প তাতে আশ্বস্ত হ'য়ে নিজেই জীবনকৃষ্ণের সংগে তার যেটুকু ঘটেছিলো, তার কিছুটা, মাত্র কিছুটা বিবৃত করলো। বুঝলো, এইটুকুতে নটবরের কিছু এলো-গেলো না। ব্যস্, এর বেশি সে বলবে না। কেনই বা বলবে?

কথা এই, পুষ্পকণার অন্তরে ধীরে ধীরে একটি গর্ভধারিণী জেগে উঠছে। সে সরল মনে নটবরকে চাইছে। নটবর পূর্বে যা-ই ক'রে থাকুক, তার সাম্প্রতিক শুচিতা পুষ্পকে নিশ্চিন্ত মনে ভাবী সন্তানের জন্য পায়ের মোজা আর মাথার টুপী বোনায় একটি সত্য উৎসাহ এনে দিলো।

ঘড়িতে যখন দুটো বাজলো, তখন নটবর পুষ্পকে গাঢ় আলিংগনে বেঁধে নিদ্রিত হ'লো। দু'জনেই পরম আশ্বাসের আকাঙ্ক্ষী।

মানুষ মনস্ক জীব ব'লে প্রবৃত্তি নিয়ে-ও সে জল্পনা করে। জীবন নিয়ে অল্প-বিস্তর ভাবনায় ভুগতে হয় বা ভাবনার জালে জড়িত হ'তে হয় অল্প-বিস্তর সকলকে। পুষ্পকণা ও নটবর এতোদিনের যৌবন-জীবনে যেটুকু ভেবেছে তাতে তাদের মননশক্তি এবার অসহায় বোধ করেছে। তাই দুটি নিঃসহায় মন তাদের ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে পরস্পরকে আশ্রয় করতে চাইছে।

সেদিন হঠাৎ বাণী হালদার পুষ্পকণার বাড়ি এসেছিলো। অকস্মাৎ তার আগমনে পুষ্পকণা একটু বিস্মিত হ'য়েছিলো বৈ কি। পুষ্পকণার ঘর-বাড়ি, আসবাব-পত্তর দেখা মাত্রই বাণীর চোখে যে-কৌতূহল ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠেছিলো, সে-কৌতূহল কৌতূহল মাত্র নয়। একটা সহজাত ঈর্ষা জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠেছিলো। কেমন ছোট্ট সুন্দর বাড়িখানি। কেমন অভিজাত পল্লীর কেন্দ্রে তাদের বাস। ছোট্ট হ'লে-ও বাড়িখানি গৃহস্বামীর সচ্ছলতাই কেমন সংক্ষেপে সূচিত করছে। ঘরগুলি কেমন ছিম্-ছাম্। আসবাব-পত্র কেমন একটি মর্যাদা প্রকাশ করছে। শয়নঘর, বসবার ঘর, রান্নার ঘর, স্নানের ঘর সবই পরিপাটি। আয়না, দেরাজ ইত্যাদি চমৎকার। পরিচ্ছদ যে-দেরাজে রয়েছে তার ডালা না খুললে-ও বাণী বুঝলো, অনেক জর্জেট, অনেক নাইলন, অনেক দামী টিসু ইত্যাদিতে দেরাজ ঠাসা। শোবার

খাটখানি অন্যান্য আসবাবের অনুপাতে অধিকতর মূল্যবান। বোঝা যায়, এইটুকু গৃহস্বামীর বিশেষ বিলাস।

অবশ্য বাণী যতোক্ষণ ছিলো ততোক্ষণ নটবর ছিলো অনুপস্থিত। প্রথমটা বাণীর সঙ্গে পুষ্প থম্‌কে থম্‌কে কথা বলছিলো। এ-ভাবে পুষ্পকণার গার্হস্থ্যের মধ্যে বাণী হালদারের অপ্রত্যাশিত আগমন তাকে বিব্রত করেছিলো প্রথমটা। তারপর ঘড়ির কাঁটায় মিনিটগুলোই হ'লো সহায়। ওদের আলাপ সহজ হ'য়ে উঠলো। কলেজের অর্থাৎ য়ুনিভার্সিটির কথা উঠলো। ইচ্ছে ক'রে পুষ্প অধ্যাপক অতনু সেনের কথা পাড়লো। কারণ আর কিছু নয়, অতনু সেন একটু বেশি মেয়ে-ঘ্যাঁসা অধ্যাপক ছিলেন। বিলেতে গিয়ে সাইকলজিতে ডিগ্রি এনেছিলেন ভদ্রলোক। নিশ্চয় সেখানে মেয়েদের সঙ্গে ধর্মঘট ক'রে কাটান নি। তবু-ও এদেশে এসে, অন্ততঃ য়ুনিভার্সিটি মহলে মহিলা ছাত্রীদের সঙ্গে অতনু অতনু-পীড়া প্রকট না করলে-ও অতনুর কিছুটা আবেশে বেশ একটু মোলায়েম হ'য়ে থাকতেন সর্বদা। পুষ্পকণার বিস্ময় লাগতো, অতনু সুন্দরী মনোমালাকে নিয়েও যেমন লালিত-লাবণ্য বিলাতেন, ধুম্‌সি-ভোঁট্‌কি বাণীকে নিয়েও তেমনি মাধুর্যের সুর্মা-কাজল আঁকতেন।

এক সময় পুষ্প বললো, "তুমি তা হ'লে আমার বোনের ফাঁকা জায়গায় বসছো?"

"নতুন জায়গা দখলের যোগ্যতা কই?"

"বিধবা ব'লে?"

"কবে জানলে ঠিক ক'রে?"

"বরাবরই ওটা চেপে যেতে তুমি। জেনেছি জীবনকৃষ্ণের কাছে।"

"তোমার ভগিনীপতি।"

"তুমি আমার ভগিনী হ'তে চলেছো।"

"তাই যদি স্বীকার করতে পারো, খুশি হবো।"

"পারবো না কেন?"

"যে-ভাবে ওকে ছিনিয়ে নিয়েছিলে য়ুনিভার্সিটিতে?"

"বোনের জন্য।"

"সেটা বুঝতে পারলুম পরে।"

"বোনটির জন্য না হ'য়ে নিজের জন্য হ'লে স্বাভাবিক হ'তো।"

"আমি তখন অস্বাভাবিক ছিলুম। অনেকেই থাকে। মেয়েরা।"

"সাইকলজি।"

"বইপড়া সাইকলজি নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।"

"থাক্, ওসব কথা পুরোনো।"

"নতুন কী বলবো বলো?"

"কবে মা হচ্ছো?"

"দেরি আছে।"

"আনন্দ হচ্ছে?"

"আপাততঃ শরীরটা স্বস্তিতে নেই; কাজেই মনের আনন্দ দেহের অস্বস্তিতে চাপা রেখেছে।"

"কি জানি, মা হওয়া নিয়ে কলেজে কতকগুলো মেয়ে তো বিশ্রী আলোচনা করতো।"

"ও-রকম মেয়ের বেশ্যাবৃত্তি করা ভালো।"

"অতো বিশ্রী ক'রে বোলো না। তবে এখন স্বাদ পেয়েছো তুমি মাতৃত্বের, তাই বলছো।"

"তোমাকে-ও যেনো বেশি দিন শূন্য কোলে থাকতে না হয়।"

"বয়স হ'য়ে গেছে। তোমার মতো নয়।"

"ওতে এসে যায় না। অভিজ্ঞতার বয়স তো পাওনি? এর আগে মা হ'য়েছিলে নাকি?"

"ছি।"

"ছি-র কী আছে। বিয়ে তো হ'য়েছিলো?"

"ওঃ, তাই বলো। না ভাই, নিতান্ত শৈশবে স্বামীহীনা। ভদ্রলোককে মনেই পড়ে না।"

"বাস্তবিক, তোমার যৌবনটা খুব লড়াই ক'রে কেটেছে ভাগ্যের সঙ্গে। সে-তুলনায় আমরা যাকে বলে—রুপোর চামচে মুখে দিয়ে চলেছি।"

এর পর দু'জনে মিলে বেশ একটা সখিত্বের সুরে কথা বলাবলি চললো। পুষ্পকণা বাণীকে নিজের দেরাজ খুলে কাপড়-চোপড়, গহনা-পত্র দেখালো। বাণীর ঈর্ষা কতোখানি হ'লো বোঝা গেলো না। তবে এটা ঠিক যে, এই সব ঐশ্বর্য দেখে বাণী বিহ্বল হ'য়ে গিয়েছিলো। নটবরের ধনশালিতার মাপটা ঠিক ধারণায় আনতে পারলো না। এক-একবার বাণীর মনে হ'লো নটবরের বোধ হয় অনেক টাকা আছে। ছোট্ট বাড়িতে থাকা সেটা চাপা দেওয়া। বাড়ি ছোট্ট হ'লে-ও সামান্য নয় অবশ্য।

চ'লে যাবার মুখে বাণী পুষ্পকণার দুটো হাত ধরলো। পুষ্প মনে বুঝলো সে যেনো কিছু বলবে। সত্যিই তাই। বাণী বললো, "পুষ্প, বিয়ে হ'লে আবার আসবো মাঝে মাঝে। বিরক্ত হবে না তো? জীবন নাই আসুক, আমি আসবো। সহপাঠিণী আর নই, বোনের সতীন-ও ভাবতে পারবে না আমাকে। আমরা দু'জনে সখী থাকবো। দেখতে আমাকে ভালো নয়, জানি। কুচ্ছিৎ বন্ধু-ও তো এক-আধজন থাকে।" কথাটা শেষ হওয়া মাত্র পুষ্পকণা বললো, "আমি কি অপ্সরা?" শুনে বাণী খুশি হ'লো মনে। অবশেষে বিদায়ের পালা শেষ হ'লো।

সোফায় ভারাক্রান্ত দেহ শিথিল ক'রে তখন পুষ্পকণা ভাবী সন্তানের মোজা বুনতে থাকলো। আর একটুখানি বুনলেই মোজা দুটোর সমাধা। টুপীটা-ও অনেকখানি করা হ'য়েছে। মোজা শেষ হ'লে টুপীর বাকি কাজটায় হাত দেবে।

বোনার কাজ কিছুটা এগিয়েছে এমন সময় নটবর এলো। প্রসন্ন-হাস্যে স্ত্রীকে সস্নেহ দৃষ্টি দান ক'রেই নটবর নানা রকম খাবার-দাবারের প্যাকেট রাখতে শুরু করলো। বিস্ময়ে চোখের তারা নাচিয়ে পুষ্প বললো, "তোমার ব্যাপার কী বলো তো? আমি কি রাক্ষুসী?"

"রাক্ষুসী কেন হ'তে যাবে? একটু একটু খাবে। বাকিটা নেবার লোকের অভাব হবে না। ঝি-চাকর আছে।"

"সত্যি, এক এক সময় কতো রকম যে খেতে ইচ্ছে করে। ভাবি, এতোকাল শুনেই আসতুম, লোভ যে এতো বাড়ে তা জানতুম না।"

"লোভ নয়, স্বাদ।"

"হ্যাঁ, স্যার।"

ব্যস্। এর পর আর ও-পথে কথা অগ্রসর হ'তে পেলো না। নটবর অকস্মাৎ সুসংবাদ দিলো, "সাহেবটা ঘুষ খেয়ে ত্রিশ হাজারের কণ্ট্র্যাক্টা দিয়েছে। লাভ থাকবে অন্ততঃ সাত হাজার। আবার কথা দিয়েছে, এর পরের কণ্ট্র্যাক্টা-ও আমাকে দেবে। সেটা ত্রেত্রিশ হাজারের ফর্দ। ব্যাটা ইংরেজরা যে এতো ঘুষখোর হয় জানতুম না।"

নটবরের কথায় পুষ্প মদবিহ্বল হ'লো। অর্থাৎ স্বামী অজস্র অর্থ উপার্জ্জন ক'রে আশ্রিতা স্ত্রীরত্নকে স্বেচ্ছায় যদি তা পায়ে ঢেলে দেয়, তবে কোন্ স্ত্রীলোক না খুশি হয়? স্ত্রীলোক কি সত্যই বোকা? না, সরল? আর ওরা যদি সরল হয়, পুরুষ কি আরো সরল নয়? থাক্ ওসব জল্পনা। মোটা কথায় হচ্ছে পুষ্পকণার জীবন এখন যে-অধ্যায় রচনা করছে, সংসারে সে-অধ্যায় নতুন নয়। মেয়েরা রক্ষিতা থাকতে চায়। কথাটা নটবরের মনের মতো। জীবনকৃষ্ণের কিছুটা। অনিমেষের কথা জানিনা। নরেন্দ্রনাথ 'বুঝি না'। কমলা শুনে ঘেন্নায় ম'রে যাবে।

কমলা পণ্ডিচেরি চ'লে গেছে। জীবনকৃষ্ণ খোঁজ নিয়ে জেনেছেন তাঁর চাকরি এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হবে। অনিমেষ ততোদিনে কাজ পেয়ে যাবে। নরেন্দ্রনাথের তৃতীয় বইখানি বেরিয়ে যাবে ততোদিনে। আন্নাকালি আগামী বৎসরে ম্যাট্রিক দেবে না বোধ হয়। সে এখন এতো মনমরা যে, ও-সব কথা নরেন্দ্রনাথ তার কাছে তোলেন না। বংশীর রোগ অত্যন্ত সংকটময়।

কমলা আশ্রমে গিয়ে নরেন্দ্রকে যে চিঠি লিখেছে তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বংশীর কথা আছে। কমলা অনিমেষকে ভালো একখানি পত্র দিয়েছে। তার স্বচ্ছ ভাষার লেখাটুকু অনিমেষ সযত্নে তুলে রেখেছে। এক জায়গায় পত্রে আছে, "গিয়ে তোমাকে নিশ্চিন্ত করবো। তুমি যেনো দুর্বল হ'য়ো না। দুর্বল পুরুষ ভারি দুঃখু দেয়। তুমি অবশ্যই দুর্বল নও, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।"

পত্র পেয়ে অনিমেষ ঠিক বুঝলো কি যে, এ-মেয়ে মীরাবাঈ-এর জাত? স্বামীকে পথ দেখাতে পারে? পৌরুষ-অভিমানীদের তাতে ক্ষোভের কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সত্যাশ্রয়ী পুরুষের তাতে গ্লানির কারণ নেই। ছোটো-বড়ো, লঘু-গুরু, উচ্চ-নীচ—এই যে একটা ভেদা-ভেদ নারী-পুরুষে গ'ড়ে উঠেছে, এটা সুচিরাগত হ'লে-ও সনাতন নয়, সত্য নয়।

সেদিন নরেন্দ্রনাথ আন্নাকালিকে নিয়ে প্রেসে গেলেন। মেয়েটা বড়োই মনমরা হ'য়েছিলো। বাপ মেয়েকে বলেছিলেন, "চল্-না, বংশীকে দেখে আসবি?" মেয়ে সে-কথায় চোখ ছল্ ছল্ ক'রে বললো, "খুব রোগা হ'য়ে গেছে তো? কী দেখতে যাবো? কষ্ট হবে আমার। তুমি দেখে এলেই আমার খবর জানা হয়।"

আন্নাকালিকে নরেন্দ্রনাথ বললেন, "তোকে সঙ্গে নিয়ে আজ একখানি বিদেশী সিনেমা দেখবো। কলকাতায় জোয়ান দার্কের কাহিনী ছবিতে দেখাচ্ছে। ও-কাহিনী তোকে পড়িয়েছি। তোর ভারি ভালো লেগেছে। ছবি

দেখলে খুব ভালো লাগবে।"

অফিসের কাজ সেরে ভুবনবাবুর গাড়িতে ক'রে চৌরঙ্গি অঞ্চলে ছবিঘরে এলেন। ভুবনবাবু চালককে ব'লে দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথকে সিনেমায় পৌঁছে দিতে এবং শেষ হ'লে তাঁদের নিয়ে আসতে। চৌরঙ্গি অঞ্চলেই তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ। তিনি নিমন্ত্রণ সেরে ছবিঘরেই যথা সময়ে হাজির হবেন। নরেন্দ্রনাথ ও তিনি অর্থাৎ আন্নাকালি সমেত, বাড়ি ফিরবেন।

ছবি দেখতে প্রথমটা আন্নার মন যাচ্ছিলো না। বংশীদার কথা কেবলি মনে হচ্ছিলো। ক্রমশঃ ছবির আকর্ষণ হ'লো প্রবল; কাহিনীর টান হ'লো বেশি। আন্না জোয়ানের মধ্যে ডুবে গেলো। দেবদূতের ব্যাপারটি তার অন্তরে গভীর রেখাপাত করলো।

পথে ফিরবার সময় গাড়িতে আন্না অনর্গল ছবির কাহিনী ব'লে যেতে লাগলো তার ভালো লাগার রসান দিয়ে। নরেন্দ্রনাথ আনন্দ পেলেন কন্যার উল্লাসে। মনমরা মেয়েটা মনখুশি মুহূর্তে পেতেই মানসকন্যাজনক নরেন্দ্রনাথ মানসলোকে অপূর্ব পুলক পেলেন।

বাড়ি এসে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন গোপী রান্না ক'রে রেখেছে কথামতো। এদিকে ভুবনবাবু পথ থেকে নানাবিধ খাবার কিনে আন্নাকে উপহার দিয়েছেন। বিশ্রাম নিয়ে বাপ-বেটিতে খেতে বসলো। গোপী-ও নানাবিধ মিষ্টান্ন পেয়ে খুশি। খেতে ব'সে মাঝে মাঝে আন্না অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিলো। নরেন্দ্রনাথ ভাবছিলেন জোয়ান আন্নাকে দখল করেছে। ভুল। এক সময় যখন প্রশ্ন করলেন, "আন্না, জোয়ানকে কেমন লাগেরে?"

"খুব ভালো। অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু আমি জোয়ানের কথা ভাবছিলুম না।"

"তবে?"

"বংশীদার কথা ভাবছিলুম। বাবা, বলো তুমি, বংশীদা ভালো হবে তো? আমার বড্ড ভয় করছে। বাবা, বাবা, আর খাবো না। ঐ যে শুনতে পাচ্ছো না?"

"কি রে? ভয় পেলি কেন? ওকি আন্না, এমন ক'রে জড়িয়ে ধরছিস

কেন রে? আন্না ঘরে যাবি? চল্, হাত ধুয়ে বসি একটু।"

"না, না।.........এ কী হ'লো? বংশীদা কোথা গেলো? বাবা, বংশীদা কোথায়? বাবা, বংশীদা যে নেই।"

উচ্ছ্বাসিত ক্রন্দনে কিশোরী আমিনা নরেন্দ্রনাথের বুক ভাসিয়ে দিলো। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত। বুঝতে পারলেন না কন্যার এতোখানি বিহ্বলতার হেতু কী? ভাবনায় বিপর্যস্ত হয় মন। আন্নার বংশীকে ভালোবাসা অপূর্ব ভালোবাসা। কিন্তু এ কী বিহ্বলতা?

একটু সুস্থ হ'লো মেয়ে। বললো, "বাবা, একটা কালো মেঘ যেনো একটা পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে লাথি মারছিলো। মেঘগুলোর তো চেহারা থাকে? এই মেঘটার ছিলো বিরাট এক রাক্ষুসে মূর্তি। দুর্গা ঠাকুরের চোরার মতো রাগী। বাবা, কালই বংশীদার খোঁজ নিয়ো। আমি ভয় পেয়ে গেছি। না, না। তা হয় না। মা-কালীকে কতো ক'রে বলেছি; 'মাগো, বংশীদাকে ভালো করো। ওকে বিয়ে করবো। খুব ভালোবাসি ওকে।' "

এই কথা ব'লে আন্না নরেন্দ্রনাথের মুখে চাইলো। বংশীকে সে বিয়ে করবে, এ-কথা ব'লে ফেলায় তার মন এলোমেলো হ'য়ে গেলো। আশ্চর্য ভাবুক এই নরেন্দ্রনাথ। আশ্চর্য ভালোবেসেছেন তিনি মেয়েকে। অম্লান বদনে তৎক্ষণাৎ বললেন, "বংশীর সঙ্গে আমার আন্নার বিয়ে দেবো ব'লেই আমি রোজ রোজ ঠাকুরকে ডাকি। তুই ভাবিস নি, আনি।"

এর পর আন্নাকালি আবার খেতে শুরু করলো। নরেন্দ্রনাথ দেখলেন অনেকটা বেশি সে আজ খেলো। কাঁচা গোল্লাটা খেয়ে বললো, "সন্দেশটা ফার্ষ্ট ক্লাস। সন্দেশের চেয়ে আর ভালো মিষ্টি নেই, না বাবা?" নরেন্দ্রনাথ জানালেন তাঁর-ও সেই মত।

খাওয়া হ'য়ে গেলো। গোপী সব পরিষ্কার করলো। দোর-তাড়া বন্ধ করলো। বাপ-বেটি সতরঞ্চ পেতে বসলো। আন্না নরেন্দ্রের গা ঘেঁসে বসলো। নরেন্দ্র কথা বলতে বলতে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। নরেন্দ্র বললেন, "বংশী সেরে যাবে। ওর পড়া-শুনা এখন বন্ধ থাকবে। হাওয়া বদল করতে যাবে। আমি-ও বুড়ো হচ্ছি, আনিকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাবো। একই জায়গায়। এক মাসে বংশীকে যদি চাঙ্গা ক'রে

তুলতে না পারি তবে কি আর বলেছি।"—এই পর্যন্ত শুনতেই আন্নার চোখ মুদে এলো। নরেন্দ্রনাথ বললেন, "শুবি? চল্, আজ একসঙ্গে শোবো। কেমন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখন নয়। এখন তোমার কোলে মাথা রেখে এইখানে শুই। তুমি বলো। গল্প বলো। বংশীদার কথা বলো। বড়ো হ'লে বংশীদা কতো বিদ্বান হবে—এই সব বলো। আমি 'হুঁ' না দিলে-ও ব'লে যাও।"

নরেন্দ্র কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে অনেক কথা রচনা ক'রে চললেন। আন্না ঘুমিয়ে পড়লো। নরেন্দ্রনাথ তাকে কোলে ক'রে নিজের বিছানায় শোয়ালেন। তার ঘুম ভাঙ্লো না।

নিজে যখন বিছানায় শুলেন মেয়ের কপালে একটি মৃদু চুম্বন ক'রে, তখন হঠাৎ তিনি যেনো শুনলেন, "মাস্টার মশাই, আমি কি ভালো হবো না?" চম্‌কে উঠলেন তিনি। তাঁর হাত ন'ড়ে গেলো। আন্নার ঘুম ভাঙে নি ভাগ্যে। নরেন্দ্রনাথ বংশীর জন্য চিন্তিত হ'লেন।

আজ বৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়িতে ইস্কুলের সম্পাদক আর সভাপতি এসেছেন। এইখানে ব'সে আজ তাঁরা বিশেষ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান ইস্কুল সম্পর্কে। ইস্কুল থেকে জীবনকৃষ্ণ অবসর নেবেন। তাতে সকলেই খুশি। মানুষটি ভালোমানুষ; কিন্তু অপদার্থ। অথচ যথেষ্ট ডিগ্রি থাকার জন্য জোর ক'রে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া কমিটির পক্ষে দুঃসাধ্য। আরো ভালো চাকরি পেয়ে তিনি যখন নিজেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন, তখন ব্যাপার গোলমেলে হ'লো না আর। কিন্তু ইস্কুলটাকে কার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? ডিগ্রিতে আর তাঁদের আস্থা নেই। বাইরে থেকে আবার কোনো এম. এ. বি. টি. নিয়ে এসে বা এম. এড্. নিয়ে এসে দুর্ভোগ ভুগতে তাঁরা আর চান না। ইচ্ছা এই যে, নরেন্দ্রকে আবার হালে বসিয়ে জগত্তারিণী তরণী বাহনে নিশ্চিন্ত হওয়া। কিন্তু নরেন্দ্রের না আছে বি. টি. ডিগ্রি, না আছে এম. এ. ডিগ্রি। এদিকে কিন্তু নরেন্দ্রনাথের নাম সাহিত্য-মহলে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে তাঁর "বর্তমান ভারত" কাগজখানার জন্য। তা ছাড়া শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ লেখার জন্য, এবং সে-বই বহু গুণীজনের সমাদর পাওয়ায় নরেন্দ্রকে সুধীরবাবু-ও আর অশ্রদ্ধা করতে পারছেন না। শিক্ষাবোর্ডকে অনুরোধ করবেন তাঁরা নরেন্দ্রকে প্রধান শিক্ষকের পদ দিতে বিশেষ একটা ব্যতিক্রম হিসেবে। কিন্তু এ'রা জানেন না অনেক অবিদ্বান ও অক্ষম ব্যক্তি রাষ্ট্রের হাল ধরলে-ও সত্যিকারের বিদগ্ধজনকে রাষ্ট্রনায়করা তথা শিক্ষা-বিভাগের নায়করা উচ্চপদে বহাল করবেন না। স্বাধীন ভারত স্বাধীনতা-প্রাপ্ত বেহিসেবী নাবালক কিনা।

অবশ্য, বৃন্দাবনচন্দ্র একটা মতলব ভেঁজেছেন। তাঁরা বটতলা ইস্কুলকে সরকারী সাহায্য থেকে রেহাই দেবেন। ইস্কুলের আয়ই যথেষ্ট। তাতেই ইস্কুল চ'লে যাবে। বে-সরকারী ইস্কুলে কাজ করবার জন্য ইচ্ছুক শিক্ষক পাওয়া অবশ্যই কঠিন হবে না। তা ছাড়া বৃন্দাবনচন্দ্র নিজে একটা মোটা অঙ্কের টাকা দেবেন ইস্কুলকে স্থায়ী অর্থভাণ্ডার তৈরি করবার জন্য এবং

তাঁরা সকলে মিলে শহরের সকলের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেবেন এবং বাইরে থেকে ধনীজনের আনুকূল্য সংগ্রহ করবেন। তার ফলে যে-একটি অর্থভাণ্ডার গঠিত হবে, বে-সরকারী ইস্কুলের পক্ষে সেই জোরটাই ইস্কুলকে স্বাধীনভাবে চলতে দিতে পারবে। কেবল নরেন্দ্র রাজি হ'লেই হয়।

নরেন্দ্র এখন যে-ভাবে জীবনযাপন করছেন, তাতে তাঁর অর্থাভাব নেই। সুনাম ও ভালো উপার্জন সত্ত্বে-ও তিনি ইস্কুলে কাজ নেবেন কেন? সত্য কথা। কিন্তু মানুষটি শিক্ষাকে এতো আন্তরিক ভালোবাসেন যে, ইস্কুলের প্রতি তাঁর একটি অকপট মমত্ব আছে। বৃন্দাবনচন্দ্র বলেন, একজন এম. এ. বি. টি. ভালো শিক্ষক দেখে সহকারী প্রধান শিক্ষক রাখলেই চলবে। নরেন্দ্র তদূর্ধ্বে থাকবেন প্রধান রূপে। নরেন্দ্রকে ইস্কুলের কাজে গতর দিয়ে সামান্য খাটলেই চলবে। তিনি তাঁর লেখা আর কাগজ নিয়ে থেকে-ও ইস্কুলের পরিচালনা অনায়াসেই করতে পারবেন।

এই সব আলোচনা চলছিলো এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে চা-খাবার এলো। সকলেই আপ্যায়িত হ'লেন। বিশেষতঃ সুধীরবাবু অনেক-বারই সিঙাড়ার প্রশংসা করতে থাকলেন থেকে থেকে। বললেন, "এমন সিঙাড়া নিশ্চয়ই দোকানের নয়?" উত্তর দিলেন বৃন্দাবনচন্দ্র। বললেন, "বউমা করেছে।" সুধীরবাবু সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, "তা বটে, তা বটে। আপনার ছেলে-বউ তো এখন এখানেই বাড়িতে এসে আছে।"

এ-কথার ইঙ্গিত বৃন্দাবন অনুভব করলেন। এড়িয়ে গেলেন এ-প্রসঙ্গটা। ক্রমে কথা উঠলো কন্যা কমলা এবং আশ্রমের। সুধীরবাবু আরো পাঁচটা বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘোরতর সংসারীর মতো বিবেকানন্দ তো পড়েনই নি; শ্রীঅরবিন্দ তো পরের কথা। বিবেকানন্দ সম্পর্কে এইটুকু খেয়াল তাঁর থাকে যে, বেলুড় মঠে উৎসবে -পর্বে তিনি যান। পাত পেড়ে প্রসাদ খান না বটে, তবে বক্তৃতাটা একটুক্ষণ শোনেন এবং মন্দিরে গিয়ে একটি আনি দক্ষিণা দিয়ে নমস্কার ক'রে আসেন।

সুধীরবাবু বললেন, "মেয়ে তো ভুবনবাবুর ছেলে অনিমেষকে বিয়ে করবে শুনেছি, । অতো আশ্রম-টাশ্রম কেন?"

"কি জানেন সুধীরবাবু, কন্যা আত্মজা কিন্তু ওর আত্মাটি আমার

দেওয়া নয়।"

"বুঝলুম না।"

"জানেন তো, অতি বড়ো মহৎ ব্যক্তির সন্তান হয় অতিবড়ো পাষণ্ড, এ-দৃষ্টান্ত সংসারে আছে। তেমনি আমার মতো প্রায়-নাস্তিকের ঘরে কমলার মতো সাত্ত্বিক সন্তান এসে পড়েছে। মেয়ের অন্তরে একটা সত্যিকারের টান আছে ভগবানের জন্যে।"

"বটে? তা, ফিরবে কবে আশ্রম থেকে? এইটি তো তার দ্বিতীয়বার যাওয়া, নয়?"

"হ্যাঁ। ফিরবে। লিখেছে দিন-দশেকের মধ্যেই ফিরবে।"

"আশ্রম চালায় নাকি এক মেম সাহেব?"

"শ্রীঅরবিন্দ বেঁচে থাকতে-ও তিনিই চালাতেন। এখনো তাই চলছে।"

"অরবিন্দর বিষয় কিছুই জানি না। তবে মনে হয় মানুষটা সাধক বটে। কিন্তু অমনধারা মেমের পাল্লায় পড়লো শেষটায়?"

এই কথাটায় মহীতোষবাবু-ও চুপ থাকতে পারলেন না। বললেন, "সুধীরবাবু, যোগী অরবিন্দের কথা জানি না ভাই, কিন্তু স্বদেশী-যুগের অরবিন্দকে জানি। মহাপুরুষ। না হ'লে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লিখলেন, 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'"

এর পর সুধীরবাবু কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন, "অনিমেষ ছেলেটিকে যদি পাত্ররূপে পান, তবে আপনার খুব জিৎ হবে। অর্থবান্, বিদ্বান হ'য়ে-ও যুবো বয়সে এতোখানি সৎভাবে থাকা, খুব কম ছেলেই পারে। আমার সঙ্গে একবার পরিচয় হ'য়েছিলো। বিলেত-ফেরৎ ব'লে মনেই হয় নি। অহঙ্কার নেই।"

সুধীরবাবুর কথার সমর্থন করলেন বৃন্দাবনচন্দ্র। তারপর ওঁদের মধ্যে কথা হ'তে থাকলো ইস্কুলের। বৃন্দাবন দশ হাজার টাকা ইস্কুলের গাচ্ছিত ভাণ্ডে অর্পণ করবেন শুনে মহীতোষবাবু বললেন, তিনি দেবেন পাঁচ হাজার। সুধীরবাবু বললেন, "আমি-ও দেবো, তবে অঙ্কটা কবুল করতে পারছি না। ছেলেদের আবার মতি-গতি বুঝে দেখতে হবে তো?"

মহীতোষবাবু উঠে পড়লেন। বিশেষ এক কাজ আছে তাঁর। সুধীর-

বাবু-ও উঠে পড়লে বৃন্দাবনচন্দ্র খুশিই হ'তেন, কিন্তু সুধীরবাবু বেশ গেড়েই ব'সে রইলেন। বললেন, "আচ্ছা ভায়া, ভবানী ইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্ বাণী হালদারের খবর জানো কিছু?"

"বিশেষ কিছু খবর?"

"হ্যাঁ হে।"

"কই, কানে তো আসেনি।"

"ছুঁড়ি নাকি জীবনকৃষ্ণকে বিয়ে করবে? আর জীবনকৃষ্ণ-ও নাকি রাজি?"

"বলতে পারি না। তবে ঐ ছুঁড়ি-টুঁড়ি কথাগুলো আপনি ছাড়ুন।"

"কি মুশ্কিল! ঘরের মধ্যে, নিজেদের মধ্যে-ও একটু খোলা-খুলি বলতে পারবো না? না, না; সত্যিই ও-রকম বলা উচিত হয় নি আমার। তবে কিনা, বাণী হালদারের সঙ্গে শ্রীকুমারের নষ্টামি শহরে রীতিমতো রাষ্ট্র হ'য়েছে ব'লেই বলছিলুম।"

"ও-সব শোনা কথায় কান দেবেন না। আমার সম্বন্ধে-ও কুৎসার অভাব নেই।"

"তার মানে?"

"মানে, আমার ছেলে এতোদিন আমার কাছে থাকতো না কেন? আমার এটর্ণি বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে নাকি আমার সন্দেহজনক ঘনিষ্ঠতা। তাই নাকি ছেলে বাপের এই কলঙ্ক সইতে না পেরে পৃথক থাকতো।"

"বলো কি? লোকে এই রকম নিছক মিথ্যেটা রটিয়েছে? না, মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই দেখছি। উঠি ভাই আজ। মোদ্দা, ইস্কুলটাকে দাঁড় করাতেই হবে।"

এই ব'লে সুধীরবাবু উঠে পড়লেন। বৃন্দাবনের নিজ মুখের ঐ কথাগুলি পরিহাসের ভাষায় হ'লে-ও, শুনে সুধীরবাবুর মন তুষ্ট হ'লো। ভদ্রলোক কুৎসার গন্ধ শুঁকতে ভারি ভালোবাসেন। কোনো কোনো মেয়ে যেমন ন্যাপথলিন বা কেরোসিনের গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসে। অথচ সুধীরবাবু নিজে নিভাঁজ চরিত্রের লোক। স্ত্রী ছাড়া আর কারো সঙ্গে তাঁর এতোটুকু রসাবেশের কথা অতি-বড়ো শত্রুতে-ও বলবে না। মানুষটা অদ্ভুত।

এক রকমের ভালো লোক আছে যারা স্পষ্টতঃ সকারীভাবে কোনো কুকার্য করতে পারে না, কিন্তু নানাবিধ কুৎসিতের নানা মুখী ভাবনা-চিন্তা এদের শিরায় শিরায় সির্‌ সির্‌ করে। অন্যের কুৎসা এদের মুখরোচক। এরা লোভী অথচ ঔদরিক নয়। প্রচুর খাদ্যের পসরা দেখতে এদের ভালো লাগে। টপ্‌ ক'রে তুলে একটা-ও গালে দেয় না। এরা স্বাদের চেয়ে ঘ্রাণে, স্পর্শের চেয়ে অনুভবে, অধিকারের চেয়ে অভিভবে তৃপ্ত হয়। খুব কঠোর ভাষায়—বললে বলা যায়, এরা সমর্থা রমণীর অযোগ্য। এরা চূড়ান্ত ভোগের শক্তি রাখে কম, অথচ সর্বক্ষণের ভোগপ্রবণতায় চিত্তক্ষেত্রকে জারক-রসে আর্দ্র রাখতে চায়।

সুধীরবাবু চ'লে যাওয়ার পর বৃন্দাবনচন্দ্র ভাবলেন, ইস্কুলটাকে দাঁড় করিয়ে, সুধীরবাবু আর মহীতোষবাবুকে সরিয়ে অন্য কোনো সদাশয় ব্যক্তিকে কর্মকর্তৃসভায় বসিয়ে বাঁচবেন। ইদানীং সুধীরবাবু ক্ষতি করার প্রবৃত্তি থেকে যেনো হ'টে গেছেন, কিন্তু মানুষটার প্রকৃতি অসুস্থ, অশিষ্ট, দুষ্ট। মহীতোষ নিজে দুষ্কার্য করেন না, কিন্তু সুধীরবাবুর মতো লোককে সমর্থন করেন।

বৃন্দাবন এক সময় কমলার পত্র নিয়ে পড়তে বসলেন। কমলাকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। কতোবার মনে হচ্ছে কি জানি সে বোধ হয় আশ্রম থেকে আর ফিরবে না। অনিমেষ তার মন টেনেছে, কিন্তু আশ্রম-ও তাকে কম টানছে না। অথচ ঐ আশ্রম, ভক্তের উপর দস্যুবৃত্তি ক'রে দল গড়বার দিকে আদৌ নেই। এতো বড়ো সত্যিকারের অভিজাত ধর্ম-প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে। সব ধর্ম-প্রতিষ্ঠানই শিষ্য সংগ্রহে তৎপর। এ-তৎপরতার রকম-ফের যতোই থাক্‌। অতি বড়ো দুষ্ট আশ্রমে দেশ ভরা। স্বামী বিবেকানন্দের পর থেকে খুব ভালো ধর্মাশ্রম আর সেবাশ্রম অনেক গ'ড়ে উঠেছে দেশে। কিন্তু নিজেকে বিস্তৃত করা, ব্যাপ্ত-করা, জাহির-করা—সকল আশ্রম-প্রতিষ্ঠানেরই স্বভাব। একমাত্র পণ্ডিচেরির আশ্রম এ-বিষয়ে অত্যন্ত অভিজাত। কমলার মন দিয়ে বৃন্দাবন ভাবছিলেন এই সব।

বৃন্দাবনচন্দ্র নাস্তিক নন। কিন্তু আস্তিকতা তাঁর মনে প্রবল নয়। দেব-দ্বিজে ভক্তি তাঁর আছে। কিন্তু সব ছেড়ে ভগবানের জন্য একাগ্র হওয়ার

ব্যাকুলতাটা তিনি বুঝতে পারেন না। এক-একবার বৃন্দাবন মনে করছেন যে, অনিমেষ যদি আরো একটু জোর টান দিতে পারতো, তবে মেয়ের এতোখানি ঔদাসীন্য থাকতো না। বৃন্দাবনচন্দ্র আরো পাঁচটা পুরুষ মানুষের মতো বলের পক্ষপাতী। এইটুকু বোঝেন না যে রাবণের কি বলের অভাব ছিলো? অবশ্য সব মেয়ে সীতা নয়। কিন্তু কমলা সীতা না হ'লেও সৎ ও সাত্ত্বিক। এক রকম ক'রে বৃন্দাবনচন্দ্র তা বুঝেছিলেন। বৃন্দাবন কমলার জন্য চিন্তিত।

[৩৪]

দেখতে দেখতে দিন কাটছে। জীবনকৃষ্ণের চাকরিতে বহাল হ'তে আর কয়েকদিন মাত্র। বাণী হালদার মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরিচিতদের বাড়ি বাড়ি, সময় পেলেই। যার বাড়ি এযাবৎ সে দুবার মাত্র গেছে তার বাড়ি এক মাসের মধ্যে তিনবার গিয়ে পড়লো। এই গতিবিধি অকারণ। মনের মধ্যেকার খুশির বশেই এই রকমটা ঘটছে। অবশ্য যাদের বাড়ি যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সহজ-সরল কথাবার্তায় তার আলাপটা শিষ্ট রকমেরই হচ্ছে। কোনো রকমের অস্বাভাবিকতা কারো দৃষ্টিতে পড়ছে না। এমন কি, ইতিমধ্যে একদিন সে কমলাদের বাড়িতেই গিয়ে পড়লো।

বৃন্দাবনচন্দ্র বাণীকে দূর থেকে দেখেছেন। ভবানী বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা ব'লে জানতেন। তার সম্পর্কে নানাবিধ জনশ্রুতি-ও তাঁর কাণে এসেছিলো। এক সময় কমলা ভবানী ইস্কুলে পড়াতো। কিন্তু তখন কোনো দিন কমলার সঙ্গে বাণীকে বাড়িতে আসতে দেখেন নি তিনি। সেদিন হঠাৎ এসে কমলার খোঁজ করলো। পরিচয় পেয়ে বৃন্দাবন তাকে বসতে বললেন। জানালেন যে, কমলা মাদ্রাজে গেছে। সুধু মাদ্রাজে গেছে এই খবরে বাণীর কৌতূহল মিটলো না। ক্রমে ক্রমে সে জানলো যে কমলা পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গেছে।

কথায় কথায় বাণী অজস্র প্রশংসা করলো কমলার, বৃন্দাবনের কাছে। বৃন্দাবন জানতেন এই বাণীর জন্যই কমলাকে ভবানী ইস্কুল ছাড়তে হয়েছে। অথচ আজ বাণী কমলার সুখ্যাতি গাইছে। বাণী বললো, "আমি প্রথম প্রথম কমলাকে ঠিক বুঝতে পারতুম না। মনে হ'তো হাল্কা স্বভাবের জন্যই সে মেয়েদের সঙ্গে এতো বেশি মেলা-মেশা করে। কিন্তু পরে বুঝলুম ওটি হাল্কা স্বভাবের লক্ষণ নয়। কমলা অতি-সরল ব'লেই অতি-সহজেই মেয়েদের সঙ্গে মেয়ে হ'য়ে গিয়ে মিশতে পারে। অবশ্য, বুঝতে বুঝতেই কমলা ইস্কুল ছেড়ে এলো। নচেৎ ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব হ'য়ে যেতো।"

বেশ কিছুক্ষণ আলাপাদি ক'রে বাণী চা-খাবার খেয়ে উঠে পড়লো।

কমলা থাকলে অনেকক্ষণ থাকতে পারতো সে। কিন্তু বৃন্দাবনবাবু বা তাঁর পুত্রবধূর সংগে বেশিক্ষণ চলবে না। ওঁরা তার কথার সমর্থন ক'রে যাচ্ছে, নিজেরা কোনো প্রসংগ উত্থাপন করছে না। অর্থাৎ বাণীর এই আলাপ-পরিচয়টা এখানে তেমন জমলো না।

বৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাণী কোথায় যাবে ঠিক করতে পারলো না প্রথমটা। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো শ্রীকুমারকে। বেশ কিছুদিন তার সংগে সাক্ষাৎ হয় নি। শ্রীকুমার কী ভাবছে সেজন্য, বাণী ঠিক অনুমান করতে পারলো না। শিবপুরের বাগানে বাণী বুঝেছিলো শ্রীকুমার কেমন যেনো বাণীকে বেশি জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। এদিকে জীবনের কথা পেয়ে সে-জট্ আপনি আল্গা হ'য়ে কখন যে শ্রীকুমারকে অনেকখানি ভুলিয়ে দিলে বাণীর মন থেকে, বাণী তা খেয়াল করতে পারলো না।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। শ্রীকুমার তার নিজের ঘরে ব'সে আনাতোলের একখানি উপন্যাস নাড়া-চাড়া করছে। বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই। অমিতা ও তার ভাই-বোনদের নিয়ে তার মা গেছেন বাপের বাড়ি। আজ ফিরবেন না। শ্রীকুমারের বাবা তাদের নিয়ে গেছেন। তিনি-ও আজ ফিরবেন না। বাড়িতে শ্রীকুমার থাকবে একা। দোকান থেকে খাবার আনিয়ে রেখেছে, তাই খেয়ে আজ নৈশ আহারের পালা সারবে।

যখন বাণী এলো তখন প্রথমটা শ্রীকুমার একটা শীতল ঔদাসীন্যে তাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানালো। বাণী বুঝলো ছেলেটির অভিমান হয়েছে। ধপ্ ক'রে তার বিছানায় ব'সে পড়লো বাণী। শ্রীকুমার বিছানাতেই ব'সে ছিলো। বাণী বললো, "অনেক দিন আসতে পারি নি।"

"অমিতাকে দিয়ে আমি প্রায়ই খোঁজ নিয়েছি।"

"নানা ধান্দায় ব্যস্ত ছিলুম ভাই।"

"ওঃ।"

"অমন ক'রে গুমোট হ'য়ে রয়েছো কেন?"

"আমার স্বভাবই অমনিধারা।"

"না তো। তোমাকে কি আমি প্রথম দেখছি নাকি?"

"আমি তোমাকে এই প্রথম দেখছি।"

বাণী ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না ছেলেটির এতোখানি অভিমানের অধিকার হ'লো কোথা থেকে? বাণী বুঝবে কি ক'রে? অভিমানের অধিকার আসে যেথা থেকে সে-স্থানটা মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়-ও নয়। ওটার নিবাস নাভি-কেন্দ্রে। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মান-অভিমানের প্যাঁচ্ যতোই মুন্সিয়ানার সংগে চালিয়ে থাকুন, তাঁর রমা-রমেশ, তাঁর জীবানন্দ-ষোড়শী, তাঁর নরেন্দ্র-বিজয়া ইত্যাদির মান-অভিমান আর সূর্যমুখীর অভিমান স্বতন্ত্র। এমন কি অভিমানিনী ভ্রমরের বেদনা শরৎচন্দ্রের লেখনীর সাধ্যাতীত।

স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা-বাসি নিয়েই যতো গল্প আর উপন্যাস। অথচ ভালোবাসার বিশেষ কোনোরূপ বা গভীরতা ক'টা গল্পে মেলে? ভালোবাসা ক'টা মানুষের মধ্যেই বা পাই আমরা জীবনে? স্ত্রীজন, পুরুষ-জনকে কামনা করে; পুরুষ স্ত্রীকে কামনা করে। এটি নির্জলা সত্য। এই কামনার রঙে আর ঢঙে যতোই তফাৎ থাক্, আসলে ওটা বংশসেবী একটি প্রবৃত্তির অন্ধ খেলা মাত্র। মানুষ তাকে লালসার রক্তিম রঙে যখন প্রকাশ করে তখন সেটা কাম; কামনার কমনীয়তায় যখন প্রকাশ করে তখন সেটা প্রণয়। এই প্রণয়টিকেই ভালোবাসা বলা হয়।

শ্রীকুমারের একটি প্রচ্ছন্ন প্রণয় ছিলো বাণীর প্রতি। সেই প্রণয় কবে যে প্রচ্ছদপট ছেড়ে কাহিনীতে প্রকট হ'য়ে উঠবে তা শ্রীকুমার-ও জানে না। এদিকে শ্রীকুমারের প্রতি বাণী অনুকূল। কিন্তু প্রণয়ের সামান্য একটু বাষ্প-ও যে তার মধ্যে আছে, শ্রীকুমারকে সামান্যতম ভালোবাসা-ও যে তার হৃদয়ে গোপন রয়েছে—একথা কেউ কাণে-কাণে বললে-ও বাণী হালদার চমকে উঠবে। নিন্দুকে বলতে পারে এমন অনেক মেয়ে থাকে যাদের বিয়ের সাত পাক ঘোরার সময় সপ্তম পাকে হুঁস হয় যে সে কনের পিঁড়িতে রয়েছে। ষষ্ঠ পাক পর্যন্ত ওদের খেয়াল থাকে না।

উপন্যাসখানি আলমারিতে তুলে রাখলো শ্রীকুমার। বাণী চুপ-চাপ। শ্রীকুমার কোথায় যেনো একটা নিরুদ্ধ আবেগে ফণা তুলতে চাইছে অথচ থমকে আছে। বাণীই স্তব্ধতা ভংগ করলো। বললো, "একটা সুখবর এনেছি।"

"জীবনকৃষ্ণকে বিয়ে করবো শীঘ্রই। এইতো?"

"সে কি? জানলে কি ক'রে?"

"ঘটক খবর দিয়েছে।"

"আশ্চর্য!"

"আশ্চর্য হবার কী আছে? ভালো খবর-ও বাতাসের আগে ধায়।"

"তাই নাকি? কিন্তু প্রবাদটা ও-রকম তো নয়।"

"না। প্রবাদে বলে মন্দ খবর বাতাসের আগে ধায়।"

"তবে?"

"খবরটা তোমার পক্ষে ভালো হ'লেই যে সবার পক্ষে ভালো হবে, কারো পক্ষে মন্দ হ'তে পারবে না—তার নিশ্চিত আছে কি?"

এক সময় স্টোভ জেবলে শ্রীকুমার চা করলো। বাণীকে এক পেয়ালা দিয়ে নিজে এক পেয়ালা নিলো। চা খেতে খেতে বাণী-শ্রীকুমারের বাণী-বিনিময় হ'তে থাকলো। বাণী বললো, "বিয়ে করবে কবে?"

"আমার সঙেগ তিনটি মেয়ের বিয়ে হ'তে পারতো। তিনটি মানে তিনটির যে-কোনো একটির। আবার তারা তিন বোন। একটি বিধবা, অন্য দুটি কুমারী।"

"গল্প বলছো, না, সত্যি?"

"সত্যি বলছি। বিশ্বাস করো। আমার একজন মাস্টার মশাই ছিলেন। ইস্কুলে পড়াতেন। তাঁর মেয়ে সরস্বতী আমার প্রেমে ডগোমগো হ'য়েছিলো। মাস্টার মশাই-এর বড়ো ভাই-এর দুই মেয়ে-ও আসতো-যেতো আমাদের বাড়ি। বড়ো বিধবা, ছোটটি অধবা। তারা দু'জনেই সাধতো।"

"সাহিত্য ক'রে কথা বলছো বটে, কিন্তু সত্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

"পাবে বৈ কি। মেয়েমানুষ যে মৎস্যকন্যা। অর্থাৎ মেছুনি। গন্ধ পেতেই হবে।"

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ ক'রে রইলো। তারপর শ্রীকুমার ব'লে চললো তার কাহিনী। কেন যে সে বলতে থাকলো তার কারণ সে-ও জানে না।

শ্রীকুমারের মাস্টার মশাই শ্যামাপদবাবু ছিলেন সাংঘাতিক পিউরিট্যান্। তাঁর একটি মাত্র ছেলে আর তিনটি মেয়ে। ছেলেটি বাপের শুচিবাতিকতার প্রতিশোধেই বোধহয় উচ্ছৃংখল হ'য়ে বাড়ি-ছাড়া। মেয়েরা বাপের তাঁবে।

বড়োটি মারা গেলো অল্প বয়সে। মেজোটি বাড়িতে প'ড়ে আই. এ. পরীক্ষার জন্য দু-দুবার তৈরি হ'য়েছিলো; কিন্তু পরীক্ষার সময় দুবারই তার ভারি অসুখ করে। ছোটোটি আর ম্যাট্রিক পার হ'লো না।

শ্যামাপদবাবুর মেয়েটি সরস্বতী। সরস্বতী বাপের অনুগত ছাত্র এই শ্রীকুমারকে ইস্কুলের জীবনে দেখা অবধি মনে মনে ভালোবাসতো। শ্রীকুমার জানতো না। ইস্কুলজীবন ছেড়ে কলেজ-জীবন, এবং তারপরের এই শিক্ষক-জীবনেও শ্রীকুমার শ্যামাপদবাবুর বাড়ি যেতো। সরস্বতী কদাচ বেশিক্ষণ শ্রীকুমারের সঙ্গে কথা বলতে পেতো। তবু-ও ফাঁক খুঁজে ক্রমে ক্রমে সে শ্রীকুমারকে ধরবার সুযোগ ক'রে নিতো। এদিকে শ্যামাপদবাবুর বড়ো ভাই থাকতেন তাঁরই পাশে। গায়ে-গায়ে দুই ভায়ের বাড়ি। তাঁর বড়ো মেয়ে রাণী আর ছোটো মেয়ে মমতা। রাণী বিধবা হ'য়ে একে একে বি. এ. বি. টি. পাশ ক'রে শিক্ষিকা। কলকাতার কোন্ ইস্কুলে পড়ায়। শ্রীকুমারের চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড়ো। ছোটো বোন মমতাটিকে শ্রীকুমারের হাতে দিতে বাপের মন। কিন্তু শ্রীকুমার নারাজ। শ্রীকুমারের বাপ রাজি থাকলে-ও। শ্রীকুমার নারাজ, কেননা সরস্বতী ইদানীং অবসর চুরি ক'রে শ্রীকুমারদের বাড়ি আসে। অমিতার সঙ্গে তার আলাপ আছে। শ্রীকুমারের সঙ্গে অমিতা অনেকবার শ্যামাপদবাবুর বাড়ি গিয়েছিলো। সরস্বতী-ও সেই সূত্রে কয়েকবারই ও এসেছিলো অমিতা অর্থাৎ শ্রীকুমারদের বাড়ি। অবশ্য তখন শ্রীকুমারের কলেজ-জীবন। ইদানীং বহুকাল আর শ্রীকুমারদের বাড়ি আসে নি।

কিন্তু বয়স তো বাড়ে। পিউরিট্যান্ বাপের পাহারায়-ও মেয়ের বয়স আট্‌কে থাকে না। গৌরীদান করতে পারে না ব'লে বাপেরা মেয়েদের বয়সটাকে তো আর অষ্টম বর্ষে থামিয়ে রাখতে পারে না? কাজেই সরস্বতী বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কড়া পাহারার দড়ি একটু একটু ছিঁড়তে শুরু করলো।

সেদিনটা-ও আজকের মতো শ্রীকুমারের মা তাঁর অন্যান্য ছেলে-পুলে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। কর্তা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীকুমার ছিলো একা। সে আজ দু'বছর আগেকার কথা। সরস্বতী এসে পড়লো। হঠাৎ এসে পড়ে নি সে। আসার পূর্বে দুখানি পত্রাঘাতে জানিয়েছে সে কিছু কিছু কথা শ্রীকুমারকে। শ্রীকুমারকে যেতে লিখেছিলো তাদের

বাড়ীতে। কিন্তু শ্রীকুমার যায় নি। তাই সে নিজে এসে পড়লো।

বাণী হালদারেরই মতো সরস্বতী ধপ্ ক'রে বসেছিলো শ্রীকুমারের বিছানায়। তার পর সরস্বতী স্টোভ্ জেবলে চা করলো। শ্রীকুমারকে দিলো আর নিজে নিলো। চায়ের পেয়ালা যখন খালি হ'লো তখন শ্রীকুমারের হাত থেকে খালি পেয়ালা নিয়ে নিচে রাখলো, আর রাখলো নিজের পেয়ালাটা-ও। তারপরে ঘরের দুই দিকে দুই দরজায় খিল লাগিয়ে বিছানায় ধপাস্ ক'রে শুয়ে পড়লো। শ্রীকুমার বুঝলো মেয়েটা কেমন যেনো হ'য়ে গেছে। সরস্বতী তার ডান হাতখানায় জোর টান দিয়ে বুকের উপর ফেলে দিলো তাকে। শ্রীকুমার দেখলো সরস্বতীর নিঃশ্বাস গরম আর তার ঠোঁট ফুলছে। এক সময় সরস্বতী ব'লে উঠলো। "কী করবো বলো না? চিরকাল কি আইবুড়ো থাকবো?" একথায় শ্রীকুমার বিব্রত হ'য়েছিলো। একটু পরে হাতখানি সে-মেয়ের কবল থেকে খুলে নিয়ে তার মুখে একটি চুমো খেতেই সরস্বতী ব'লে উঠলো, "থাক্, ঢের আদর হ'য়েছে। অমন অচ্ছেদার ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না।"

তার পরের কথাগুলো শ্রীকুমার খুব সংক্ষেপে সেরে নিলো। জানালো. তারপর থেকে ওদের আর সাক্ষাৎ হয় নি। আর শ্যামাপদবাবুর বড়ো মেয়ে রাণীকে-ও সে এ-কাহিনী ব'লেছিলো। রাণী-ও তারপর অর্থাৎ এ-কাহিনী শোনার পর আর আসে নি।

বাণী হালদার সব শুনলো। ভাবতে লাগলো, কৈ, গল্পে-উপন্যাসে এ-রকমটা তো বড়ো কেউ লেখে না। মিহি প্রেম, মোলায়েম প্রণয়-প্রীতি, সৌখীন ভাব-ভালোবাসা নিয়েই তো কাহিনীকার-রা ব্যস্ত। অবশ্য, শরৎ-বাবুর বেমক্কা দিবাকর-কিরন্ময়ী, বেহিসেবী বিপ্রদাস-বন্দনা উপন্যাসে আছে। একটি আজব কাহিনী, অন্যটি তাজ্জব ব্যাপার। আবার পরবর্তী কাহিনীকারদের অতি বাস্তবতার রোম্যান্স্ যা পাই, সেখানেও তো এই রকম-টা বিশেষ পাই না।

বাণী হালদার বুঝবে না। কথা এই, জনে জনে জনান্তিকে যে-কাহিনীর জাল বোনে, জনে জনে লেখকরা তার যা বর্ণনা করেন তার মধ্যে ইতি-উতি আছে যে। তার মধ্যে ভয়-লজ্জা আছে যে। তার মধ্যে দেখার

ভঙ্গিমার যে হরেক রকমারি রয়েছে। তার মধ্যে অনুভবের যে বৈচিত্র্য রয়েছে। তার মধ্যে যে কল্পনার কারসাজি রয়েছে।

যাই হোক্, শ্রীকুমার সরস্বতী-সংবাদ প্রচার করলো বাণীকে। বাণী শুনলো। শুনে বেশ কিছুটা সময় সে নীরব রইলো। শ্রীকুমার-ও কথা বললো না। শেষে বাণী বললো, "জানি না তোমাকে কতোখানি আস্কারা দিয়েছি। কিন্তু বঞ্চিত করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। না জেনে যে অপরাধ করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইলে কি ক্ষমা পাবো?"

"অনায়াসে।"

"বলো কি?"

অর্থাৎ শ্রীকুমারের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর বাণীর অপ্রত্যাশিত। অকস্মাৎ শ্রীকুমারের দেবরচিত্ত যখন পৌরুষসম্পন্ন কর্ণ-মানস হ'য়ে ওঠে এবং নরম এই মানুষটি পরম একটি আগ্রহে ধরা-ছোঁওয়া মেয়েকে উপেক্ষা করে, তখন বাণী হালদারের মতো যে-সব মেয়ে এখনো মেয়েমানুষটি হ'য়ে ওঠার সামর্থ্য পায় নি, তাদের বিস্ময় লাগে।

আরো কিছুক্ষণ ওদের কেটে গেলো। শ্রীকুমারের ঔদাসীন্যে বাণী বিমনা হ'লো। জীবনকে সে বিবাহ করবে, দু'জনে ঘর পাতবে, সম্ভোগে—সোহাগে দাম্পত্যের ভিত্ গাড়বে। অথচ অনুগত শ্রীকুমার যখন চিত্তক্ষেত্র থেকে বিগত হ'য়ে যায়, তখন অভাববোধ জাগে কেন? তবে কি মূলতঃ অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষই বহুগামিত্বের বীজ বুনে যায় ভিতরে-ভিতরে। সামাজিক জীব হিসেবে যতোই কেন তাদের পরিমার্জনা হ'য়ে থাক্ না, আসলে আদিম একটি যৌন জীব স্ত্রী-পুরুষের শিকড়ে-শিকড়ে তল-টান্ টানে, আবার শিরায় শিরায় সির্ সির্ প্রবাহ আনে।

যাবার মুখে বাণী শ্রীকুমারের দিকে তাকালো। কি-রকম ক'রে তাকালো জানি না। শ্রীকুমার কিছু বললো না। তবে চাহনির প্রশ্নে চাহনিতে উত্তর দিয়েছিলো বৈকি বাণী হালদারকে। পরে শ্রীকুমার বললো, "আমি-ও সরস্বতীর সন্ধান নেবো। একলা থাকা আর চলবে না।"

"আমাকে নিমন্ত্রণ করবে তো?"

"তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে সে কথা ভাববো?"

“অনেক বয়স অবধি বিয়ে না করলে এ-রকম মেলা-মেশা একটু হয়-ই ; তুমি আমাকে ভুলে যেয়ো।”

“সেটা এখন বলা শক্ত। সরস্বতীকে পেয়ে সেটা ঠিক করবো।”

“সরস্বতী। তাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।” ব’লে বাণী দ্রুতপদে প্রস্থান করলো।

কেমন ক'রে জানি না সুধীরবাবুর-ও মনের মধ্যে একটা জিদ্ চেপে বসেছে যে বটতলা ইস্কুলকে সরকারী সাহায্য থেকে মুক্তি দিয়ে বেশ ভালো ক'রে একটা স্বাধীন বিদ্যালয়ে গ'ড়ে তুলতে হবে। আগামী বৎসর থেকেই সরকারী শিক্ষা-বিভাগকে জানিয়ে দেবেন যে তাঁদের আর সাহায্য চাই না। তার পর ভালো দেখে ব্যবস্থা ক'রে নরেন্দ্রকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ভিন্ন এক যোগ্য ব্যক্তিকে সহকারী প্রধান শিক্ষক রাখবেন। সহকাবী প্রধান শিক্ষকই দৈনন্দিন কাজ চালাবেন ইস্কুলের। নরেন্দ্র থাকবেন অধ্যক্ষ, পরিচালক, পরামর্শদাতা।

এদিকে বৃন্দাবনচন্দ্র যথেষ্ট অর্থ প্রতিশ্রুতি মতো ইস্কুলকে দান করলেও সম্প্রতি ইস্কুল নিয়ে বেশি ব্যস্ত হ'তে চাইছেন না। তাঁর মেয়ে কমলা আশ্রম থেকে লিখেছে যে, সে আর বাড়ি ফিরবে না। আশ্রমিক জীবনই সে গ্রহণ করবে। সংবাদটা বাপের মনে স্পষ্টতঃ বিরক্তি উদ্রেক করলো না বটে, কিন্তু মনের অন্তস্তলে একটা বিষাদ ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো। এদিকে ছেলে অনঙ্গ-মোহন ঘরে ফিরলেও, একান্ত অনুগত পুত্ররূপে বৃন্দাবনচন্দ্র তাকে আর যে পাবেন না তা তিনি বুঝেছেন। একেই তো পিতাপুত্রের বিচ্ছেদের একটা ইতিহাস রয়েছে; তা ছাড়া ছেলের নিজের সংসার বেড়ে উঠছে। নিজের সংসারই তার নিজের মনোযোগের পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই অধুনা তাঁর পিতৃ-হৃদয়ের স্নেহস্থানটি শূন্য হ'য়ে পড়ছে।"

কমলার চিঠি পেয়ে তিনি একদিন অনিমেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। দেখা হ'লো তার সঙ্গে। অনিমেষ তাঁকে জানালো যে, কমলা তার সঙ্কল্পের কথা তাকে-ও জানিয়েছে। এই সংবাদে প্রথমটা বৃন্দাবনচন্দ্র অনিমেষকে আর কিছু বলতে পারলেন না। অনিমেষ কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, "কি করা যাবে বলুন? মানুষের অন্তরটা তো আর একজনের একচেটে নয়। কমলা যদি সত্যিই ধর্মজীবন যাপন করতে মনস্থ করেছে, তা হ'লে হিতৈষীদের উচিত নয় তাকে বাধা দেওয়া। আমার একটা উত্তর লিখে

রেখেছি। তাতে লিখেছি, তার এই সংকল্পে আমার সহানুভূতি আছে।"

ছেলেটির দৃঢ়মনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'লেন বৃন্দাবনচন্দ্র। পৌরুষ একেই বলে। জোর ক'রে অধিকার করায় পুরুষালি থাকলেও, জোর ক'রে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট পৌরুষ আছে। অনিমেষের কথায় কী উত্তর দেবেন ভাবছেন এমন সময় অনিমেষ বাবা এসে পড়লেন। অনিমেষ বললো "বাবা, আমি একবার বেরোচ্ছি। তুমি রইলে; বৃন্দাবনবাবুর অসুবিধা হবে না।"

এই ব'লে বিদায় নিয়ে অনিমেষ চ'লে গেলো। ভুবনমোহন কথায়-বার্তায় কিছুটা সময় অতিবাহিত ক'রে এক সময় বললেন, "ছেলেটা আঘাত পেয়েছে। চাকরিটা আপাততঃ স্বীকার করলেও ওর ইচ্ছে আবার বিলেত যাবার।"

"কেন, কেন?"

"বোধ হয় কমলাকে না পেয়ে এদেশে থাকতে ওর আর মন টেঁকছে না।"

"কিন্তু অন্য মেয়েকে তো বিয়ে করতে পারে।"

"একবার একজনের উপর বেশি মন প'ড়ে গেলে অমনটা কারো কারো হয়।"

"আপনি ওকে আবার যেতে দেবেন বিলেত?"

"আমি বারণ করলেই কি ও শুনবে? তা ছাড়া বারণ করাই কি ঠিক হবে?"

"তা বটে।"

"তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে।"

"বলুন।"

"কিছুটা সময় কেটে যাক্; আঘাতটা পুরোনো হ'য়ে যাক্। তখন দেখি কী করতে চায়?"

কথা-বার্তা আর বেশিদূর অগ্রসর হ'লো না। নরেন্দ্রবাবু এসে পড়লেন। নিচের ঘরে মেয়ে ছিলো না। ভাবলেন উপরে ভুবনবাবুর ছেলের ঘরে আছে। তাই খুঁজতে এসেছেন। কিন্তু শুনলেন আন্না রজ্জবদের বাড়ি গেছে, তার বাবাকে যেনো বলেন ভুবনবাবু। রজ্জবের স্ত্রীর অসুখ করেছে।

নরেন্দ্র নিচে নেমে গেলেন। গোপী রান্নাঘরে ছিলো। চুপচাপ কাজে ব্যস্ত। নরেন্দ্র আন্নার খবর গোপীকে জিজ্ঞাসা করতে খেয়াল করেন নি। খেয়াল না করবারই কথা। এতো বড়ো দুঃসংবাদে তিনি যে মন শক্ত ক'রে বংশীদের বাড়ি থেকে সহজভাবে বাড়ি ফিরতে পেরেছেন, এ কেবল তিনি ব'লেই পেরেছেন। নচেৎ আন্নাকে যে-গভীরতায় তিনি স্নেহ করেন তাতে এ-দুঃসংবাদে তাঁর মাথা খারাপই হবার কথা।

প্রেসের কাজ সেরে বংশীর খোঁজ নিয়ে আসবার কথা ছিলো তাঁর। গিয়েছিলেন সেখানে। যখন পৌঁছলেন, তখন তাদের বাড়ি গোরস্থানের মতো নিথর, নিঝুম। ধক্ ক'রে উঠেছিলো বুকের ভিতরটা। ধীরে ধীরে পা ফেলে ভিতরে গেলেন। কেমন ক'রে গেলেন, গিয়ে কী দেখলেন, সে-সব আর মনে আনতে পারছেন না নরেন্দ্র।

বংশী তাঁর যাবার দু'ঘণ্টা আগে দেহ ছেড়ে চ'লে গেছে। তার বাবা বললেন, মৃত্যুকালে বংশী "মাস্টার মশাই, আন্না" বার বার এই দুটি নাম করেছে। এদিক-ওদিক চেয়ে তাঁদেরই খুঁজেছিলো বোধ হয়। হঠাৎ, "আনি, আন্না, আন্নাকালি" ব'লেই তার নিঃশ্বাস শেষ হ'য়েছে।

বোঁ বোঁ ক'রে মাথা ঘুরছে নরেন্দ্রের। আন্না এখনো আসে নি। তিনি একখানা সতরঞ্চি পেতে ব'সে আছেন। আন্না এলে তাকে কী বলবেন ভাবছেন। ভাবছেন না; ভাববার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভাবতে পারছেন না। এমন সময় আন্না এলো। এসেই "বাবা" ব'লে ঘরে ঢুকলো। হঠাৎ নরেন্দ্রের রক্তস্রোত থম্‌কে গেলো। পাথরের নিশ্চল মূর্তির মতো ব'সে রইলেন। আন্নার ডাকে সাড়া এলো না কণ্ঠে। চেষ্টা করলেন বলতে "কাছে আয়।" কিন্তু স্বর বন্ধ। আন্না বাবার মূর্তি দেখে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলো। কথা যখন ফুটলো তখন নরেন্দ্র শুনলেন, "বাবা, বাবা; শরীর খারাপ লাগছে কি তোমার? বলো-না বাবা, কথা বলছো না কেন? আমার যে ভয় করছে।"

নরেন্দ্র কথা বললেন। আশ্চর্য একটি মৃদু মরা হাসি ঠোঁটে এনে বললেন, "আনি, কাছে আয়। বোস্ তো মা। শরীর খারাপ একটু হ'য়েছে। মাথাটা বড়ো ঘুরছিলো। এখন সামলেছি। তুই ভয় পাস্ নি।"

আন্নাকালি নরেন্দ্রের গলা জড়িয়ে তাঁর বুকে মাথা রাখলো। বললো,

"বংশীদার কথা এখন বলতে হবে না। একটু পরে শুনবো। আমি জানি সে ভালো আছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ; ভালো আছে। খুব ভালো আছে। তার অসুখ সেরে গেছে। আর হবে না।"

"আচ্ছা। তুমি এখনো সুস্থ হওনি। শুয়ে পড়বে?"

"না। আন্না, তুই খুব শক্ত মেয়ে; না রে?"

"কেন বাবা?"

"কেমন বুড়ো বাপকে সেবা করছিস্।"

"আমি না তোমার মেয়ে? মেয়ে বাপকে সেবা করবে না?"

"আচ্ছা আন্না, খুব বুড়ো হ'য়ে গেলেও সেবা করবি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"কতো বুড়ো হ'য়ে বাঁচবো বলতো?"

"একশো বছর।"

"তার পর?"

"যাও; তুমি বড়ো দুষ্টু।"

এর পর নরেন্দ্র কেমন যেনো হঠাৎ সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। একটা শান্ত স্থিরতা মনে এলো। চিত্তে এলো। দেহে এলো। মেয়ের সঙ্গে নানা আবোল-তাবোল কথা বলতে থাকলেন। আন্না জবাবগুলো ঠিক-ঠিক দিলেও মধ্যে মধ্যে বাপের মুখের দিকে দেখতে থাকলো। অস্বাভাবিকতার রঙ্ নরেন্দ্রের মুখপ্রকাশ থেকে তখনো যায় নি।

"ক্ষিদে নেই" ব'লে নরেন্দ্র রাত্রে বিশেষ কিছু খেলেন না। সামান্য কিছু না খেলে মেয়ে-ও খাবে না, তাই কিছুটা গলাধঃকরণ করলেন। আন্না-ও কম খেলো। কেবল বাবা বার বার আদেশ করছেন ব'লে খানিকটা খেতেই হ'লো তাকে। অন্যদিন হ'লে বাপের কথা বহু আবদারে অমান্য করতে পারতো। কিন্তু আজ নরেন্দ্র যে কেমন-তরো হ'য়ে রয়েছেন।

রাত্রিতে আন্নাকে পাশে নিয়ে শুলেন নরেন্দ্র। এক সময় অজস্র আদরে মেয়েকে অভিভূত ক'রে বললেন, "ভগবান আছেন। তিনিই সব করেন। নারে আনি?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"সুখ-ও তিনি দেন, দুঃখ-ও তিনি দেন।"

"বাবা, বংশীদা ভালো আছে, না? কিন্তু তুমি সেরে গেছে বলছিলে যে? একেবারে সেরে গেছে? না, না; ক'মে গেছে। তাই তুমি আমাকে ভোলাবার জন্যে বলছিলে সেরে গেছে। ভোলাতে গেলে কেন? আমি ভীতু নই।"

"সাহসী?"

"হ্যাঁ।"

"ফরাসী বীরাঙ্গনা যোয়ানের মতো?"

"অতো নয়। খানিকটা।"

"শোন্, কাছে আয়।"

বুকে টেনে নিলেন আন্নাকে। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে আন্না বাপের অসুস্থতা বুঝতে পারলো। একটা কালো সংশয় মাথায় ঘুরে গেলো ঘূর্ণীর মতো। বললো সে, "বাবা, তুমি মিছে কথা বলেছো। বংশীদার রোগ কমে নি।"

"কমে নি।"

"বেড়েছে?"

কোনো উত্তর পেলো না আন্না। উঠলো। আলো জ্বাললো। বাপকে আদেশের স্বরে উঠিয়ে নিয়ে এসে সতরঞ্চে বসালো। নিজে পাশে বসলো। তাঁর দুটি হাত নিজের দুই হাতে ধ'রে বললো, "বাবা, বংশীদা কেমন আছে?"

"বংশী নেই।" এই কথা বলতে পারলেন নরেন্দ্র। শুনতে পারলো কি আন্না? কথা ব'লেই নরেন্দ্র আচ্ছন্ন চেতনায় চোখ মুদেছিলেন কয়েক মুহূর্ত মাত্র। চোখ খুলে দেখলেন আন্না অচেতন।

তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে ঠাণ্ডা জলের হাত তার চোখে-কপালে বুলিয়ে তাকে সুস্থ করতে লাগলেন। প্রায় তিন মিনিট গেলো সুস্থ হ'তে। রুদ্ধ নিঃশ্বাস ক্রমে ক্রমে সহজ হ'তে তিন মিনিট লাগলো। চোখ খুললো আন্না। প্রথম কথা বললো, "বংশীদা, তুমি নেই? আমি থাকবো কি ক'রে? আমি-ও যাবো।"

তারপর অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লো আন্নাকালি। বাপের বুক ভাসিয়ে কাঁদলো আন্না। তার অন্তর সহস্র বার বলতে থাকলো, "আর না, আর না। বংশীদাকে ফেলে আর না। বংশীদা?"

বাপের পাশে বিছানায় শুয়ে সে-রাত্রি আন্নাকালি অবিরত কেঁদেছে। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো যখন, তখন নরেন্দ্র তার নিদ্রিত চোখে চেয়ে ফুঁপিয়ে উঠেই নিজেকে সামলে বিছানা ছেড়ে নিচে সতরঞ্চিতে বসলেন।

নরেন্দ্র অবসন্ন। আজ এতোদিনে নরেন্দ্র সত্যই অবসন্ন। যৌবনের আদিযুগ থেকে জীবনের সোপানে সোপানে নানা ওঠা-পড়া, ঘাত-প্রতিঘাত, সংকট-সংঘাত ভোগ ক'রে-ও নরেন্দ্রকে ক্লান্ত করতে পারে নি। বটতলা ইস্কুলের মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে স্বীকার করতে তাঁর একটু-ও বিষন্নতা আসে নি। আন্নাকে যখন পিতৃস্নেহে স্বীকার করলেন তখন যেমন কিছুমাত্র দুশ্চিন্তায় ভারগ্রস্ত হন নি তিনি, তেমনি ইস্কুল ছেড়ে আন্নাকে নিয়ে কি-ক'রে জীবিকা আর জীবন চালাবেন নরেন্দ্র তার জন্য এতোটুকু চিন্তাপীড়িত হন নি।

কিন্তু আজ নরেন্দ্র অবসন্ন। বংশীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করে-ছিলেন। বংশীর মৃত্যুতে তাঁর অন্তর কাতর হ'লো অত্যন্ত বেশি রকম। কিন্তু বংশীর অভাবে আন্নার পীড়িত অন্তর তাঁকে বিব্রত করলো, নিরুৎসাহ করলো, অবসন্ন করলো। যে-একটি অসামান্য ভালোবাসা জুঁই কুঁড়ির মতো নিজ অস্তিত্ব গোপনে সুবাস-সঞ্চিত করছিলো, যে-একটি অসাধারণ প্রণয় ঘাসফুলটির মতো সুধু অন্তরের দক্ষিণ বাতাসের সঙ্গেই মিলে-মিশে ছিলো, যে-একটি শুচিস্নিগ্ধ, রুচিশুভ্র প্রীতি বংশীর জন্য মর্মকোষে গুহাহিত গোপনতায় লালন করছিলো আন্না;—আজ তাকে কীরূপে দেখবেন নরেন্দ্র ?

বংশী নেই। আন্না আছে। কিন্তু আন্না কোথায় আছে? কেমন ক'রে আছে? কিসের জন্য আছে? আন্না যে সংজ্ঞাহীনতা কাটিয়ে প্রথম কথা বললো, "বংশীদা, তুমি নেই, আমি থাকবো কি-ক'রে? আমি-ও যাবো।" এর পর? এর পর আন্নার কথা জানেন না নরেন্দ্র। নরেন্দ্র অবসন্ন।

ভোরে একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিলো আন্না। সকালের একটু কোমল রোদ জানলা দিয়ে ওর মুখখানিতে পড়তেই বুঝি ঘুম ভেঙে গেলো। নরেন্দ্র তখন গোপীর সাহায্যে প্রাতরাশের ব্যবস্থা শুরু ক'রেছিলেন। এক সময় ঘরে এসে দেখলেন আন্না চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে, বিছানায়। কাছে গিয়ে

বললেন, "আন্না-মা, আরো একটু শুয়ে থাকবি?"

"আমি জানি না। তুমি বলো।"

"আমি বলবো?"

"হ্যাঁ।"

নরেন্দ্র মশারি তুলে আন্নার মুখে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়তে লাগলো। আন্নার মুখে। আন্না একটি অদ্ভুত মৃদু-মিষ্টি হেসে বললো, "বাবা, কেঁদো না। আমি-ও কাঁদবো না। বংশীদা মরে নি বাবা, বংশীদা মরবে না, বংশীদাকে মরতে দেবো না। ওকে আমার চাই। আমি ওকে ভালোবাসবো। অনেক ভালোবাসবো।" আর বলতে পারলে না। কেঁদে ভাসিয়ে দিলো বাপের মুখখানি। নরেন্দ্রের মুখ তখন মেয়ের মুখের উপর।

অবশেষে কোনো রকমে প্রাতরাশ খেলো দু'জনে। গোপী স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। এক সময় নরেন্দ্র তাকে-ও বলেছিলেন। সে-ও জেনেছে। তখনো আনি ঘুম ভেঙে ওঠে নি।

আন্না আর কাঁদলো না। কেবল বড্ড যেনো থম্ থমে হ'য়ে গেলো। হঠাৎ এক সময় আন্নার মাথাটা বুকে নিতে গিয়ে দেখলেন নরেন্দ্র, তার গা গরম। ছাঁৎ ক'রে উঠলো তাঁর মন। বিশেষ কিছু বললেন না। মাত্র এইটুকু সংযত কথা বললেন, "আনি, তোর কপালটা একটু গরম। ও কিছু নয়।" আন্না-ও সমর্থন ক'রে বললো, "না, ও কিছু নয়। তুমি আজ কলকাতা যেয়ো না। আমার একলা থাকতে ভয় করবে। না, না; ভয় করবে না। কি জানি, ঠিক বলতে পারছি না।"

"আমি যাবো না রে, যাবো না।" ব'লেই নরেন্দ্র মেয়ের কপালে চুমু খেলেন। আনি শান্তভাবে নরেন্দ্রের চোখে চেয়ে রইলো। সে-চাহনি এতো গভীর যে, নরেন্দ্র তাকে অনুভব করলে-ও উপলব্ধি করতে পারলেন না।

বিকালবেলা আন্নার জ্বর বাড়লো। নরেন্দ্র গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন তাপ বেশি। থারমোমিটর দিয়ে তাপ দেখতে চাইলেন; আন্না আপত্তি জানালো। নরেন্দ্র-ও জিদ্ করলেন না।

সন্ধ্যার সময় বংশীর বাবা হঠাৎ গাড়ি ক'রে এসে পড়লেন। আন্নার

খোঁজ করলেন। তার পূর্বে দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রকে বললেন, "বংশী শেষ সময় 'আন্না-আন্না' ব'লেছিলো। আরো কি-সব অস্পষ্ট স্বরে বলেছিলো। ওর মা বললে না সব কথা। সুধু বললে, 'আন্নাকে দেখে এসো, সান্ত্বনা দিয়ে এসো। ব'লে এসো সে যেনো মধ্যে মধ্যে এখানে আসে তার বাপের সঙ্গে।' "

আন্না বংশীদার বাবাকে দেখে প্রথমটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলো। পরক্ষণে দুটি ফোঁটা অশ্রু টল্ টল্ ক'রে উঠলো দু'চোখে। গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে। কি-রকম একটি বিনম্রধারায় চোখ নামালো। এক সময় বংশীদার বাবাকে জড়িয়ে ধরলো আন্না। তিনি সস্নেহে আন্নার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

যখন বিদায় নেবার সময় বংশীর বাবা বললেন, "যেয়ো মা বাবার সঙ্গে; কেমন?" তখন আন্না বললো, "না। আপনি আসবেন। আমি যাবো না। যেতে পারবো না। বাবা, বাবা; বংশীদা কেন আমাকে ফেলে রেখে গেলো? আমি একা থাকবো কি-ক'রে? বংশীদা, আমি একা থাকতে পারবো না। আমি-ও যাবো। বংশীদা, যাই।" আন্না অচেতন হ'য়ে প'ড়ে গেলো।

একাজ্বরীতে ভুগছে আন্না। চিকিৎসক ভয় দেখালেন না। তবে তিনি যে ভয় পেয়েছেন সেটি লুকোতে পারলেন না। অনিমেষ আন্নার শিয়রে অনেক সময়ই ব'সে থাকে। কমলাকে কোনো কিছু জানাতে বারণ করেছে সে নরেন্দ্রকে। বংশীর মৃত্যুর কথা-ও নয়; আন্নার রোগের কথা-ও নয়। ভুবনবাবু খুব যত্ন নিচ্ছেন আন্নার।

গোপী বিব্রত। দুঃখ পাচ্ছে সে-ও। কাজকর্ম ক'রে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাত থেকে বাসনপত্র প'ড়ে যাচ্ছে। তার মুখ দেখে অনিমেষ ব্যবস্থা করেছে যতোদিন আন্না না সারে ততো দিন নরেন্দ্র ও গোপী রেঁধে আর খাবে না। তাদের অতিথি হ'য়ে অন্ন গ্রহণ করবে। কিন্তু নরেন্দ্র যে খাচ্ছেন অতি সামান্য। এক নিদারুণ অবসাদ তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

রোগ বেড়ে চললো। হু হু ক'রে বেড়ে চললো। পনেরো দিন কেটে গেলো। জ্বর বাঁকা রাস্তা নিয়েছে।

সেদিন রাত্রি গভীর। গোপী-ও ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। উপরতলায় অনিমেষ অঘোরে নিদ্রিত। কমলাকে স্বপ্ন দেখলো সে। সন্ন্যাসিনীর বেশ।

একটা পেঁচা ডাকছে। কোন্ প্রহর এটা নরেন্দ্রের খেয়াল নেই! ঘড়িটার কথা একেবারে মন থেকে উধাও। শিয়াল ডাকছে হুক্কাহুয়া। হঠাৎ আন্না চোখ মেললো। কাকে সে দেখছে? ডেকে-ও নরেন্দ্র সাড়া পেলেন না। দ্বিতীয়বার ডাকলেন না। লক্ষ্য করতে লাগলেন।

এক সময় দুখানি হাত বাড়িয়ে কাকে উদ্দেশ ক'রে বললো, "যাচ্ছি। যাচ্ছি। একটু-ও দেরি হবে না। হাত ধরো আমার।"

ব্যস্। হাত-দুখানা বুকে পড়লো। সব শেষ। নরেন্দ্র একা। সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকার গিলে ফেললো।

পরদিন সকাল দশটায় বৃন্দাবনবাবু ইস্কুলের কথা বলতে এসে নরেন্দ্রের চেহারা দেখে চমকে উঠলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে নরেন্দ্র নিরুত্তর।

চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা। পাশে ছিলো অনিমেষ। বললো, "কাল রাত্রে আম্মা চ'লে গেছে; বংশীর কাছে।" নরেন্দ্র নিরুত্তর। কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে একটা বাঁশি শুনতে পাচ্ছেন। বংশীধ্বনি। বড়ো করুণ। শুনতে শুনতে বড়ো অসহায় বোধ করলেন নিজেকে। নরেন্দ্র দেহে, প্রাণে, মনে—চেতনার সর্বক্ষেত্রেই অবসন্ন।